সহেলি
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ওই জানালার কাছে বসে আছে/করতলে রাখি মাথা—করতলে ~~রাখি~~ মাথা, মাথা.... না সে আর পরের লাইনটা মনে করতে পারছে না। তার যে কি হয়!

হাওয়ার বেগে সাইকেল চালিয়ে ফিরছে অনিল। বার বার ঐ গানের কলিটা গুনগুন করে গাইছিল। পরের লাইনটা কেন মনে করতে পারছে না বুঝছে না। পারলেও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে যেন, সবাই মিলে এতবার গায় তবু এলোমেলো হয়ে যায় কেন—ফুল পড়ে রয়েছে...

ফুল পড়ে থাকবে কেন—সুর যে মিলছে না। তার কি যে হয়।

এই গানের সুরটা সে কেন কিছুতেই মনে রাখতে পারে না।

তারপরই যেন মনে পড়ে গেল—

তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে, সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।

বাড়িটার পাশ দিয়ে গেলে তিন বন্ধুর ঐ একটা গানের কলিই মনে গুনগুন করে ওঠে। জানালায় সে বসে আছে চুপচাপ। বাড়িটার পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে গেলে দোতলার জানালায় কেন যে তার চোখ চলে যায়। তাদের তিনজনের।

কোনোদিন এক পলক।

কোনোদিন জানালায় কেউ থাকে না। জানালা ফাঁকা। পর্দা ওড়ে।

আসলে জানালায় হয়তো মেয়েটার পড়ার টেবিল, সে সকাল সন্ধ্যায় সেখানে পড়ে। অথচ দূর থেকে মনে হয় জানালার কাছে বসে আছে। করতলে রাখি মাথা।

অনিলের ফিরতে রাত হয়। তিন বন্ধুর ঐ এক নেশা। একটা জানালা, একটা বাড়ি, সামনে লন, রকমারি ফুলের বাহার। সাদা চুনকাম করা বাড়িটা মার্বেল পাথরের মতো ঝকঝক করে। গাড়ি বারান্দায় সাদা রঙের গাড়ি। রাস্তার পাশে পাঁচিল। পাঁচিলে মাধবীলতার কুঞ্জ। পাঁচিল এবং মাধবীলতার কুঞ্জটার জন্য একতলাটা রাস্তা থেকে ভাল চোখে পড়ে না। তবে দোতলার জানালায় সে আসবেই। সাঁজ লাগলে, কি তারও পরে দোতলার পুব দিকের ঘরটায় ম্রিয়মাণ আলো জ্বলে ওঠে।

মাঠ থেকে তারা তিনজনই তাকিয়ে থাকে। তিনজনই তখন গুনগুন করে গান গাইবে— ঐ জানালার কাছে বসে আছে....

তিনজন তিনরকমের। অনিল থাকে রেললাইন পার হয়ে কলোনিতে। রতন থাকে জেলখানা মাঠের বিশাল বাড়িটায়। আর সমীর থাকে জলের ট্যাঙ্কের কাছে। সবে কলেজে ঢুকেছে। ঢুকেই তিনজন তিনরকমের তরুণ কোথায় কি মিল পেয়েছে

নিজেদের মধ্যে জানে না। তবে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।

তিনজনের তিনটে সাইকেল। অনিল কলোনি থেকে কলেজে আসে বলে বাবা তাকে নতুন একটা সাইকেল কিনে দিয়েছেন। সমীর তার দাদার সাইকেলটা দখল করেছে। আর রতন শখে সাইকেল চড়ে। তাকে বাড়ি থেকে গাড়িতে কলেজ যেতে হতো। ইদানিং সে আর যায় না। গাড়ি থেকে নামলে সে বুঝেছে, অনিল সমীর তাকে এড়িয়ে থাকতে চায়।

বাড়ি ফেরার সময় মেয়েটার কথা বড় বেশি মনে হয়। দু একবার যে না দেখেছে তা নয়। দোতলার খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলে চোখে পড়তেই পারে। অনিল রতনের বাড়ি কিংবা সমীরের কাছে বোধ হয় যাচ্ছিল সেদিন। অথবা দুজনের কাছেই। সে গেলেই সমীর বের হয়ে আসে। রতনও বের হয়ে আসে।

বিকেলবেলা শহরের এ মাথা ও মাথা নয়তো রানীঘাট পার হয়ে যতদূর চোখ যায় চলে যাওয়া।

কলেজে ঢুকলে বেয়াড়া স্বভাব হয়ে যায়। বাবার ইচ্ছে ছিল না, কলেজে পড়ে অনিল। দোকানে বসে গেলেই হয়। শখের পড়াশোনা বাবার পছন্দ না, শেষ পর্যন্ত দোকানেই বসতে হবে, তবু মা-র পীড়াপীড়িতে অনিল শেষপর্যন্ত কলেজে ভর্তি হতে পেরেছে।

সে বলে দিয়েছিল, দোকানে বসতে পারবে না।

তোর দাদা একলা সামলাতে পারছে না।

সামলাতে না পারলে আমার কিছু করার নেই।

বাবা রাগারাগি করেছেন। আরে গ্র্যাজুয়েট হয়ে গিয়ে কি গুষ্টি উদ্ধার করবে! ব্যবসাপত্র বুঝে নেবার মতো পড়াশোনা থাকলেই যথেষ্ট। তা তোমার হয়েছে।

বাবার কথা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা অনিলের নেই। কিন্তু দাদা এগিয়ে এসেছিল।

পড়তে চায় যখন পড়ুক না। পরীক্ষার নম্বরও তো খারাপ না। কিই বা বয়েস। এখুনি খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দিয়ে কি হবে!

মাও।

যেমন বাপ ঠাকুরদা, গুষ্টির কে কবে বি এ পাশ—ছেলেটা পড়তে চায়, তেনার মাথায় ক্যাড়া। পড়েটা হবে কি! কি হয় না। পড়ার ইজ্জত আছে, না থাকলে কেউ পড়ে!

ঠিক আছে পড়বে। বাবা চায়ের কাপ নামিয়ে গজগজ করতে করতে বাইরের ঘরে ঢুকে গিয়ে চুপচাপ বসেছিলেন।

অনিলের মনে হয়, এই কলেজ যাওয়ার যে গর্ব কোথায় বাবা বোঝেন না। কলোনির লোক তারা। দেশেও কারবার ছিল, পৈতৃক ব্যবসা। ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের

জনার্দন বস্ত্রালয়, এক ডাকে চিনত সবাই। এখানেও জনার্দন বস্ত্রালয়। এক ডাকে চেনে। শহরের বাজার এলাকায় তাদের শো-রুম দোকান। কিন্তু জরুরী কাজ না থাকলে সে কোনোদিনই দোকানে যায় না। এমনও হতে পারে দোকানে যাবার সময় সে মেয়েটাকে দোতলার খোলা বারান্দায় প্রথম দেখেছে। দেখেই অবাক। এমন সুন্দর একটা মেয়ে এই শহরে বড় হচ্ছে! চোখে চোখ পড়ে গেছিল-আশ্চর্য এক নারী বড় হবার অপেক্ষাতে যেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরের নদী দেখার চেষ্টা করছে।

সে থমকে সাইকেল থেকে এক পা নামিয়ে দাঁড়িয়ে গেছিল। তাকে দেখে কি না জানে না, মেয়েটা খোলা বারান্দায় আর দাঁড়ায়নি। পলকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

কে কবে প্রথম দেখেছে, কেউ মনে করতে পারে না।

সমীরও বলেছিল, কবে যেন প্রথম দেখলাম। বোধহয় দেওয়ালি। মন্দিরে ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়েছিল।

আবার একদিন কেন যে বলল সমীর, বিষ্ণুপুরের মেলায় নয়, মন্দিরে নয়। লালদীঘির ধারে। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। লাল সিল্কের শাড়ি ব্লাউজ। চোখে কালো চশমা। সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। আমি দেখছিলাম শুধু আমি কেন সবাই এমন কি রাস্তায় পাশে পাতাবাহারের গাছগুলি পর্যন্ত।

কবে কে প্রথম দেখেছে গুলিয়ে ফেলেছে।

রতন বলেছিল, রিকশায়। সে আর তার এক বান্ধবী। ফুলের দোকানে ঢুকেছিল। দুটো ক্যাকটাস কিনে বের হয়ে এসেছিল। শালোয়ার কামিজ পরনে।

রতন যেন ঠিক মনে করতে পারছে না। তারপর একদিন কেন যে বলেছিল আসলে ফুল তুলছে।

ফুল তুলছে কেন?

মালা গাঁথবে বলে।

কার জন্য?

কোনো দেবতার জন্য বোধহয়। মেয়েরা তো বড় হবার মুখে ফুল তুলতে ভালবাসে। মালা গাঁথতে ভালবাসে।

এত ফুল শহরে কোথায়?

কেন, বকুল বাগানে। বসন্তের সময় বোধহয়। ফুল উড়ছিল, ফুল পড়ছিল। মেয়েটা ফ্রকের কোঁচড়ে ফুল তুলে বাড়ি ফিরছিল।

তোর সামনে পড়ে গেল।

আমার শুধু হবে কেন সবার সামনে। সবাই চোখ তুলে দেখছিল, মেয়েটা কোঁচড়ে

ফুল নিয়ে রিকশায় বাড়ি ফিরছে।

মেয়েটির কি নাম তার জানে না। কলেজে পড়ে, না, ইস্কুলে পড়ে তাও জানে না। বাড়ির সামনে মারবেল পাথরে লেখা—দাশগুপ্ত হাউস। লাল রঙের ইটের বাড়ি। বাহারি দরজা জানালা। সাদা চুনকাম করে ইদানিং বাড়িটার চেহারা পাল্টে দেওয়া হয়েছে।

তিন বন্ধুই বিকেলে বাড়িটার সামনে গাছের ছায়ায় সুযোগ পেলেই বসে থাকে। বাড়ির সামনে পাকা রাস্তা। পাশে শাল শিরিষের গাছ। একেবারে এগ্রিকালচারের ফার্ম পার হয়ে রেল লাইন পর্যন্ত গাছের এই সারি-যেন কোনো ছায়াপথের সৃষ্টি করে রেখেছে। রাস্তাটা এ কারণে বড়ই প্রিয় তিন বন্ধুর। আড্ডা শেষ হলে, অনিলকে রেল লাইন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে সমীর, রতন। হাঁটতে হাঁটতে যায়। কথা বলতে বলতে যায়। সবই অর্থহীন কথা। আজও তারা এগিয়ে দিয়ে গেছে। আর রতনই প্রথম গানটা গেয়ে উঠেছিল, ওই জানালার কাছে বসে আছে/করতলে রাখি মাথা। সঙ্গে সঙ্গে তারা জানালায় চোখ রেখেছে। দূর থেকে বোঝা যায় সে বসে আছে। তবে কি করছে বোঝা যায় না। ঘরের ম্রিয়মাণ আলোর ভিতর সবই অস্পষ্ট। মেয়েটির মুখ বড় আবছা-অন্ধকারে দূরবর্তী নক্ষত্রের মতো।

অনিল বোঝে, তারা যখন বড় হয়, মেয়েরা তখন মালা গাঁথে।

পড়তে পড়তে মালা গাঁথে।

নাচতে নাচতে সূতোয় ফুল ঝুলিয়ে দেয়। উঠতে বসতে বেড়াতে কিংবা আরও দূরে গেলেও মালা গাঁথা শেষ হয় না।

হয়। তবে তখন আর কোঁচড়ে ফুল থাকে না। শূন্য কোঁচড়। মালা তারপর ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়।

বাবাকে দেখে বোঝে।

মাকে দেখেও।

মালা গাঁথার এই মহিমা অনিল সাইকেল চালিয়ে যাবার সময় যেন আরও বেশি টের পেল। লোডশেডিং হয়ে গেলে কখনও এত মন খারাপ হয়ে যায় কেন বোঝে না।

চেনে না, জানে না, কবে কখন এক পলক তাকিয়েই বিস্ময়—যেন কতকালের চেনা! চোখে মেয়েদের যে কি থাকে! চোখ নামিয়ে নিয়েছিল মেয়েটি। কখনও ম্যাকসি পরে। কখনও শাড়ি পরে বের হয়। আর কখনও শালোয়ার কামিজ। যেন এই যে বড় হওয়া, কোনো কিশোরের মুখ দেখে দেখে বড় হওয়া। তারপর আর দশজন নারীর মতো হারিয়ে যাওয়া। কিছুটা ফুল ফোটার মতো। ফুটে উঠছে। পাপড়ি মেলছে।

ফুলের গাছ অহঙ্কারী হয়ে উঠছে।

অন্তত বাড়িটা দেখলে গাছের অহঙ্কার বোঝা যায়।

গেট খুলে বাড়ি ঢুকতেই অনিল বুঝল, বাবা বারান্দায় বসে আছেন। পাশে বাবার বিশ্বস্ত মানুষ লোকনাথ কাকা।

কাকা ছুটে এসেছেন। তিনি গেটে তালা মেরে দেবেন হয়তো।

তার আজ ফিরতে সত্যি দেরি হয়েছে।

বাবা দোকান থেকে ফেরার আগে তাকে বাড়ি ফিরতে হয়। না ফিরলে বাবা এসেই বলবেন, খোকা ফিরেছে?

মা বলবেন, ফিরলে দেখতে পেতে না!

দেখা কি আর যায়! আমার দেখে কাজ কি! এত রাত করে ফেরে কেন? নটা বাজে। রাস্তাঘাট ভাল না। বোঝে না।

রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। ট্রাক বাসের চলাচল দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। রেল লাইন থেকে ক্রোশখানেক প্রায় রাস্তা। গঞ্জের মতো জায়গায় বাবা অনেকটা জমি কিনে বাড়ি করেছেন। পাটের আড়ত করেছেন। লোকনাথ কাকা আড়ত দেখেন। দেশ থেকে লোকনাথ কাকাকে চিঠি দিয়ে আনিয়ে নিয়েছেন। দোকানের একসময় সামান্য কর্মচারি। আজ বিশ বাইশ বছর হলো এপারে চলে এসে বাবার কাছেই উঠেছেন। দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কচুকাটা গৃহদাহ; ধর্ষণের সাক্ষী।

সে বাড়ি ঢুকলে বাবা নিশ্চিন্ত। লোকনাথ কাকাও। গেটে তালা পড়ে যায়।

সাইকেলটা লোকনাথ কাকা বারান্দায় তুলে রাখছেন। সে কিছুটা অপরাধীর মতো বারান্দা পার হয়ে যাচ্ছিল।

শোনো।

বাবা তক্তপোশের জাজিমে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন। আলো জ্বালা ছিল না। লোকনাথ কাকা হয়তো তার খোঁজে বের হয়েও পড়তেন। বেশি রাত হলে কার না দুশ্চিন্তা হয়! আর সে তো সবে কলেজে ঢুকেছে। বয়েসটাও যে ভাল না লোকনাথ কাকাও বোঝেন।

সে দরজার সামনে দাঁড়াল।

লোকনাথ, আলোটা জ্বেলে দে।

বাবার এই কৃপণ স্বভাব সে আদৌ পছন্দ করে না। ছেলের ফেরার অপেক্ষাতে বারান্দায় বসে থাকতে পারেন, তাই বলে আলো জ্বালিয়ে রাখতে পারেন না অকারণ। গেটের মাথায় আলো জ্বালা থাকে। যেই ঢুকুক বুঝতে কষ্ট হয় না। অকারণ বারান্দার আলো জ্বালিয়ে রাখা মানে অপচয়। সে তার বাবাকে বোঝে। শুধু বাবা কেন, কাকা জ্যাঠাকেও বোঝে। সবারই এক ধরনের কৃপণ স্বভাব আছে। কাকা জ্যাঠারও

শহরে দোকান। আদি জনার্দন বস্ত্রালয় জ্যাঠার দোকান। নিউ জনার্দন বস্ত্রালয় কাকার দোকান। আর জনার্দন বস্ত্রালয় বাবার। বাবা-জ্যাঠা-কাকাদের এত বড় বস্ত্রালয় থাকতেও হাঁটুর নিচে কাউকে কাপড় পরতে সে দেখেনি। গায়ে ফতুয়া। শীতে খদ্দরের চাদর।

বারান্দায় কাঠের চেয়ার, লম্বা টুল। জলচৌকি। বাবার বিড়ির নেশা। টিপে টিপে খরচ করার স্বভাব। অথচ এই বাবা পূজাপার্বণে দরাজ হস্ত। কে বলবে তখন এক প্যাকেট বিড়ি আর দেশলাইয়ের খদ্দের মানুষটা। আত্মীয়স্বজনের একজন বাদ গেলেও মুখ ব্যাজার। জ্ঞাতিগুষ্টির শেষ নেই। রানাঘাট, বেথুয়াডহরি, কাটোয়ায় কত না জ্ঞাতিগুষ্টি আছে বাবার। সে সবাইকে ভাল চেনেও না। গরীব আত্মীয়ের সংখ্যাও কম নয়। তারা না এলেই বাবা পূজার সময় বেশি দমে যান।

হরকিশোর এল না?

শরীর ভাল নেই কাকা।

কি হয়েছে?

মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছে, কাশি হচ্ছে। দুর্বল।

ওখানে পড়ে আছে কেন? লোকনাথ যাবে। নিয়ে আসবে। বড় ডাক্তার দেখাক। কিসে কি হয়ে যায় কেউ বলতে পারে! শরীর নিয়ে অবহেলা!

বাড়িতে বাড়তি লোকজনের যেমন অভাব নেই, থাকা খাওয়ারও অভাব থাকে না। সবার জন্য সুবন্দোবস্ত।

গাঁট ভর্তি কাপড় শাড়ি সায়া সেমিজ।

তুলে নাও। যার যা পছন্দ তুলে নাও।

প্রতিমার আটচালায় বাবা তখন চুপচাপ বসে থাকেন। প্রতিমার খড়কুটো বাড়ি এলেই বাবার নিরামিষ আহার। তখন সংসারে টাকাপয়সার হিসাব লোকনাথ কাকার জিম্মায়। দু-হাতে খরচ।

সেই মানুষটা আলোর সামান্য অপচয় নিয়ে নিজেকে কষ্ট দিলে কার না খারাপ লাগে!

শোনো খোকা। যা বলছিলাম। শহর থেকে ফিরতে এত রাত হয় কেন? তোমার মা বললেন, আটটার আগে বাড়ির কথা তোমার মনে পড়ে না। সবাই সময়মতো না ফিরলে দুশ্চিন্তা কত বোঝো? শহরে কি আছে তোমার?

অনিল মাথা চুলকে বলল, সমীরের সঙ্গে ক্যারাম খেলছিলাম।

একেবারে মিছে কথা। কিন্তু সে বাবাকে তো বলতে পারে না, সে বড় হয়ে যাচ্ছে। ঘরে একদম মন টেকে না। সমীর রতন আর এক গোপন নারীর অপেক্ষাতে তার যে কি ভাবে সময় কেটে যায় সে টেরই পায় না।

তাদের বাড়িটার কোনো শ্রী নেই। লম্বা একটেরে বাড়ি। একতলা। সামনের বারান্দার দু-দিকে দুটো ঘর। ভিতরের দিকে পরপর মেলা ঘর। সে ইদানিং নিজস্ব একটা ঘর পেয়েছে। ঘরটায় লোকনাথ কাকা রাতে শোন। রাতে সে ভয় না পায় এই ভেবেই বন্দোবস্ত। দাদা বৌদিরা ভিতরের ঘরগুলো যে যার মতো দখল করে নিয়েছে। বাবা মা বারান্দার অন্য প্রান্তের ঘরটায় থাকেন। ভিতরে উঠোন। পরে রান্নাবাড়ি, বাথরুম। টিউবওয়েল।

রতনদের বাড়ি গেলে বোঝে, রুচিবোধের কত তফাত। ঘরের সঙ্গে এটাচড বাথের যে ব্যবস্থা থাকে আজকাল, রাতে বাথরুম পেলে যে দরজা খোলা রেখে উঠোন পার হয়ে যেতে হয় না, বাবা হয়তো জানেনেই না। রতনদের বাড়ির সুখসুবিধে নিয়ে কথা বললে বাবা ক্ষেপে যান।

জঘন্য।

ছোটবৌদি তার পক্ষ নেয়।

জঘন্য বলছেন কেন বাবা? কত সুবিধা।

সুবিধা! কিসের সুবিধা? ঘরের সঙ্গে বাথরুম-তা শহরে সম্ভব। পাড়াগাঁয়ে হয় না। বাড়ি পবিত্র থাকে না। বাড়িতে লক্ষ্মী থাকে না। তা মা তোমরা যখন বাড়িঘর বানাবে পছন্দমতো বানিও। কিন্তু এ-বাড়িতে যে আমরা এটা ভাবতেই পারি না।

বৌরা বাড়ির এ-কারণে কিছুটা বাবা মার উপর রুষ্ট। অনিল তা বোঝে। বেআব্রু কে কখন বাথরুমে যায় উঠোনে লোক থাকলে টের পেয়ে যায়। চানঘরের উপরে কোনো ছাদ নেই। খোলা।

বাবার এই আটপৌরে অচল চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে অনিল নিজেকে মেলাতে পারে না। বাসি কাপড়ে কেউ ঘরেও ঢুকতে সাহস পায় না। বাথরুমে গেলে গামছা পরে যেতে হয়। অনিল যায় না। বাবা এ-কারণে ভাবেন অনিল দিন দিন ম্লেচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। শহর থেকে ক্রোশ দুই দূরে এই বাড়িঘর বানানোরও কারণ, জায়গা মেলা চাই। শুধু বাড়িঘর উঠোন, ঠাকুরবাড়ি থাকলেই চলে না—সঙ্গে গাছপালার জন্য জায়গা চাই। এদেশে এসে শহরে বাড়িঘর বানানো খুব একটা অসুবিধা ছিল না। কিন্তু এক লপ্তে আটদশ বিঘা জমি পেতে গেলে শহরের উপকণ্ঠে ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে।

সে এতসব ভাববার সময়ই বাবা বললেন, বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না বুঝি! মানসিক চাঞ্চল্যে জেরবার মনে হয়।

সে কি জবাব দেবে বুঝতে পারছে না।

তার গলা পেয়ে বড় বৌদি মা বারান্দায় হাজির।

বড়বৌদি ঠিক শুনে ফেলেছে। শুনে ফেলেছে বলেই সহজেই বলে ফেলতে পারল,

না বাবা, মিছে কথা। কোথায় তুই ক্যারাম খেলছিলি খোকা? ফেরার সময় তো দেখলাম, চাঁদমারির মাঠে তুই সমীর রতন বসে আছিস? কি করিস ওখানটায়।

ধরা পড়ে গেলে অনিলের মেজাজ খিঁচড়ে যায়।

ওখানটায় বসে গান গাই।

গান! কি গান?

ওই জানালার কাছে বসে আছে করতলে রাখি মাথা।

আশ্চর্য! সে রেগে গিয়ে যে সত্যি কথা বলে ফেলল। এক এক দিন এক একটা গান হয়। লটারি করা হয়। গানটা পছন্দ করার অধিকার লটারিতে যার নাম ওঠে তার। রতনের গলা দরাজ। সেই গায়। তবে সঙ্গে তারা গলা মেলায়।

ছোট সরকারি কোয়ার্টার। জায়গা কম। দাদা বৌদি পাশের ঘরে থাকে। সমীরের ঘরটা রাস্তার ধারে। একজন শোওয়ার মতো একটা চৌকি। পাশে তার পড়ার চেয়ার টেবিল। হুটহাট ঘরে যার যখন খুশি ঢুকে যায়। তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলা দরকার। সে ঘড়ি দেখল। চারটে বাজে। রাস্তার কদম গাছটার ছায়া তাদের ছোট বাগানে পড়েছে। দিন ছোট হয়ে আসছে বোঝা যায়।

সে খুবই কাহিল।

কি লিখবে।

আট দশটা টুকরো কাগজে আজ সে লিখবে। লিখে কাগজগুলো দু আঙুলে পুরিয়া বানিয়ে ফেলবে।

কিন্তু কি লিখবে।

আজ লটারির দায়িত্ব তার।

যেমন এক নম্বর, মেয়েটির যাই হোক একটা নাম ঠিক করা দরকার। এভাবে তো আর হয় না। জানিস দেবী টাউন হলের লাইব্রেরী থেকে বের হলেন। জানিস আজ ধুবিখানার মাঠ পার হয়ে সহেলিকে যেতে দেখলাম।

ঠিক হয়েছে খুশি মতো নাম চলবে না। ওরা তিনজনই এক নাম ডাকবে।

রতন বলেছিল, আমি সহেলি ডাকব।

অনিল বলেছিল, আমি শিউলি ডাকব।

আর সে বলেছিল, শেলি নামে দারুণ আভিজাত্য।

এই সব নিয়ে যখনই তর্ক চূড়ান্ত পর্যায়ে তখনি ঠিক হয়ে যায়, নো, নো। লটারি। লটারিতে যে নাম উঠবে, আমরা সব্বাই তাই মেনে নেব।

কাগজের টুকরোগুলোতে সে পৃথিবীর যত সুন্দর নাম আছে লিখে যাচ্ছে। অনিন্দিতা, অন্তরা, সহেলি...

লিখছে আর চারপাশে লক্ষ্য রাখছে। বৌদি দিন দিন ফাজিল হয়ে উঠছে। যদি টের পায়, সে কাগজে মেয়েদের নাম লিখছে তাহলেই পেছনে লাগবে। দাদাকে কিছু বলবে না ঠিক, তবে সুযোগ পেলেই খোঁচা মারবে। কি হলো, হঠাৎ বের হচ্ছ? অন্তরার জন্য কষ্ট হচ্ছে! অন্তরার জন্য এত চঞ্চল হয়ে পড়লে চলবে কেন বাবু? পড়াশোনা যে লাটে তুললে!

সে দরজা বন্ধ করেও লিখতে পারে না। বৌদি বলবে, আবার দরজা বন্ধ।

রতন অনিল এলে সে দরজা বন্ধ করে দেয়। তাদের কথাবার্তার তো কোনো লিমিট নেই। কখন কে কি বেফাঁস কথা বলে ফেলবে আর বৌদির কানে যাবে, শেষে বৌদি তাকে দেখে মুচকি হাসবে—হয় না। অকারণ প্রেমিক মার্কা হয়ে যেতে সে রাজী না।

দেরি করে ফিরলেই বৌদির খোঁচা-তোমাদের তিন বন্ধুর কথা কি শেষ হয় না। কি এত কথা থাকে। আরে আমাদেরও তো তোমার মতো বয়েস ছিল। বিকেল হলেই ছটফটানি। বার বার জানলায় উঁকি। সাইকেলের ঘণ্টি শুনলেই জানালায় মুখ—কে বাজায়!

সত্যি—কে বাজায়।

আছেন অন্তর্যামী। সমীর বোঝে তাঁরই কাজ। শরীরের নানা পরিবর্তনেও সে টের পায়-আছেন অন্তর্যামী। তাঁরই কাজ। শরীরে কূট খেলার রশিটা তাঁর হাতে। তা না হলে, বিকেলে তারা যেখানেই থাক, কবরখানার মাঠে, তুঁত গাছের জঙ্গলে, কিংবা স্টেশনের প্ল্যাটফরমে—যেখানেই যায়-বোঝে আছেন অন্তর্যামী। কে যেন কোথায় অপেক্ষা করছে। বড় হচ্ছে। এবং এক বন্য স্বভাবের জন্ম দিচ্ছে ভিতরে।

কাগজের টুকরোগুলোর একটায় অবশ্যই লিখতে হবে—সহেলি চায় না আজ আমরা চাঁদমারির মাঠে বসি।

সহেলি চায়, নদীর সেতু পার হয়ে দূর-দিগন্তে কি আছে দেখে বেড়াই।

সহেলির ইচ্ছা, কোনো সড়কের ছোট্ট চায়ের দোকানে বসে থাকি।

অথবা রেল-লাইন ধরে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিই।

আট দশটা কাগজের টুকরোতে এমন অজস্র কথা লিখে রাখা হয়। তারপর তিন বন্ধুর বসা। এক ঠোঙা চিনেবাদাম সঙ্গে। তিন তরুণই ফিটফাট বাবু। রুমাল বিছিয়ে বসতে বসতে সবার উদ্বেগ—লটারিতে কি উঠবে কে জানে!

সমীর বাথরুমে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে নিল। বৌদি না আবার এক ফাঁকে ঘরে ঢুকে কাগজের টুকরোগুলির খোঁজে থাকে। তা হলেই গেছে। সে যতটা দ্রুত সম্ভব ঘরে ঢুকে কাগজের টুকরোগুলি ড্রয়ারের ভিতর থেকে বের করল। দশটা পনেরটা আঠারোটা কাগজের পুরিয়া—সব দিন সমান থাকে না। এ-বিষয়ে স্বাধীনতা আছে

সবার। খুশিমতো লিখে যাও! কি চায় সহেলি। তারপর কাগজের টুকরোগুলি হাতের দু তালুর ফাঁকে ঝাঁকিয়ে ঘাসের উপর ফেলে দেওয়া। যে যার মতো মাত্র একটা কাগজ তুলে নেবে। তিনজনের তিনটে। আবার তিনটা ঝাঁকিয়ে একটা। পালা করা থাকে। আজ রতনের পালা। সে যা তুলবে তিনজনই তা মেনে নেবে।

পাঞ্জাবি পাজামা তার ইস্তিরি করা থাকে। বিকেলে বাথরুম থেকে বের হয়ে পাটভাঙা পাজামা পাঞ্জাবি বিছানার উপর দেখে রেডি। কাজের মেয়েটা রেখে যায়।

বৌদি! বৌদি!

হঠাৎ সমীরের চেঁচামেচিতে বৌদি দৌড়ে আসে।

কি হলো!

দ্যাখো। কিসের দাগ লেগে আছে!

কাজের মেয়েটা গলায় ঝাঁঝ তুলে বলল, এই নিন, বাবুর পাজামাতে নাকি কিসের দাগ।

বাবুকে জিজ্ঞেস কর। কিসের দাগ আমি জানব কি করে।

সমীর বেকুফ। বলে কি! দাগ লাগল কেন! সে কি রাতে....নিজেই কেমন লজ্জায় পড়ে যায়।

দাঁড়াও দিচ্ছি।

বৌদির ঠোঁটে মুচকি হাসি। তার মা নেই, বাবা যখন গত হন সে শিশু। বৌদি তাকে মানুষ করে তুলেছে। মায়ের মতো—আবার কখনও কখনও মনে হয় সমবয়সী নারী। সে যা যা ভাবে সব টের পেয়ে যায়।

বৌদি কি বোঝে সব? তার কি হয় না হয় সব জানে. চাদর নোংরা হলে সে নিজেই চুপি চুপি বাথরুমের বালতিতে জলে চুবিয়ে রাখে। দাগের জায়গাগুলো সার্ফ দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে ফেলে। তবে সে মাঝে মাঝে ভুলও করে ফেলে। খেয়াল থাকে না। তখনই ধরা পড়ে যায়। খেতে বসে বৌদির সামনে মাথা উঁচু করে খেতে পারে না। মুখ তুলে তাকাতে পারে না।

বৌদি তখন আরও মজা পায়।

কি পেট ভরল!

সে উঠে গিয়ে বেসিনে মুখ ধোয়। বৌদির কথার কি জবাব দেবে! পেট ভরল বলে যেন বৌদি বুঝিয়ে দিতে যায়—যা খিদে বাবুর, এতে আর কখনও পেট ভরে! যিনি খেতে দিলে পেট ভরত, তার তো পাত্তা নেই। তার পাত্তা পেতে সময় লাগবে। পাঁচ দশ বছর কি আরও বেশি অপেক্ষা। এত দীর্ঘসময় অপেক্ষা যে কি কঠিন বৌদির মুচকি হাসিতে তাও সে টের পায়।

না আর সাদা চাদরে কাজ নেই। চাদরের মর্যাদা বুঝবে না। দিন রাত বাজে

চিন্তা করলে চাদরের কি দোষ!

বৌদি চাদর তারে মেলে দেবার সময় গজগজ করছিল।

এখন আর সাদা চাদর বৌদি বিছানায় পেতে দেয় না। খোপ কাটা রঙিন বেডসিট পেতে দেয়। বৌদির কাছে ধরা পড়ে গিয়ে সে খুবই কাবু। আগেকার উচ্ছ্বাস সে কেমন হারিয়ে ফেলেছে। কেন এই কুচিন্তায় সে এত ডুবে যায় তাও বোঝে না। সে নষ্ট, পচা, বৌদি এমনও ভাবতে পারে।

কেন বার বার জানালায় উঁকি যে দেয়!

ঘণ্টি বাজলেই বুক ধড়াস করে ওঠে।

গাছের নিচে তারা দাঁড়িয়ে আছে।

আরে আয়। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলি কেন?

না আর ভেতরে যাব না। রতন ঘড়ি দেখছে।

দেরি হয়ে গেছে। অনিল চেঁচিয়ে কথাগুলি বলল।

সমীর মুখে সামান্য প্রসাধন করে আয়নায় মুখ দেখে বুঝল, চুল কিছুটা এলোমেলো। ঘন কালো চুলের বাহার, চঞ্চল চোখ এবং অধীর আগ্রহ বের হওয়ার।

বৌদি, দরজা বন্ধ করে দাও।

সে তো বুঝতেই পারছি। ফিরবে কখন?

সমীর পকেটে হাত দিয়ে দেখে লটারির কাগজগুলি ঠিক আছে। রুমাল ভাঁজ করে বুক পকেটে রাখার সময় বলল, ফিরব। দাদা ফিরে আসার আগেই ফিরব।

অফিস থেকে ফিরে দাদা ফ্রেশ হয়ে কিছু খায়। তারপর লুঙ্গি পাঞ্জাবি গলিয়ে তাস খেলতে যায় দিবাকর কাকার বাড়ি। তাসের নেশা। ফিরতে রাত দশটা হয়ে যায়।

যে যার নেশায় ছুটছে। দাদা কেন ঘরে থাকতে চায় না। বৌদির নেশা কি কেটে গেছে! বৌদির মালা গাঁথা কি শেষ? ভাইপোটি স্কুলে পড়ে। কখনও অনুযোগ—হয়েছে বেশ। সবাই উড়ছে। আরে তোতনকে কে পড়ায়! আমার হয়েছে জ্বালা। মন এত উড়ুউড়ু হলে চলে!

কোনদিকে?

অনিল সাইকেলে পা তুলে কথাটা বলল।

স্টেশনের দিকে।

রতন সাইকেল চালিয়ে দিয়ে কথাটা বলল।

সমীর বলল, পকেটে নিয়েছি।

পরে হবে।

তারপর স্টেশনের মাঠ পার হয়ে ভজুদার চায়ের দোকান। গাছে সাইকেল হেলান

দিয়ে আয়েস করে টুলে বসা।

সূর্য গাছের ফাঁকে নরম আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। সারা মাঠ, আকাশ, গাছপালা, ঘরবাড়ি দিনের শেষ আলোয় মাখামাখি। পাখিরা ঘরে ফিরছে। রেললাইন পার হয়ে ফরাসডাঙ্গার জঙ্গলে অথবা কোরবানি বিলের দিকে উড়ে যাচ্ছে। তিন সাইকেল আরোহী টুলে বসে আছে। ভাঁড়ে গরম চা। রুমালে ভাঁড় বসিয়ে চায়ে চুমুক।

তিনজনেই কথা বলছে না।

খুবই নিমগ্ন। কিছু ভাবছে। অনিলের মন ভাল নেই। বাড়িতে ধরা পড়ে গেছে।

কি লিখলি ? অনিল বলল।

বলব না। তবে আজ ওর নামটা ঠিক করে নিতে হবে।

কেন সহেলি নাম খারাপ ? রতন কেমন ক্ষুব্ধ গলায় বলল।

দ্যাখ, আমরা ওর সব লটারিতে ঠিক করি। অনিল শিউলি নামটা পছন্দ করে।

রতন বলল, সমীর আস্তে।

অর্থাৎ ভজুদা আছে না। শুনলে কিছু মনে করতে পারে। সেদিনের সব পোলাপান, এখনই মাইয়াছেইলার নামে পাগল।

বাবু গ কুকিস বিস্কুট কইরা দ্যা। কয়ডা দিব কন।

ভজুদা অনিলের দিকে তাকাল।

কি রে বিস্কুট দেবে ?

নে।

রতন বলল, কুকিস না ভজুদা। নিমকি বিস্কুট দাও। কুকিস বিস্কুট দাঁতে লাগে।

অনিল বলল, আমাকে কুকিস দিন দুটো। সমীর, তুই কি নিবি ?

আমার লগে পদ্ম বিস্কুট।

তাইলে প্যালা, রতনবাবুরে দ্যা দুইখান নিমকি—মচমচা বিস্কুট, নোনতা মিঠা—চায়ে চুবালে মাখন—জিভের লগে মিশা যায়। নেন ধরেন। অনিলবাবুরে কুকিস। দাঁতে কড়কড় করে ঠিক তবে খাইতে সুস্বাদু। যাই খান, মুখে মাখামাখি না হইলে মজা লাগে না। সমীরবাবুরে দুইখান পদ্ম বিস্কুট, মাঝখানটায় কিশমিশের বোটা—যার যেমন পছন্দ। তবে যাই কন জিনিস হইল গিয়া কুকিস। নরমে গরমে রাখে। মাঝে মধ্যে দুই একখান লোভে পইড়া নিজেও খাই।

রাস্তায় রিকশা, সাইকেল। পাঁচটার ট্রেন আসছে। স্টেশনের দিকটায় ভিড় বাড়ছে। গুমটি ঘরের পাশেই ভজুদার চায়ের দোকান। এই দোকানে বসে পাঁচটার গাড়ি দেখার মধ্যেও মজা পায় তারা। গাড়িটা ঢুকলেই এলাকাটা গমগম করতে থাকে। ট্রেনের ভোঁস ভোঁস শব্দ। যাত্রী কোলাহল—স্টেশনটা শহরের বাইরে—দু-

পাশে কিছু রেল কোয়ার্টার লাল রঙের আর তুঁত গাছের জঙ্গল। সরকারি খামার। গুটি পোকার চাষ হয়। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে মাঝে মাঝে অ্যাডভেঞ্চার শুরু হয়। ঘন জঙ্গল আর নিঝুম গাছপালা-ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। কলেজ থেকে ফেরার সময় মাথায় সহসা কি চেপে যায়-ছেলেদের কলেজ থেকে মেয়েদের কলেজটা বেশ দূরে। দু-একবার তারা কোনো তরুণী ছাত্রীরও অনুসরণ করে। মাথায় যে কি পোকা চাপে। এদিকটায় এলে মাঝে মাঝে তুঁতগাছের জঙ্গলেও ঢুকে যায়। যেন তারা খুবই সাহসী যুবক।

কত হলো ভজুদা।

তিন টাকা আশি।

রতন বের কর। তুই আমাদের মোল্লা। আমরা দিলে খারাপ দেখাবে।

মোল্লা হয়ে কাজ নেই। এই অনিল, আরে বাবা তোদের কত পয়সা। ব্যবসার পয়সা। বৌদিরা দেয়। বাবা দেয়। মাসিমা তো আছেনই। কিপ্টেমি করছিস কার জন্য। কে খাবে ?

অনিল বলল, মন ভাল নেই।

কার আছে ? বসে থাকি শকুনের মতো। গন্ধ পাই, উড়ি—কিন্তু যা দেখি, সে তো মরীচিকা।

একটা কিছু করা দরকার।

সমীর বলল, আগে নামটা ঠিক করি। নাম না থাকলে জমে না। সহেলি নামটা তোর পছন্দ। আমাদের পছন্দ না।

ইস তুই কিরে ! রতন না বলে পারল না।

সত্যি তো ভজুদা শুনে ফেলতে পারে। প্রেম হলো খুবই গোপন জলের মাছ। এত গভীরে থাকে তাকে দেখা যায় না। বুড়বুড়ি উঠলে টের পাওয়া যায় নড়ছে। তিনজনই বঁড়শি ফেলে বসে আছে, কার টোপ গিলবে কে জানে। সে যাই হোক, গিললেই মেনে নেওয়া হবে না। সোজাসুজি বলতে হবে। দেখুন, আমাদের সব কিছু লটারিতে ঠিক হয়। টোপ গিলেছেন, ভাল। কিন্তু বঁড়শি সনাক্তকরণ হবে লটারিতে।

পয়সা বের করা নিয়ে কিপ্টেমি চলে। তাও মজা করার জন্য। কারণ এতেও তারা আনন্দ পায়। রঙ্গ-রসিকতা করার সুযোগ পাওয়া যায় এতে। রতন বুঝল, ভজুদা তাদের চেনে। অনিল সমীরকে না হলেও তাকে ভালই জানে। মজুমদার বাড়ির ছেলে। জজ ব্যারিস্টারে ভর্তি। মোটা থামওয়ালা একটাই বাড়ি। বাগান, ঘাটলা নিয়ে বেশ দ্রষ্টব্যস্থল। এখন শরিকি বাড়ি, তবু জেল্লা আছে। গেটে দুটো বিশাল দেবদারু গাছ। সামনে লন, আগে বাড়িটার লনে বড় বড় র‍্যাকেট হাতে

ডিউস বলে কি সব খেলা হতো শুনলে রতনের হাসি পেত। টেনিস খেলত আর বাবা কাকারা সে জানে। তবে ভজুদার অজ্ঞতা নিয়ে কখনও ঠাট্টা-তামাসা করত না। জোরালো আলোতে বাড়িটা নাকি ভেসে থাকত জ্যোৎস্নায় কোনো কদম গাছের মতো। জ্যোৎস্নার সঙ্গে কদম গাছের মিল কী করে যে খুঁজে পায় ভজুদা। অদ্ভুত মানুষ। বড় মায়াবী দেখাতো বাড়িটা বলত।

বাবা নামী অ্যাডভোকেট শহরের। তবে সে কি হবে ঠিক হয়নি। এই নিয়ে এখনও তিন বন্ধু কোনো লটারির কথা ভাবেনি। সবই একসঙ্গে ভেবে ফেললে মজা থাকে না। রহস্য উপন্যাসের পাতা উল্টে যাবার মতো জীবন কি আছে পরের পাতায় না পড়লে বোঝা যাবে না।

তা বেলা পড়ে আসছে।

ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে। মাঠের চারপাশে ভিড়। সিনেমার প্রথম শো ভেঙেছে। 'পহেলা আদমি' চলছে। তারা ফেরার সময় দেখল—বোর্ডে হাউসফুল। নিয়ন আলোতে দপদপ করে জ্বলছে।

তিনটি সাইকেল আর তারা তিন আরোহী।

ওরা যাচ্ছে। স্কোয়ার মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ প্যারেড শেষ।

মাঠে দাঁড়িয়ে হাবিলদার মেজর জোরে হাঁকছে, প্ল্যাটুন ডিসমিস।

কত কাজ মানুষের। সকাল থেকে রাত মানুষ ছুটছে শহরটায়। রিকশার জ্যাম। সাইকেলের মিছিল, দ্রুতগামী বাস সব স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে। এক এক করে ছাড়ছে।

বুড়োরা লালদীঘির পাড়ে সান্ধ্যভ্রমণে বের হয়ে পড়েছে।

দীঘিতে শালুক ফুল। লাল শালুক ফুলের ছড়াছড়ি। ডানদিকে পড়ে থাকল, সরকারি গুদামখানা। টিনের লম্বা প্ল্যাটফরম মনে হয়। চালে শয়ে শয়ে কাক ওড়াউড়ি করছে। কা কা করছে।

সামনেই পড়ে গেলেন, উপেনবাবু। হাফপ্যান্ট হাফশার্ট, পায়ে সু এবং মোজা—সাইকেলে কোথাও যাচ্ছেন।

আরে তোমরা!

ওরা তিনজনই হাসল।

এই দেখা হওয়াটা মোটেই সঙ্গত নয়। দু তরফই যেন ধরা পড়ে গেছে। উপেনবাবু ডিস্ট্রিক্ট ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর। তিনি এ-সময়টায় কোথায় যাচ্ছেন, তাদের মতো এঁচড়ে পাকা খচ্চর ছোঁড়ারা ভালই খবর রাখে। আসলে রতনের কাকাকে একবার অভিযোগও করেছিল, হাবুল তোর ভাইপোটা কলেজে ঢুকে দেখছি মান ইজ্জত সব খুইয়েছে। উটকো এঁচড়ে পক্ক দুটো ছোঁড়ার সঙ্গে দেখছি খুব ভাব। কোথায়

যায়!

তুমি কোথায় যাও বল! ঘরে দুটো সোমত্ত মেয়ে, বউ—আর সাঁজ লাগলে বের হয়ে পড় কেন সবাই জানে। ব্যারাক বাড়িতে যাচ্ছে। লাইনবন্দি সরকারি কোয়ার্টার। রত্নাদি বসে আছেন। তুমি যাবে বলে বসে আছেন। বিধবা মহিলার নিঃসঙ্গ জীবনে তোমার মতো বয়স্ক প্রেমিক না হলে চলে! গল্প গুজব, আর কি থাকে—মহিলার যৌবন আছে, ত্রিশ পঁয়ত্রিশে মেয়েদের যৌবন কতটা থাকে তারা অবশ্য ভাল জানে না। রত্নাদি স্কুল ইন্সপেক্টার।

দাদা একদিন সমীরকে বলেছিল, রত্না তোকে চেনে। বলল তো গ্র্যাজুয়েট হলে ঢুকিয়ে দেব।

রত্নাদি, তাদের তিন মানিককেই চেনে।

সমীরই খবরটা দিয়েছিল।

দাদাকে বলেছে, চাঁদমারির মাঠে দেখলাম। আরে আমরা কোন মাঠে খেলছি তোর এত কৌতুহল কেন!

সমীরের কথায় ক্ষোভ।

সবাই যে যার মাঠে খেলছে। বুঝলি না। দেখলি তো উপেনবাবু আমাদের সামনে পড়ে কেমন জলে পড়ে গেল। ভেটকির মতো হাসল।

আমরাও হাসলাম।

খুব মজা লুটছে।

অনিল বলল, তা সুযোগ পেলে কে ছাড়ে।

রতন বলল, দারুণ ফিগার রত্নাদির। যাই বলিস, একদিন দেখবি রত্নাদির জন্য না আমরাও উপেনবাবু হয়ে যাই।

সমীর বলল, কখখনও না। আমি কিন্তু বলে রাখছি, দান আজ আমি ফেলব।

আজ তো রতনের পালা।

রতন তুলবে। সমীর বলল।

তার মানে তুই ফেলবি, রতন দান তুলবে। আমি কি কচুপোড়া খাব? শহরে আলো জ্বললে গাছের আড়ালে আমরা বসে থাকি বাড়িতে টের পেয়েছে। বাবার মেজাজ, এত রাত কেন খোকা। কলেজে পড়ছ বলে মনে কর না, ডানা গজিয়ে গেছে!

কে খবর দিল?

বৌদিরা দেখেছে। শো দেখে সন্ধ্যায় ফিরছিল—আচ্ছা বাড়িটা আর একটু আড়ালে হলে কি ক্ষতি ছিল বল।

আমরা এখানে বসে কি করছি লোকের এত মাথাব্যথা কেন বলতো?

সমীর বলল, সেই।

আমরা তো তোকে সামনাসামনি এখনও দেখিনি। আচ্ছা রতন, তুই তো শহরে থাকিস, সমীরও থাকে—খুব বেশি দূরও না, খবর নিতে পারিস না, সন্ধ্যায় সে কি জানলার ধারে এসে বসে?

সে নয়। সে বলবি না। সে বললে তাকে খুবই ছোট করা হয়। সহেলি বল। রতন উত্তেজিত হয়ে সাইকেল থামিয়ে দিল।

আজই ঠিক হবে। সহেলি না, শেলি।

অনিল বলল, শিউলি নয় কেন? যদি চিট কর তবে কিন্তু আমি ছাড়ব না বলে দিলাম।

বারে, চিট করার কি হলো!

করতে পারিস। সহেলি আর শেলি লিখলি, শিউলি যদি না লিখিস!

ঠিক আছে, দান তোলার পর নাম ঠিক হবে। সব কাগজ খুলে শেষে দেখা হবে। তা হলে আর চিট করার প্রশ্ন থাকছে না। কি ঠিক কি না?

ওরা সাইকেল গাছে হেলান দিয়ে রেখে দিল। বসল। জানালার দিকে তাকাল। খালি জানালা। বারান্দায় শাড়ি ঝুলছে।

অনিল বলল, দ্যাখ, শিউলিকে কিন্তু কেউ আমরা খুব কাছ থেকে দেখিনি। আমার তো মনে হয় বাড়িটায় কয়েকজন শিউলি থাকে। সবাই দেখতে একরকমের।

সবাই দেখতে একরকমের হয় না। রতন না বলে পারল না।

হয়।

অনিলের গোঁয়ার স্বভাব। সে ফের বলল, হয়।

সমীর বলল, হয় না। হলে আমরা রোজ গাছের আড়ালে বসতাম না। এমন কুহকেও পড়ে যেতাম না।

অনিল বাধা দিয়ে বলল, কথাটা তা না। যে কোনো কিশোরীকেই আমাদের ভাল লাগে। ভাল লাগলে দেখতে যে কেন একরকমের হয়ে যায়!

রতন বাধা দিল।

অনিল মনে রাখবি, সবাইকে ভাল লাগে না। ভাল লাগলে সবাই একরকমেরও হয়ে যায় না।

অনিল ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল হতাশ হয়ে।

কি জানি, আমার তো মনে হয় জানালায় যাকে দেখি, সে কোনো গোপন রহস্য, যা সব নারীরই থাকে। এই রহস্যের টানেই আমরা গাছের আড়ালে এসে বসি। আসলে আমরা বড় হচ্ছি। কি যে মোহ সৃষ্টি করে রাখে জানালাটা। যেন আমাদের জন্যই ঐ জানালার কাছে বসে আছে করতলে রাখি মাথা....আজ শাড়ি

ঝুলছে।

সমীর আধশোওয়া অবস্থায় ছিল। উঠে বসল। সে কিছুটা বিরক্ত। অনিলের অর্থহীন কথা তার ভাল লাগছে না। বাবু বাড়িতে ধরা পড়ে গিয়ে সাধু সাজতে চাইছে।

সমীর না পেরে বলল, কাগজের টুকরোগুলো ঢেলে দিচ্ছি। লটারি করে কি হবে? কথা ছিল, আমরা যাকে ভালবাসব, তাকে এক নামে ডাকব। তার সঙ্গে আমরা খুশিমতো কথাও বলতে পারব না—এই তো ঠিক ছিল, কি ঠিক কি না? লটারি করে ঠিক হবে কে কবে তাকে নিয়ে কথা বলবে।

হ্যাঁ ঠিক। অত উতলা হচ্ছিস কেন? আমরা কি কেউ বিট্রে করেছি? রতন সিগারেটের প্যাকেট গোপনে পকেট থেকে বের করল।

আলবৎ করেছে। অনিল বলছে, বাড়িটায় মেলা মেয়ে—সবাই দেখতে একরকমের। শহরে আমাদের বয়সী মেয়েরা কি সবাই দেখতে একরকমের? বাড়িটা বলতে গোটা শহরটাকে সে মিন করতে চায়।

আরে অনিলের কথার গুহ্য মানে কি তবে এই! এই বেটা ওঠ। মারব লাথি। তুই সহেলিকে অপমান করতে পারিস। সহেলির সঙ্গে পৃথিবীর কোনো মেয়েরই তুলনা হয় না। তুলনা করলে, তাকে অপমান করা হয় জানিস। আমাদের কষ্ট হয়, সহেলি কারো মতো হবে না। বল, সহেলি কারো মতো হবে না। সে এক আশ্চর্য অপার আনন্দ আমাদের। বল।

অনিল মন্ত্রপাঠের মতো বলল, শিউলি কারো মতো হবে না, সে এক আশ্চর্য অপার আনন্দ আমাদের।

তার জন্য আমরা বসে থাকি, বল।

তার জন্য আমরা বসে থাকি।

তার জন্য আমরা বড় হই। বল।

তার জন্য আমরা বড় হই।

সাবাস। সমীর, তোর আর অভিমান থাকার কথা না। আমরা আশা করি, এবারে লটারি শুরু হবে। আগে দেখি কার কপাল খোলে।

সমীর দু পকেটেই হাত ঢোকাল। যেন কিছু খুঁজছে। অথবা ইতস্তত করছে এই মুহূর্তে সব একসঙ্গে বের করবে কি না।

লটারি তো আজ একটা না। যদিও কথা ছিল, শুধু আজ নামের সনাক্তকরণ হবে, আর কিছু না-কেন যে সমীরের মনে হলো, শেলি তো আরও কিছু চায়। সে তার প্রেমিকদের কাছ থেকে কি আশা করে তারও কিছু ভাগ্যলিপি লিখে এনেছে।

যেমন—আমি চাই, রেলের ধারে তোমরা সাইকেল চালিয়ে যাবে, অথবা কোনো তুঁতের জঙ্গলে, বালির চড়ায় হলেও যেন মন্দ হয় না—সারা রাত নদীর নির্জন বালির চরে জ্যোৎস্নায় শুয়ে থাকা, নক্ষত্র দেখা—উজ্জ্বল নক্ষত্রটি চিনে নিতে আশা করি তোমাদের অসুবিধে হবে না।

কি হলো, বের কর।

সে নাম তিনটে বের করে বলল, ফেলছি। বলে সে কাগজের মোড়কগুলি দু হাতের তালুর মধ্যে রেখে কানের কাছে নিয়ে ঝাঁকাল। কিন্তু ফেলল না।

কি হলো!

না, ভাবছি, রতন যা তুলবে তাই আমাদের মেনে নিতে হবে। তবে আমি আশা করব আরও কিছুদূর যাওয়া যায় কিনা না।

সেটা কতদূর!

ওরা তিনজনই জানালার দিকে তাকাল। শাড়ি নেই। তবে জানালার ধারে কেউ বসেও নেই করতলে রাখি মাথা।

এ যে কি ব্যঞ্জনা গানের—কতকাল পর, কত দীর্ঘ সময় চলে যাবার পরও গান কেন পাগল করে—যেন গানের এই কলিটি না থাকলে, রাস্তার ও পাশের জানালার এত মহিমা তারা টেরই পেত না।

রতন বলল, সেটা কতদূর বলবি তো?

অনিল ক্ষেপে গিয়ে বলল, বেগড়বাই বের করছি। আসলে তুই লটারি করতে চাস না।

আরে ফেলছি। বলেই সে ঘাসের উপর কি ফেলল, ফুলের মতো উড়ে যাচ্ছিল প্রায়। হাওয়ায় জোর আছে। বৃষ্টি বাদলার দিন নয়- তবে শরৎকালের নির্মেঘ আকাশ। জ্যোৎস্না উঠেছে। রাস্তার আলো ঘাসের উপর ঢেউ তুলে দিচ্ছে। আর দেখল, সেখানে তিনটি কাগজের টুকরো কোথায় ঘাসের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আর ওরা খুঁজছে।

ঘাস তুলে ফেলেছে। মাটির গর্ত। এবং বেশ খানিকটা জায়গা সাফ। একটা পাওয়া গেল। বাকি দুটোর জন্য ওরা আরও ঘাস তুলে খুঁজছে।

আরও একটা পাওয়া গেল। ছোট মতো গর্ত সৃষ্টি হয়েছে ঘাস তোলায়। তিনটে খুঁজে না পেলে লটারি করা যায় না। বাকি একটা ঘাসের নিচে পড়েছিল। তিনটেই পড়ে আছে এখন মাটিতে।

রতন বলল, তুলছি।

সমীর যেন প্রার্থনা করছে এমন ভঙ্গিতে বসে আছে।

রতন তুলতে গেলে অনিল ঝাঁপিয়ে পড়ল, না না। তুলবি না।

তুলবে না কেন? তোর কি হয়েছে অনিল? তুই কেমন হয়ে যাচ্ছিস।

আমরা সবাই তুলব। অনিল কেমন অবুঝ হয়ে গেছে।

তবে আর লটারি থাকল কোথায়?

যার যা উঠবে, সে সেই নামে ডাকবে। অনিল রতনকে কিছুতেই হাত দিতে দিচ্ছে না।

রতন বলল, হয় না। শোন, আমরা কোথায় ছিলাম। তিনজনের কেউ আমরা তিন মাস আগেও কাউকে চিনতাম না। কেন যে আমাদের মধ্যে এত মিল তাও বুঝি না। আমরা তিনজনই বুঝেছিলাম, কিছু এমন আমাদের আছে এই মানে মনের মিল, যার জন্য আমরা আজ এখানটায়। তুই বলেছিলি, সে দোতলার ব্যালকনিতে আছে। আমরা বলেছিলাম, কোথায়? তুই বাড়িটার কথা বললি। দোতলার ব্যালকনিতে সে দাঁড়িয়ে থাকে বললি। আমরা কোনোদিনই ব্যালকনিতে দেখিনি। তুই দেখাতেও পারিসনি। কি, ভেবে দ্যাখ যদি আমার ভুল হয় ধরিয়ে দিবি।

আমরা সারা বিকেল অপেক্ষা করলাম। গাছের আড়ালে—তোর আশা সে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াবেই।

দাঁড়াল না।

রাত হয়ে গেল। কি, মনে পড়ছে?

তখনই হঠাৎ চিৎকার করতে যাচ্ছিলি। তোর কাছে সে অপরূপা, দেবী কিংবা কল্পনা যাই বলিস, আমরা কিন্তু বলেছিলাম, আশা নিরাশা সবাই একসঙ্গে ভাগ করে নেব।

আমরা তাকে দেখতে পাইনি বলে হতাশ হইনি। কিন্তু তুই খুব সংকোচের গলায় বলেছিলি, ভাবা যায় না। যেন সারা পৃথিবীর সৌন্দর্য স্তব্ধ হয়ে আছে। তাকে না দেখতে পারলে, তোর যেন সব মাটি। আর যখন চিৎকার করতে যাচ্ছিলি, বললাম, আস্তে।

সে এসে বসল জানালায়।

বললাম এই কি সেই?

তুই বললি, হ্যাঁ।

চিনলি কি করে সেই?

তুই বললি, জানি না। ও ছাড়া এ-ভাবে জানালায় কেউ বসতে পারে না। করতলে রাখি মাথা গানটা গুনগুন করে গাইলাম।

আমরাও কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। যেন সত্যি জানালায় বাতাস বয়ে যাচ্ছে। চুল উড়ছে তার। খোঁপা খুলে গেছে এবং বাইরের জ্যোৎস্না তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। কিছুই স্পষ্ট নয়—কারণ গাছের আড়াল থেকে জানালার যে

দুরত্ব তাতে চোখের তেমন জ্যোতি নেই, তাকে সঠিক দেখাতে পায়।

আমরা তিনজনই তাকে আবছা মতো দেখেছি। তার মুখ চোখ কিছুই স্পষ্ট নয়। জানালা, ঘরের চার দেয়াল এবং নিভৃতে একাকী বসে থাকা তার আমাদের চঞ্চল করে তুলেছিল। বলেছিলাম, সে তো কখনও একার হতে পারে না।

তুই বলেছিলি, ঠিক বলেছিস।

সে আমাদের তিনজনেরই। তুই হাত মিলিয়েছিলি—কি ঠিক কি না? তারপর আমরা তিনজনই বন্ধু হয়ে গেলাম। আমরা তিনজনই তার প্রেমিক হয়ে গেলাম।

রতন আবার জানালায় চোখ রাখল। গাছের আড়াল থেকে রাস্তা পার হয়ে বেশ দূরেই বাড়িটা। তবু দেখা যায়। সে এসে বসলে দেখা যায়। মুখ চোখ চুল সব মিলে এক নারীরহস্য বোঝা যায়। রতন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না, এখনও আসেনি।

তারপর কাগজের টুকরোগুলির দিকে তাকিয়ে বলল, সে জানেই না, ওর জন্য আমরা এখানে বসে থাকি। ওকে দেখার জন্য বসে থাকি।

সমীর বলল, সে জানেই না, আজ তার নাম নিয়ে আমরা লটারিতে ব্যস্ত।

অনিল বলল, আচ্ছা আমরা কি পাগল?

না জুয়াড়ী। নেশাখোর যদি হই না হলে নাম নিয়ে কেউ কখনও লটারি করে।

কী নিয়ে লটারি নয়! আজ রাতে আমরা তাকে নিয়ে কে কি ভাবব তাও লটারিতে ঠিক হবে। তা হলে রতন তুলে ফেল। অন্তত নামটা ঠিক করে ফেলি। যার যা খুশি ডাকবে আমি সহ্য করব না। সহেলি হোক, শেলি হোক, শিউলি হলে, আহা ভাবা যায় না। শরতে কাশফুল আর শিউলিফুল কিশোরীর উপমা হয়ে আছে। আমি মনে করি শিউলি ছাড়া অন্য যে কোনো নামে তাকে ছোট করা হবে। সহেলি কিংবা শেলি তো ফুলের নাম নয়। ফুলের নাম ছাড়া তাকে অন্য যে কোনো নামে ডাকলে অপবিত্র করা হবে। তবে লটারিই আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত। ভাগ্য বিধিলিপি সব।

রতন বলল, তুলছি।

সে হাত বাড়াতেই সমীর বলল, চোখ বন্ধ করে তুলবে।

রতন অনিলের দিকে তাকাল।

বলছে যখন, চোখ বন্ধ করেই তোলা উচিত।

রতন চোখ বন্ধ করে হাতড়াতে থাকলে, সমীর চিৎকার করে উঠল, দাঁড়া, দাঁড়া। হাত দিস না।

অনিল সমীরের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। করছে কি ছোঁড়া! মাথা কি ঠিক আছে! বাজি লড়ছি। বীরের মতো তাকে গ্রহণ করা দরকার। রতন ফেরববাজ

নয়। চোখ বন্ধ করে তুলতে হবে, তাতেও রাজী। সমীর কি চায়!

কি চাস বলতো!

আমি বলছিলাম, বলে সমীর ঢোঁক গিলল।

আমি বলছিলাম বলে থামলি কেন?

রতন হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তবে সে চোখ খোলেনি। ওরা তিনজনের একজনও বাধা দিলে সে হাত দিতে পারে না। সবার সম্মতি থাকবে—এই কড়ারে লটারি। কিন্তু লটারি করার ব্যাপারে কোনো কড়ার নেই। কোনো অজুহাত তুলে লটারি ভেস্তেও দিতে পারে। আজ নয়। এখনও মানসিক প্রস্তুতির ঘাটতি আছে। যেন যে নাম যার পছন্দ সেই নাম না উঠলে সে হেরে যাবে। তার উপর জোর খাটবে না। সহেলি নামটা উঠলে, রতন চিৎকার করে উঠতে পারে—এই দ্যাখ সহেলি। সে চায় তার নাম আমরা সহেলি রাখি। সহেলি আমার।

সে চায় না। রতন চায়—এমন প্রশ্ন এখন অনিল এবং সমীরের। প্রেমের ব্যাপারে ভাগ বাটোয়ারা চলে না। নাম ঠিক করতে গিয়েই ধরা পড়ে যাচ্ছে সবাই।

আর রতন নিশ্চিন্ত। সে যেন জেনেই বসে আছে, কাগজটা তুলে ভাঁজ খুলে দেখলেই বড় বড় অক্ষরে সহেলি হাজির হবে। আমি সহেলি সিঁড়ি ধরে দৌড়ে উঠি না। সিঁড়ি ধরে দৌড়ে নামি না। আয়নায় নিজেকে দেখি। তবে কিছুই দেখতে পাই না। আমার শরীর কথা বলতে চায়। কি কথা জানি না। জানলায় বসলে গাছপালা পাখি পর্যন্ত ঝুঁকে দেখে সহেলি বসে আছে। এক নবীনা সবে মাত্র পৃথিবীর গোপন খবর পেয়ে গেছে যে। আবার সব হারিয়ে এখন নিঃস্ব।

রতন চোখ বুজেই বলল, সমীর কি বলতে চায়। বলুক। আমরা না হয় আজ সমীরের কথা মান্য করব। আমার কোনো আপত্তি নেই।

রতন বলছে আপত্তি নেই, অনিলের দিকে তাকাল সমীর।

তোর?

অনিল বলল, আমারও আপত্তি নেই।

আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না, ছোট্ট গর্তটার মধ্যে আমরা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেব কাগজের টুকরোগুলি। যেটা গর্তে পড়বে তা আমরা তুলে নেব। তাতে যে নাম লেখা থাকবে সেই নামেই তাকে ডাকব।

বুঝলাম না। রতন চোখ না খুলে আর পারল না।

দ্যাখ। বলে, সমীর নুয়ে মাটির কাছাকাছি ঝুঁকে ফুঁ দিল। তিনটে কাগজের মোড়ক তিনদিকে ছড়িয়ে গেল।

খুব কঠিন। এভাবে এত ছোট গর্তে এত হালকা কাগজ ফুঁ দিয়ে ফেলা যায় না।

চেষ্টা করি না।

ওরা উবু হয়ে ফুঁ দিতে থাকল। তিনজন তিন দিক থেকে হামাগুড়ি দিচ্ছে। কাগজ নিজের গরজে নড়ছে না। ফুঁ দিলে ওড়াউড়ি শুরু করছে। কাজটা খুবই কঠিন। সামান্য একটা ছোট গর্ত যেন অপরিসীম দূরত্ব সৃষ্টি করছে। কাগজ উড়ে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে ঠিক, গর্তের কাছাকাছিও পৌঁছে গেছে একটা কাগজ।

হলে কি হবে—তিনজন তিন দিক থেকে ফুঁ দিলে কাগজের দোষ দেওয়া যায় না। গর্তেরও না। যার ফুঁয়ে যত জোরই থাকুক, কাগজের মর্জি না হলে সে পড়বে কেন। তিনজনের এই অপচেষ্টা কাগজও যেন বোঝে। বৃষ্টির ফোঁটার মতো হাওয়ার পাক খাচ্ছে। অথবা বরফের কুচির মতো নড়ছে, উড়ছে। এবং মজার খেলা হয়ে গেল।

তিনজনেরই কোমর ধরে গেল।

এত আহাম্মক বনে গেল শেষে!

কাগজগুলি যে আর কাগজ নেই। বরফের কুঁচি হয়ে গেছে। পাগলের মতো তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে, ঘাসে গিয়ে উড়ে পড়ছে। একটা নাম প্রিয় নাম যে নারী হয়ে উঠছে—যে ফুল ফোটার মুখে যে অদৃশ্য এক আততায়ী তাদের, তার জন্য মাথা ঠিক রাখতে পারছে না।

রতন বলল, হবে না।

রতন নিরাশ। কারণ রতন তো সব জানে। নিরাশ হওয়া ছাড়া এ মুহূর্তে তার উপায়ও নেই। সমীর অনিলকে কিছুতেই বলতে পারছে না সহেলি ছাড়া তার আর কোনো নাম নেই।

কেন হবে না? অনিল ফের চেষ্টা করতে থাকল।

হয় না। তিনজনই আমরা চেষ্টা করছি। তিন দিক থেকেই কম বেশি জোর হাওয়া বইছে। কাগজ পড়বে কেন গর্তে? বরং লটারি হোক, কে ফুঁ দেবে। লটারিতে ঠিক হোক। রতনের এখন নাম নিয়ে মজা করা ছাড়া উপায় নেই।

ঠিক আছে তাই হবে।

সমীর পকেট থেকে ছোট ডাইরি বের করে কাগজ ছিঁড়ে নিল। নাম লিখল, সমীর, রতন, অনিল। তারপর কাগজগুলি বরফের কুচি পাকিয়ে মাটিতে ফেলে দিল।

রতন বলল, কে তুলবে?

আমি। সমীর আগ বাড়িয়ে তুলতে গেলে অনিল বলল, না হয় না। তুমি ফেলেছো, তুলব আমরা।

ঠিক আছে। পকেটে ছোট্ট নোটবইটা ঢুকিয়ে সমীর কাগজগুলির দিকে তাকিয়ে থাকল।

অনিল বলল, রতন তুই তোল।

না তুই।

তোল না। আমরা তিনজনই এখন তোর মধ্যে আছি।

তুলতে পারি। সমীর এবার কিন্তু তোর কোনো আব্দার সহ্য করব না। তারপর কি ভেবে মনে হলো, না এভাবে তিন বন্ধুর মধ্যে কথা হতে পারে না। সমীরের মনে খিঁচ থাকলে সে কাগজ তুলেও শান্তি পাবে না। অগত্যা প্রায় অনুরোধের সামিল।

সমীর, আমি তুলতে পারি? আমি জানি, তুই ভাবছিস, তোর গোপন লেখা থেকে আমি ঠিক ধরে ফেলতে পারব, কোনটায় আমার নাম লিখেছিস। সত্যি বলছি আমি কিছুই দেখিনি। আমাদের তিনজনের নামই তিন অক্ষরের। কাগজের ওপিঠে তিনটি নামই একরকম দাগে ভেসে ওঠার সম্ভাবনা। তোর মনে খিঁচ থাকুক চাই না। তুই যদি অনুমতি দিস তবে তুলব। অনিল রাজী। তুই রাজী হলেই হয়ে যায়। আসলে একটা কথা মনে রাখা দরকার। আমরা কেউ তাকে সামনাসামনি দেখিনি। ডাহা মিছে কথা হলেও রতনকে বলতে হলো, আমরা কেউ তাকে দেখিনি। দূর থেকে বলতে পারিস প্রেমে পড়ে গেছি। আবছা মতো তাকে জানালায় দেখা যায়। ফুলের দোকানে ফুল কেনে, কখনও সাইকেল চালিয়ে যায়, সে যে সহেলিই হবে, তার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আসলে ব্যালকনিতে সে আমাদের সব আনন্দ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গাছপালা মাঠ দেখে। সুন্দর মেয়ে দেখলেই আমরা ভেবে ফেলি, সে শুধু ফুলই কিনতে পারে। সে লাল সাইকেলে সাদা রঙের সালোয়ার কামিজ পরে যায়। সহেলি আমাদের সেই মনের কোনো প্ল্যাটফরমে একা দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি এলেই উঠে পড়বে। তাড়াতাড়ি তাকে ধরা দরকার। আমরা ছুটছি।

অনিল বলল, এত কথা শোনার সময় নেই। সে ঘড়ি দেখল।

রাত আটটা বাজে।

ওঠা দরকার।

বাবা দোকান থেকে ফিরেই বলবেন, খোকা ফিরেছে?

দাদা তাস খেলে ফিরেই বলবেন বাবুর খাওয়া হয়ে গেছে?

আর উকিলবাবুর ফিরতে রাত হয়। তিনিও এসে বাড়িতে প্রথমেই রতনের খোঁজে থাকবেন। বয়েসটা যে খারাপ।

সুতরাং কথা বলার চেয়ে কাজ সেরে ফেলা বেশি জরুরী।

আর এ সময়ে কোথা থেকে উঠে গেল একটা ঘূর্ণিঝড়। হাওয়ায় খড়কুটো পাতার সঙ্গে কাগজের কুচিগুলি উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আকাশ মেঘলা নয়, চমচমে

জ্যোৎস্না। শহরের সব স্বাভাবিক। পুলিশ ব্যারাকে বিউগিল বাজছে, রাস্তায় রিকশা, গরুর গাড়ি সাইকেলের জ্যাম, তবু কেন যে ঘূর্ণিঝড়টা উঠে ওদের সব আকাঙ্ক্ষা লোপাট করে দিল।

তবু ওরা ছুটছে।

কেবল সমীরই জানে চিরকুটগুলিতে সে লিখেছে— শেলি আমরা তোমাকে ভালবাসি। তুমি কে আমরা জানি না। তুমি আমাদের সব আনন্দ নিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকো। কখনও জানালায়।

কেবল মনে হয়, ওই জানালার কাছে বসে আছে। করতলে রাখি মাথা। তুমি আমাদের কথা ছাড়া আর কারো কথা ভাবতেই পার না। আমরাও পারি না।

সে যাই হোক তিনজনই ঘূর্ণিঝড়টা ওঠায় হতভম্ব।

রতন বলল, সহেলি চায় না, এক নামে আমরা তাকে ভাবি।

সমীর হাঁটছিল। সে কিছুটা ছুটে গেছে, কাগজগুলির যদি খোঁজ পাওয়া যায়। সে রতনের কথা গ্রাহ্য করল না।

ওরা তিনজনই সারা চাঁদমারির মাঠে খুঁজে বেড়াচ্ছে যদি একটাও কাগজ উদ্ধার করতে পারে।

অনিল নুয়ে একটা কাগজ তুলল।

কাগজে ফর্দ লেখার মতো কি লেখা। ছেঁড়া কাগজের টুকরো। তাতে সে দেখল ছাপা হরফে লেখা-সুযোগ পেলেই সে মেলে ধরে তার ভ্রমণেতিহাসের অ্যালবাম। এখানে গেছি ওখানে গেছি, সেখানে গেছি। গেছি, গেছি....গেছি। অন্তহীন এই যাওয়া। আরও অনন্ত সেই যাওয়ার কীর্তির গল্প। তবু ক্ষীণ আশা, তোমরা একদিন প্রকৃত পর্যটক হবে। প্রকৃত প্রেমিক হবে।

লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে তারা তিনজনই ঝুঁকে লেখাটা পড়ল।

অনিল বলল, শিউলি এমনই চায়। সেই কাগজটা আমাদের হাতে পৌঁছে দিয়েছে। সে বোঝে আমরা আনাড়ি পর্যটক। তুখোড় পর্যটক না হলে সে আমাদের ভালবাসবে না। এভাবে গাছের আড়ালে বসে থাকা সে পছন্দ করছে না।

বাজে কথা। সমীর বলল।

রতন বলল, সে জানেই না তাকে দেখার জন্য আমরা গাছের আড়ালে বসে থাকি।

সমীর বলল, ঠিকই জানে। কোনদিন না রামধোলাই খেতে হয়। ধরলেই হলো। কী এত কাজ, একটা বাড়ির সামনে রোজ সন্ধ্যায় এসে বসে থাকার।

বাড়ির সামনে কোথায়? বাড়িটার পর শহরের রাস্তা। তারপর গাছের সারি। তারপর চাঁদমারির মাঠ। ওদের রোয়াকে বসে নেই যে ধরবে। আমরা শিউলিকে

টিজও করছি না। সে কখন বের হয় তাও জানি না। সুন্দরমতো মেয়ে দেখলে ফলো করি। তাও দূর থেকে। রামধোলাই দেবে—সোজা!

পাড়ার দাদারা যে ওৎ পেতে নেই কে বলবে। রতন ঠাট্টা করতে গিয়ে হেসে ফেলল।

সমীর বলল, ধরা না পড়লেই ভাল। তারপর থেমে বলল, আচ্ছা এভাবে তো হয় না। তাকে আমরা একটা চিঠি পৌঁছে দিতে পারি না!

কী ভাবে?

কাগজে লিখব, শেলি, তুমি জান না, লালের উপর ছোট্ট সোনালি চেক ও সরু সোনালি পাড় শাড়ি, সঙ্গে লম্বা মতো কোমর ঢাকা ক্রিম ব্লাউজ পরে তুমি যখন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাক, আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি।

কোথায় কবে দেখলি সে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে? রতনের প্রশ্ন।

বারে আমি তো তাকে এ-ভাবেই ভাবি। সে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। স্বপ্ন। রতন তারপর বলল, প্রেম কি নিষ্ঠুর! আমি জানি।

স্বপ্ন ছাড়া কি। তোরা কি কিছু ভাবিস না? স্বপ্ন ছাড়া বাঁচা যায় না। সে আছে বলেই আমরা আছি। সে আছে বলেই আমরা দূর অরণ্যে হারিয়ে যেতে চাই। অনিল না বলে পারল না।

ভাবি। রতন বলল।

কি ভাবিস।

চুল বেঁধেছে শাড়ির সঙ্গে মানিয়ে। ঠিক পানপাতার মতো মুখ না হলেও ভারি সুন্দর সে। কপালটা চাপা হওয়ায় খানিকটা নেসপাতি ধাঁচের। তাই সে চুলটা অল্প কপালের কাছে ফাঁপিয়ে রাখে। ওঃ ভাবা যায় না! অথচ তার নিষ্ঠুর পরিণতির কথা ভাবলে আমার কান্না পায়।

তুই অনিল কথা বলছিল না কেন?

কি বলব?

তুইও কিছু ভাব।

সমীর না বলে পারল না। কিছু ভাব। আমাদের সব উড়ে গেছে। শেলি চায় আমরা সবাই তার জন্য ভাবি। ভেবে ভেবে বড় হয়ে যাই। তার হাত ধরতে যেন শিখি। আমাদের সে কাপুরুষ ভাবতে পারে। সে যে সুন্দর, আমরা যদি তারিফ না করি কে করবে! পৃথিবীতে সে কার জন্য বড় হয়ে উঠছে! শেলি কেন ব্যবহার করে ডিমযুক্ত শ্যাম্পু যাতে আছে কন্ডিশনার।

ওরা তিনজনই পড়েছে একটি রূপচর্চার বই। মেয়েরা এত সুন্দর হয়ে যায় কি করে বড় রহস্য। রতনই তার দুই বন্ধুকে বইটি উপহার দিয়েছিল। বইটি পড়ে

মেয়েদের কিছু গোপন সৌন্দর্যের খবর তারা এভাবেই পেয়ে যায়।

কি করে টের পাস?

আমি যে সাইকেল চালিয়ে যাবার সময় কোনো কিশোরীর চুলের গন্ধ শুঁকি। ঘ্রাণে টের পাই। তুই পাস না?

পাই।

অনিল বলল।

কি পাস বলবি তো!

রতন না বলে পারল না। তারা হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় উঠে এসেছে। গাছের ছায়ায় হাঁটছে। রাস্তার আলো এবং জ্যোৎস্না তিন উঠতি যুবককে কেমন কুয়াশার মধ্যে ক্রমে ঠেলে দিচ্ছে।

অনিল বলল—চুল বাঁধার পর মুখের উপর নজর পড়ে তার। শুধু শাড়ি আর চুলে কি একটা মেয়েকে চেনা যায়?

তা অবশ্য যায় না। ওরা দুজনই স্বীকার করল কথাটা। আগ্রহ শোনার, অনিল কি বলে। তার কি পছন্দ।

সে মুখে ব্যবহার করে পারফেক্ট ন্যাচারাল মেকআপ। গমের মতো রঙ তার। সে জানে তার মুখের মেক-আপের সঙ্গে সারা শরীর জড়িয়ে আছে।

সে জানে ফাউন্ডেশন শুধু লাগালেই হবে না। এমনভাবে লাগাতে হবে কোথাও যেন জমাট না বাঁধে।

সে চোখে দেয় সোনালি ব্রাউন শেডের আইশ্যাডো। তার ওপর কাজল পেনসিলের রেখা। তার ওপর লাইনার। তারপর রোলঅন ব্রাশ দিয়ে চোখের পাতায় মাস্কারা। ভুরুর জন্য তার আছে কাঠবিড়ালি লোমের সরু মিহি ছোট্ট ব্রাশ। ব্রাশ দিয়ে ভুরু দুটো সে আঁচড়ে দেয়। দুই ভুরুর মাঝে সবুজ টিপ। আমি তাকে শুধু মুগ্ধ হয়ে দেখি।

সমীর বলল, সে কিন্তু গালে পিচ রঙের ব্লাশারও লাগায়। তুই খবরটা রাখিস না। গালের মাঝে ত্রিকোণ করে, থুতনিতে, কপালে। ঠোঁটে খয়েরি ছায়ার লিপস্টিক। ব্যস সে আমাদের। আমাদের জন্য রোজ তাকে এত খাটতে হয়। আমরা তাকে দেখব বলে সে এমনভাবে সুন্দরী হয়ে ওঠে। নজর সে কাড়বেই।

আমার কিন্তু আরও একটু ইচ্ছে আছে—সমীর বলল।

আর কি ইচ্ছে থাকতে পারে, অনিল বুঝতে পারল না। তারা তো আর কিছু চায় না। এই সৌন্দর্যই তাদের উদাস করে দিচ্ছে। এরই জন্য বাড়িতে তারা বিকেল হলেই থাকতে পারে না। সাইকেলে উধাও হয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। সারা পৃথিবীতে পুষ্পবৃষ্টি শুরু হয়ে যায়।

সমীর বলল, শরীরে সুগন্ধীর ছোঁওয়া থাকবে না! হাতে পায়ে নখ পালিশ থাকবে না! চুলে হাতে ফুলের অলঙ্কার থাকবে না?

অনিল বলল, থাকলে ভাল, না থাকলেও আসে যায় না। সে থাকবে আমাদের সঙ্গে।

তাকে নিয়ে যাব বেতলা ফরেস্ট। জঙ্গলে ঘুরে বেড়াব। ট্যুরিস্ট লজের পিছনের মাঠে দেখব বাইসনের রক্তচক্ষু। সে ভয় পেয়ে আমাদের জড়িয়ে ধরবে। ওঃ দারুণ মজা হবে।

সমীর বলল, যেখানেই যাই লটারি করে ঠিক হবে। শেলিও সঙ্গে থাকবে। তার মতামতের দাম না দিলে সে রাজী হবে কেন? আমরা ইচ্ছে করলে রাতে কোয়েল নদীর জঙ্গলের ভিতর ঘাপটি মেরে বসে থাকব। হরিণেরা দল বেঁধে জল খেতে আসবে। শেলি বলবে ঐ দ্যাখ, দ্যাখ না, একটা সুন্দর বাচ্চা হরিণ। আমাকে ধরে দাও না।

কে ধরতে যাবে।

কেন লটারি। লটারিতে ঠিক হবে, কে যাবে, কে যাবে না।

আমি কিন্তু জিপে চড়ে জঙ্গল ঘুরতে বের হয়ে পড়ব। আশা করি গাড়ি চালাতে শিখে যাব ততদিনে। আর কারো জন্য না হোক সহেলির জন্য হলেও আমাকে হুইলে বসতে হবে। পাশে থাকবে সহেলি। মত্ত হস্তীরা ধেয়ে আসবে। তবে সহেলি যে মুখে কোনো রঙই মাখে না। সে এত সুন্দর, রঙ মাখলে তাকে মানায় না।

অনিল বলল, জলদাপাড়ায়ও যেতে পারি। আমাদের কত ইচ্ছে—বই পড়ে, কাগজ পড়ে কত বেড়ানোর জায়গার নাম জেনেছি। যাওয়া হয়নি। মা বাবার সঙ্গে বেড়িয়ে কোনো আনন্দ নেই। নেতারহাটে একটা ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে আলাপ। একই বয়েস আমাদের--আর যেমন থাকে--পাহাড়, নদী, জঙ্গল, নির্জনতা। আর কি চাই। সহেলিকে নিয়ে ফের জায়গাটা দেখে আসব। বাবা মার সঙ্গে বেড়াতে জায়গাটার মানে ছিল একরকম, সহেলিকে নিয়ে গেলে হবে অন্যরকম। আরে সহেলি হবে কেন? সে যে আমার শিউলি। তারপর অনিল হাত তুলে দিল।

অর্থাৎ আর কথা না এখন। যে যার বাড়ি ফিরবে--আটটা বাজে। দেরি হয়ে গেছে। অনিল সাইকেলে উঠে বলল, আপাতত ঠিক থাকল তাকে আমরা যে যার নামেই ডাকব। লটারি হলো। ঘূর্ণিঝড় উঠে গেল। সে এক নাম পছন্দ করে না। শিউলিরই ইচ্ছে। সুতরাং নাম নিয়ে আর লটারি নয়। কী ঠিক?

সমীর বলল, ঠিক।

অনিল সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে বলল, কাল দেখা হবে। বাবা ফিরে আসার আগে হাজির না হলে পড়া বন্ধ করে দিতে পারে। ঘাড় ধরে দোকানে

বসিয়ে দিতে পারে।

রতন বলল, আচ্ছা বাবাগুলি কি রে। সবসময় আতঙ্কে থাকে। সময়মতো বাড়ি না ফিরলে মনে করে হারিয়ে গেছে। বাবাগুলির বোঝা উচিত না, এমন সুসময় আমাদের ঘরে ফিরতে ভাল লাগে।

পরদিন আবার যথারীতি তারা হাজির। সন্ধ্যা হয় হয় সময়। তারপর জ্যোৎস্না ওঠে। জানালায় সে এসে বসে। কখনও ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। পাশে আর দুজন মেয়ে সমবয়সী হবে। ওর বান্ধবী। ওরা তিনজন তারাও তিনজন।

ওরা বোধহয় কোথাও বের হবে। দূর থেকেও মনে হয় সাজগোজের বেশ ঘটা।

অনিল বলল, এই যাবি ?

কোথায় ?

গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

সমীর বলল, গেটের সামনে দাঁড়াবি ? কিছু যদি বলে ?

কি বলবে ?

বলতে পারে, কি চাই।

বলব কিছুই চাই না।

চাই না তো গেটের সামনে কেন। সরুন, দিদিমণিরা বের হবেন।

অনিল বলল, আমি ভাই যাব। তিনজনের একজন শিউলি হবেই। তাকে আমি দেখলেই চিনতে পারব। সে আমাকে দেখলে খুশি হবে। খুশি হলেই বুঝতে পারব তিনজনের একজন শিউলি। সে তো আমাকে দেখেছে তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম সে জানে। সেই ছেলেটা তবে ! খুশি না হয়ে যায় না। শিউলিকে চিনতে আমার কষ্ট হবে না।

রতন বলল, আমার সাহস নেই।

তুই কি রে ! প্রেমের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠা।

আর কুণ্ঠা ! মা বাবাকে বলেছে তোমার ছেলের পাখা গজিয়েছে।

অনিল বলল, সবারই এই বয়সে পাখা গজায়। আচ্ছা আমরা যদি এই বয়সে দামাল না হই, কবে আর হব বলতো। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে তোদের এত ভয় ! না হয় মারই খেলাম। মার খেয়েও যে আনন্দ—তাকে খুঁজে পেলাম।

রতন কিছুটা ট্যারচা চোখে অনিলকে দেখল। মার খেয়েও আনন্দ তাকে সে খুঁজে পেল। পাগলের মতো এই নিঃস্বার্থ প্রেমই সে আশা করে এতদূর এগিয়েছে। তবু বলল, বাবা যে বলল, ডানা গজিয়েছে তো ডানা কেটে দাও।

এমন কথা বলতে পারল ! সমীরের বিস্ময়। সমীর আর সাহসী না হয়ে পারে !

কোনো মেয়ে ছাদে কিংবা রেলিঙে অথবা ব্যালকনির আবছা আলোতে দাঁড়িয়ে থাকলে আর চোখে চোখ পড়ে গেলে বুকের মধ্যে ঘোড়ার পায়ের টগবগ শব্দ শুনতে পায়। শরীরে কত সহজে নারীরা ঝড় তুলে দিতে পারে বাবারা বুঝবে কি করে ?

সমীর বলল, চল। অনিলও বলল, চল। মরে গেলেও তাকে দেখব।

রতন এবার ধীরে ধীরে সুতো ছাড়তে থাকল। বলল, না। খবর নিয়েছি। বাড়িটাতে তারা তিন বোন থাকে। ভদ্রলোক বাবার কাছে গেছেন। আচ্ছা, তোরা কি মনে করিস, ভদ্রলোক আমাকে চিনতে পেরেছেন ! আমি তোদের সঙ্গে ঘুরি। লোকটা কনট্রাক্টর। দুটো জিপগাড়ি। গাড়িগুলি দেখেই বোঝা উচিত ছিল, কাঁচা পয়সা। কান পাতলে রেকর্ড প্লেয়ারে গানও শোনা যায়। আশ্চর্য তাঁর তিন মেয়ে—একজন গজল শুনতে ভালবাসে। ফাঁক পেলেই গজলের ক্যাসেট বাজায়। একজন হিন্দি ফিল্মের হিট গান। বলেই রতন থামল।

অনিল সমীর একসঙ্গে বলে উঠল, আর একজন...সে কি করে ?

সে চোখে দেখতে পায় না। সে ক্যাসেটে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনে।

তার মানে।

চোখে দুরারোগ্য ব্যাধি। জানালার কাছে বসে থাকে করতলে রাখি মাথা। সে ভালবাসে, গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে...।

অনিল বলল, তাহলে বুঝতে পারছিস সে ফুল ভালবাসে।

ফুল ভালবাসে কি না জানি না। তবে ওরা কেউ এখন বের হবে না। তোরা নিজের মতো করে ভাবিস। ওদের একসঙ্গে দেখেই ভেবে ফেললি ওরা কোথাও বের হবে।

তবে দৌড়ঝাঁপ কেন ? এত সাজগোজ কেন ? বার বার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের দেখছে কেন ?

রতন হাসল।

আয় বসি। লটারি। বের হবে কি না লটারি করি।

লটারি করে দেখল, বের হবে না।

তাহলে ওরা বের হচ্ছে না।

অনিল ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। মাথায় হাত দিয়ে শুয়ে আছে। মেয়েটা চোখে দেখতে পায় না। যাকে দেখে সে থমকে গেছিল এই কি সেই মেয়ে ! তাকে সে দেখেনি—অথচ সে তাকে দেখেছে ! আগুনের মতো জ্বলছিল। দৃশ্যটা চোখে ভেসে আছে এখনও। নদীর ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। না, খুব সকালবেলায়—আকাশে লাল রঙ ছিল সে মনে করতে পারছে। পিংক কালারের শাড়ি পরেছিল। আগুন

মনে হতেই পারে। কিন্তু ভিতরে কষ্ট—যদি সেই মেয়েটা চোখে দেখতে না পায়, তবে তো ভাল লাগার কথা আসে না। আসলে রতন ধাপ্পা দিচ্ছে না কে বলবে।

তুই সত্যি বলছিস, মেয়েটা চোখে দেখতে পায় না?

মিথ্যে বলব কেন?

তুই যে বলতিস, এ-বাড়ির কাউকে চিনিস না। কে বাড়িটায় থাকে জানিস না।

রতন কিছুটা নিজেকে সামলে নিল। সে বেফাঁস কথা বললে ধরা পড়ে যেতে পারে। এমনিতেই সংশয়, তুই এই শহরের ছেলে, এখানে জন্মেছিস, বড় হয়েছিস, খুব দূরও নয়, মফস্বল শহরে তো সবাই সবার হাঁড়ির খবর রাখে। তুই রাখিস না বিশ্বাস করতে হবে।

রতন এও বোঝে সমীরের পক্ষে কিছুই জানা সম্ভব নয়। তার দাদা বছরখানেক হলো এই শহরে বদলি হয়ে এসেছে। সে শহরটাই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভাল চিনত না। এখন ঘুরে ঘুরে সব চিনে ফেলেছে। আর অনিল তো থাকে রেল-লাইন পার হয়ে কলোনিতে। কলোনির স্কুলে পড়াশোনা। কলেজে ঢুকে শহরটাকে চিনতে শিখেছে।

তাহলে আজ তাকে নিয়ে কার গল্প বলার পালা? রতনের রহস্যময় প্রশ্ন।

পালা-ফালা রাখ। আমরা জানতে চাই মেয়েটা চোখে দেখতে পায় না কেন।

সে আমি কি করে বলব?

গুল। তুই মনে করিস, মেয়েটা চোখে দেখতে না পেলে আমরা আর তাকে গুরুত্ব দেব না। ভালবাসা বিষয়টা খুবই অন্ধ জানিস। গুণ দিয়ে তাকে বিচার করা যায় না, দোষ দিয়েও না। ভালবাসলে সব কিছু সুন্দর হয়ে যায়। অনিল ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

রাগ করছিস কেন? যদি নাই দেখতে পায়, আমাদের কিছু আসে যায় না। জানালার ধারে ম্রিয়মাণ আলোয় কোনো নারী মাথায় হাত রেখে বসে থাকলে মায়া হয়। সে হয়তো নির্বাসনে, তবে আমি চাই তার নির্বাসনের দিন শেষ হোক।

অনিল প্রায় ঝড়ের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো—সে উঠে বসল। হাত পা ছুঁড়ে বলল, মিছে কথা। তোর কুমতলব আছে। আমাদের ভাগিয়ে নিজে এসে বসে থাকতে চাস। তারপর ফাঁক বুঝে গেটে ঢুকে যেতে চাস। তুই ওদের ভালই জানিস। তিন বোন তারা। বাবা কন্ট্রাক্টারি করে। তিনি তোদের বাড়ি যান কেন?

বারে কতরকমের জমি সংক্রান্ত ডিসপুট থাকে। কন্ট্রাক্টারি করতে হলে একজন লিগেল আডভাইসার চাই জানিস।

তার মানে তুই এদের নাড়ীনক্ষত্র সব জানিস। আমাদের নিয়ে মজা করছিস।

শোন রতন, তোর কাছে এটা মজা হতে পারে, আমাদের কাছে মোটেই মজা নয়।

রতন ধমক না দিয়ে পারল না—কি পাগলের মতো বকছিস বলত। পাগল ছাড়া এভাবে জানালার ধারে কোনো নারীকে দেখে কেউ বসে থাকতে পারে! ভেবে দ্যাখ তো আমরা স্বাভাবিক আছি কি না। অস্বাভাবিক ঘটনা যে কেউ ভাববে।

ভাবুক। কে কি ভাবল, বয়ে গেছে। তুই আর কি জানিস বল।

আর কিছু জানি না। তবে জানি না বললে ভুল হবে, সহেলি ডিপ্রেসানে ভুগছে। মাঝে মাঝে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

সহেলি!

হ্যাঁ, সহেলি তার নাম।

অনিল থম মেরে গেল।

সমীর সেই থেকে কোনো কথা বলছে না।

তুই এ-সব জেনেও আমাদের প্রলুব্ধ করতিস! তুই মানুষ! বড়লোকের পোলারা মানুষ হয় না। তুই একটা পাষণ্ড।

রতন হেসে ফেলল, তা হলে আর লটারির দরকার নেই। সবই যখন তার জানা হয়ে গেছে তোদের, লটারি করে সময় নষ্ট, কি বলিস।

অনিল কি বলবে ভেবে পেল না। তার গলা শুকিয়ে উঠেছে। সমীর বলল, আমি উঠছি রে।

রতন সমীরের হাত ধরে বসিয়ে দিল। বলল, ভালবাসলে কাঙাল হতে হয়। ভালবাসলে খুঁত থাকে না। সব দোষ গুণ হয়ে যায়। কিন্তু তোদের কথা শুনে মনে হলো আসলে সব পুরুষরাই মেয়েদের চায় সর্বগুণান্বিতা হোক। সহেলি তাই। তবে সহেলিদি চোখে দেখতে পাবে না, এক বছর আগেও কেউ জানত না সে চোখে কম দেখছে। সে আমাদের চেয়ে বড়ই হবে কিছু। সহেলিদিকে দাদা ফাঁকি দিয়েছে।

তোর দাদা!

হ্যাঁ।

তিনি কোথায়

স্কলারশিপ নিয়ে বাইরে চলে গেছেন।

আর আসবেন না?

বোধহয় না।

সহেলি জানে।

জানে। জানে বলেই সে চুপচাপ হয়ে গেছে। সে দেখতে পাবে না, জানার পরই দাদার ভালবাসা-টাসা চটকে গেল। ডাক্তাররা অবশ্য আশা ছেড়ে দেননি।

মুশকিল ওকে বাড়ি থেকে, বাড়ি বলব কেন, ঐ ঘর থেকে বের করাই যাচ্ছে না। সে জানালায় চুপচাপ বসে থাকে। সে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকে। সে বিশ্বাস করতে পারছে না, দাদা তার কাছে আর ফিরে আসবে না। তার বিশ্বাস সে আসবেই। কোথাও যদি চলে যায়, ধর নেত্রালয়ে যদি যায়, চোখের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যায়, আর তখন যদি দাদা ফিরে আসে, তাকে দেখতে না পায়, তবে সে আর তাকে জীবনেও খুঁজে পাবে না।

একটু থেমে বলল, ইচ্ছে করলে অনিল তোকে আমি নিয়ে যেতে পারি। তোরগলার স্বর হুবহু আমার দাদার মতো। বাড়ি এসে প্রথম যেদিন ডাকলি, রতন আছিস—অবিকল দাদার গলা। চিৎকার করে বলতে যাচ্ছিলাম, মা দাদা এসেছে দাদা।

রতন মাথা নিচু করে রেখেছে। কারণ সহেলিদির জন্য তাদের পরিবারেও একটা চাপা অশান্তি আছে। মা সহেলিদিকে খুব পছন্দ করত। মার্জিত রুচির মেয়েটির গলায় আশ্চর্য গান—সহেলিদি আস্তে কথা বলে, গুরুজনদের সে শ্রদ্ধাভক্তি করত। পারিবারিক সূত্রে দাদার সঙ্গে সেই শৈশব থেকেই ভাব। দাদার সঙ্গে রেজিস্ট্রি পর্যন্ত হয়ে গেল। গোপনে দুজনে কাজটা সেরে ফেললেও জানাজানি হতে সময় লাগেনি। সহেলিদির অপেক্ষা—বাবা মার অপেক্ষা, দাদা প্রতিষ্ঠিত হলেই সামাজিক বিয়ে। এত সব যখন ঠিকঠাক, তখনই দাদা তার চিঠিটি পেয়ে গেল। চলে গেল। সহেলিদির আর কোনো খোঁজখবর নিল না। জানিস সহেলিদি বড় চাপা স্বভাবের।

অনিল বলল, চাপা স্বভাবের মেয়েরাই মানসিক ভারসাম্য হারায়।

তা জানি না।

তোর দাদা কি টের পেয়েছিল, সহেলির চোখের নজর কমে আসছে!

জানি না। আমার মনে হয়, দাদার জন্য চোখের জল ফেলতে ফেলতে, মেয়েটা দৃষ্টি হারিয়ে ফেলল। এই যে বলে না, প্রাণের উৎস, যা না থাকলে জীবন অর্থহীন, সহেলিদির জীবন অর্থহীন হয়ে গেছে। আগাগোড়া আমি সাথী। ওর ছোট দু বোন, পহেলি আর মহেলিকে দেখলে মনেই হয় না তারা একই মায়ের পেটের বোন। ওরা চঞ্চল স্বভাবের। পলি আর মলি দু'জনেই দিদির মতো দেখতে। ওরা একটু বেশি তরলমতি। ওদের সাজগোজের বহর দেখলি, কিন্তু বাড়িতে যদি যাস, দেখবি সহেলিদি কোনো প্রসাধনই করে না। অথচ কাছে গেলে কি যেন আশ্চর্য সুবাস—আমি কিন্তু আর কারো শরীরে এই আশ্চর্য সুবাস পাই না।

সহেলিদির বাবাকে আমরা অনাদি কাকা ডাকি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিন মেয়েই তাঁর সম্বল। বিয়ে থা করলেন না। এখন সহেলিদিকে নিয়ে খুবই আতান্তরে পড়ে গেছেন। আজই সকালে এসেছিলেন, বাবাকে বললেন, কি করব মোহনদা। মেয়ে

যে কিছু মুখে দিচ্ছে না। আমরা নাকি তার চিঠি লুকিয়ে ফেলছি। সকাল থেকে চিৎকার করছে, আমার চিঠিগুলি দিচ্ছ না কেন? আমি কি করেছি? রঞ্জনের চিঠি তোমরা লুকোচ্ছ কেন?

বাবার এক কথা, অনাদি, ছেলে আমার মুখে এভাবে কালি লেপে দেবে জীবনেও ভাবিনি।

সমীর বলল, তুই আগে বলিসনি কেন? তুই তো লটারি করতিস। তুইও এখানে এসে বসার জন্য ছটফট করতিস। ঘুণাক্ষরেও আমরা টের পাইনি, তোর মাথায় এত কুবুদ্ধি! আমরা যাব কোথায়? যার জন্য বসে থাকা, সে যদি অন্ধ হয়, মানসিক ভারসাম্য হারায়, তবে সে আর আগ্রহ সৃষ্টি করবে কি করে?

রতন অপরাধীর গলায় বলল, কেন যে মনে হলো, অনিলকে সহেলিদির কাছে নিয়ে যেতে পারলে আবার হয়তো আরোগ্য লাভ করবে। মানুষের ভালবাসা এক জায়গায় থিতু হয় না। দাদা বোধহয় সহেলিদির শরীর চিনে ফেলেছিল। তার কাছে সহেলিদির নারীরহস্যের কোনো কিছুই বোধহয় গোপন ছিল না।

অনিল কি বলবে ভেবে পেল না। তার যেতে ইচ্ছে করছে। সহেলিকে সামানাসামনি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। নারীরহস্য খোলামেলা হয়ে গেলে জীবন অর্থহীন হয়ে যায়, সে বিশ্বাস করে না। সব নারীকেই ধরা দিতে হয়। পুরুষকেও। সে নারীর গোপন রহস্যের কোনো খবরই রাখে না! নারী পুরুষের কাছে ধরা দিলে অপবিত্র হয়ে যায়, তাও সে বিশ্বাস করে না। সহেলিকে নিয়ে যে যতই লাম্পট্য করুক, সে সহেলিই আছে। তাকে ছুঁলে সে পবিত্র হয়ে উঠবে।

ওরা চুপচাপ বসে থাকায় সমীর বলল, তাহলে সহেলি, মানে আমাদের জীবনের আরাধ্যা দেবী, দেবী বলছি এজন্য—আমরা সবাই কোনো না কোনো সহেলির জন্য বড় হয়ে উঠছি। আমরা পড়ছি, আমরা সাইকেলে জ্যোৎস্নায় মাঠ পার হয়ে যাচ্ছি। আমরা বালির চড়ায় নির্জন রাতে তার কথা ভাবতে ভাবতে আকাশের নক্ষত্র গুনছি। কি ঠিক কি না?

আমরা চঞ্চল।

আমরা আধার।

আমরা নদীর পাড়।

সে নদী। বয়ে যায়।

আমরা গাছপালা। নদী বয়ে যাচ্ছে। হাওয়া উঠছে। ডালপালায় ঝড় তুলে দিচ্ছে। নদীতে ঢেউ। আমরা নদীকে ছুঁয়ে দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠছি।

সেই নদী যদি একদিন শুকিয়ে যায়, বালির চড়া জেগে ওঠে, ক্যাকটাসের অরণ্যে ঢেকে যায়, সাপখোপের উপদ্রব দেখা দেয়, পোকামাকড় হেঁটে বেড়ায়, তবে আর

সে যাই থাকুক নদী থাকে না। ভীতির কারণ হয়ে ওঠে, কি ঠিক কি না?

রতন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সবই ঠিক। তবু মানুষের যে কি থাকে। বাবা একদিন ডেকে হাতে একটা চিঠি দিলেন। আমার কাকার চিঠি। দাদা তাঁর সুবাদেই স্কলারশিপটা পেয়েছিল। তিনি বাবাকে সব জানিয়েছেন। চিঠিটার সবটা পড়তে পারিনি। ঘৃণায় মুখ আমার কুঁচকে যাচ্ছিল। তুই এত আত্মপর দাদা! সহেলিদির কথা এভাবে ভুলে যেতে পারলি! সহেলিদিকে তুই ঘৃণা করিস! তাকে তুই আস্তাকুঁড়ে ঠেলে ফেলে দিলি!

অনিল দু হাঁটুর ফাঁকে মাথা গোঁজ করে বসে আছে। এই শহরের নীরব ভূমিকায় সে মগ্ন। কিছুই তো হারিয়ে যায়নি—একটি মেয়ের জীবনে এত বড় ঝড় নেমে এসেছে, অথচ তার প্রতিক্রিয়ায় গাছের একটি পাতাও আন্দোলিত হচ্ছে না। জীবন ঠিক বয়ে যাচ্ছে। রতনকে কেন যে এ মুহূর্তে খুবই ধূর্ত মনে হচ্ছে।

সে বলল, রতন তুই আমাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে চাস?

যা খুশি বলতে পারিস। আমি রাগ করব না। ঐ যে একদিন বললি, তুই কাকে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে গেছিলি, তোর সব আনন্দ হয়ে সে ব্যালকনিতে অপেক্ষা করছে—আমাদের দেখাতে না পারলে তোর শান্তি নেই, সেদিনই মনে হয়েছিল, সহেলিদিকে তুই রক্ষা করতে পারিস। তোর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ই হবে। তবু এটা তো এই নয় যে, সহেলিদির কাছে দাদার হয়ে প্রক্সি দিলে তুই খাটো হয়ে যাবি?

রতন থেমে বলল, বাবা একদিন ডেকে বললেন, মেয়েটাকে আর বোধহয় বাঁচানো যাবে না। সাইকিয়াট্রিস্ট তাঁকে জানিয়েছে, যেদিন সে ভাববে, রঞ্জন আর আসবে না, মিথ্যা কুহকে সে তাড়িত, সেদিনই সে কিছু একটা করে বসতে পারে। তোদের ভাল লাগবে ফুলের মতো মেয়েটা মরে যাক?

সমীর আজও নোটবই নিয়ে এসেছিল। কথা ছিল, সহেলিকে নিয়ে যে যার মতো কল্পনায় বিচরণ করবে। কে করবে, তাও লটারিতে ঠিক করা হবে। কিন্তু সবই যে অর্থহীন হয়ে গেল। সহেলির বিশ্বাস তার চিঠি লুকোনো হচ্ছে। সহেলি নাকি তখন একেবারে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। গায়ে জামাকাপড় রাখে না। দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিতে হয়।

সমীর বলল, আচ্ছা সহেলি তো চোখে দেখতে পায় না।

না।

তবে ও চিঠি দিয়ে কি করবে?

চিঠি তাকে পড়ে শোনাতে হবে।

তা তোর দাদার নামে চিঠি লিখে পড়ে শোনালে হয় না।

চেষ্টা কম করা হয়নি। তার কি কথা—না না, মিছে কথা বানিয়ে পড়ছ। রঞ্জনের ভাষা এটা নয়। সে এভাবে চিঠি লেখে না। তোমরা ঠগ, জোচ্চোর। রঞ্জনকে খাটো করছ।

তোর দাদার ভাষা কি আলাদা?

দাদা তো সহেলিকে আগে চিঠি লিখতো। কি লিখত জানি না। চিঠিটা দাদা ডাকবাক্সে ফেলে আসত। হাতে দেবার সাহস হতো না। দাদার অজস্র চিঠি তার কাছে আছে। কি ভাষা জানি না। সহেলিদিকে চিঠিতে দাদা কি বলে সম্বোধন করত তাও জানি না। চিঠিগুলি সকালে উঠেই রোজ গুনে দেখে। ঠিক আছে কি না। কেউ যদি গোপনে চিঠি তার চুরি করে নেয় সেই আতঙ্কে।

রতন ফের বলল, এখন নাকি সকালে উঠে চিঠি গুনে দেখে। তারপর একটা চিঠি হাতে নিয়ে চুপচাপ জানালায় বসে থাকে। চিঠিটি মেলা থাকে সামনে। তারপরও বসে থাকে। শেষে চিঠিটা ভাঁজ করে আর তুলে রাখে না। ছিঁড়ে ফেলে। কুচি কুচি করে চিঠিটা ছিঁড়ে গরাদের ফাঁকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। তারপর পাগলের মতো হাসতে থাকে। পলি মলি ছুটে যায় টেনে নিয়ে আসে ঘরে। দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়।

অনিল বলল, বিশ্বাসের জোর হারিয়ে ফেলছে।

তাই মনে হয়।

এখন শেষ চিঠিটা ছেঁড়া হয়ে গেলেই তার আর কোনো অবলম্বন থাকবে না।

তাইতো মনে হয়।

তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে চাস। আমি তোর দাদার প্রক্সি দিলে, মেয়েটা বেঁচে যাবে বলছিস?

তাই। বাবা বলেন, এটা সহেলির ট্রানজিসন্যাল পিরিয়ড। মারাত্মক সময়। সময়টা পার করে দিতে পারলে সে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে। অনাদি কাকার সঙ্গে বাবার যখন কথা হয় আড়ালে শুনি। আর ভাবি, সহেলিদিকে কি করে রক্ষা করা যায়। ডাক্তারদেরও এই অভিমত। খুব বড় শক থেকে এমন হয়। শক সামলে উঠতে পারলে আর ভয় থাকে না। পরে সব বুঝিয়ে বললে বুঝবে। জানিস না সহেলিদি কী ধীর স্থির মেয়ে। বুঝবে প্রিয়জনের বিচ্ছেদকে জীবনে মেনে নেওয়া ছাড়া তার উপায় নেই। হয়তো একদিন হাসতে হাসতে বলবে, কী বোকাই না ছিলাম।

কিন্তু আমি কি পারব? অনাত্মীয় কোনো মেয়ের সঙ্গে কি আচরণ করতে হয় জানি না। কি করে কথা বলতে হয় জানি না। শুধু দূর থেকে সৌন্দর্য উপভোগ করি। কাছে যাবার সাহসই নেই। ধরা পড়ে গেলে কি হবে?

তখনই সমীর বলল, সহেলির বাবা রাজী হবেন?

অনাদি কাকার সঙ্গে কথা হয়েছে।

বললেন, দ্যাখ চেষ্টা করে। অন্তত আর কিছু না হোক ওর যদি মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসে তবেই অনেক। চোখের চিকিৎসার সময় পাওয়া যাবে।

অনিল বলল, একেবারেই দেখতে পায় না?

তা ঠিক না। ঝাপসা দ্যাখে। কাউকে চিনতে পারে না।

কেন এমন হলো?

গোপন কষ্ট। রতন বলল, খুব উত্তেজনা বোধ করছি। যাবি নাকি? বলে সে সিগারেটের প্যাকেট পকেট থেকে বের করল।

মনটা খুব এলোমেলো হয়ে আছে। উদ্বেগও কম না। তোরা শেষে কি ভাবে নিবি! আমার কাছে এটা এভারেস্ট অভিযানের মতো। জানিস তো মা কি বলেন, এই পাপের ফলভোগ নাকি আমাদের করতে হবে। মা-মরা মেয়ে, তুই তাকে ফুসলে ফাসলে সর্বনাশ করলি। তারপর ভেগে গেলি। মহাপাপ। বাবা তো মাকে দেখলেই এখন এড়িয়ে চলেন। বাবার আসকারা না থাকলে দাদা এত বাড় বাড়তে পারত না। মুশকিল কি জানিস, আমি দাদা আর সহেলিদির পায়ে পায়ে প্রায় মানুষ। সহেলিদিকে দেখলে বুঝতে পারবি, ওর কোনো কথাই অবহেলা করার নয়। কি সুন্দর কথা বলত।

এখন বলে না?

বলে। তবে কথায় কোনো উষ্ণতা নেই।

তোর সাড়া পেলেও তার উষ্ণতার জন্ম হয় না?

হলেও বুঝতে পারি না। কে, রতন? বোসো। ব্যস আর কোনো কথা না।

আবার তিনজনই চুপ। কেউ কথা বলছে না। চাঁদমারির মাঠে আজ আর জ্যোৎস্না নেই। রাস্তার আলোর আবছা অন্ধকারে তিনজনই সিগারেট খাচ্ছে পালিয়ে। কারো সেভাবে অভ্যাস নেই। সত্যিকারের এডাল্ট হতে হলে সিগারেট খাওয়া দরকার।

ওরা এখন খুবই অন্যমনস্ক।

ওরা তিনজনেই সহেলির কথা ভাবছে।

জানালার সহেলি বসে আছে। সে কি করছে বোঝা যাচ্ছে না। সহেলি শান্ত থাকলেই জানালার কাছে এসে বসে থাকে। বাড়ির নিচে কান পাতলে শোনা যায়, মিউজিক বাজছে। বাড়ির বিষাদ কাটিয়ে ওঠার এই একমাত্র প্রক্রিয়া পলি মলির। অনভ্যাসের ফোঁটা কপালে চড়চড় করে। তিনজনই সিগারেট টানতে গিয়ে খুক খুক করে কাশছিল।

রতন কাশতে কাশতেই বলল, দাদা আমার প্রচণ্ড বোহেমিয়ান, মনে রাখবি।

সুখ ভোগ করার মধ্যেও তার আনন্দ, আবার তা লাথি মেরে ভেঙে দিতেও তার আনন্দ। গেল পড়তে, এখন তো শুনছি ইউরোপ আমেরিকা চষে বেড়াচ্ছে। চাকরি নিয়েছে। তবে এক জায়গায় থিতু হয়ে বসছে না। কখন কোথা থেকে যে চিঠি দেবে আমরা আগে থেকে কেউ তা টের পাই না। সহেলিদিকেও চিঠি দিত। ব্ল্যাক ফরেস্টের বর্ণনা। আবার সুদূর সানফ্রানসিসকো থেকে চিঠি। তার কত শতবার যে প্লেনে চড়া হলো—দেশ বিদেশে, দূর আরও দূরে। দাদার নাকি প্রতিবারই প্লেনে চড়লে বুক গুড়গুড় করে। শঙ্কায় নয়, উত্তেজনায়। ওর পছন্দ লাল টুকটুকে একটা ভকসওয়াগন। জার্মানি থেকে ছবি পাঠিয়েছে—পাশে লাল টুকটুকে ভকসওয়াগন আর এক নারী। তার চেয়ে বয়সে বড়ই হবে। এমন কত ছবি যে পাঠায়। বাবা মা কেউ আর ছবি দেখে না। ছবিতে কখনই এক নারী থাকে না, এক গাড়িও থাকে না। বাবার দীর্ঘশ্বাস—শেষ পর্যন্ত আমার বংশের গর্বের বস্তুটি কুলাঙ্গার হয়ে গেল।

রতনের পারিবারিক বেদনা দুজনের মধ্যেই সংক্রামিত হচ্ছে। এত বড় বাড়ির ছেলে রতন, তার বাবা শহরের নামি অ্যাডভোকেট, গাড়ি বাড়ি স্বচ্ছলতা সব আছে, অথচ এক চাপা অশান্তির আগুন জ্বলছে। রতন যে এতদিন তাদের ধোঁকা দিয়েছে, শুধু সহেলির কথা ভেবে। অনিল বুঝল তার গলার স্বর রতন কাজে লাগাতে চায়। সে রঞ্জনের ডামি হয়ে যদি বাড়িটায় ফের উষ্ণতার ফোয়ারা তুলে দিতে পারে। সবাই পায়ে বল নিয়ে ছোটে। কেউ গোল দিতে পারে, কেউ পারে না।

সে পারবে কি না জানে না। তবু পায়ে একটা সবার বল চাই। যে যার মতো পায়ে বল নিয়ে ছোটে। ছুটতে ছুটতে বুড়ো হয়ে যায়। তারপর গাছ হয়ে যায়।

গাছ হয়ে যায় কথাটা কেন যে ভাবল। আসলে মানুষের এই নিরন্তর ছোটার ভিতরই থাকে জীবন। যে যেমন জীবনের অর্থ খোঁজে। সহেলিদির জন্য রতনের আশ্চর্য মায়ার কথা ভেবে কেন জানি আর তার উপর ক্ষোভ পোষণ করতে পারল না।

তখনই রতন বলল, আজকের পর্ব শেষ। সে ঘড়ি দেখল।

সমীর অনিল দুজনই ঘড়ি দেখল। ওঠার সময় হয়ে গেছে।

গাছে হেলান দেওয়া তিনটে সাইকেল।

যে যার সাইকেল নেবার সময় রতন বলল, কাল আমাদের রিহার্সেল। অনিল একটু আগে আসতে পারিস তো ভাল। তুই প্যান্টশার্ট পরে আসবি। পাজামা পাঞ্জাবি নয়। কলেজে তুই কেমন ফিটফাট বাবু, পায়ে সু, মনে থাকে যেন।

রিহার্সেলের কি আছে?

আছে। কাল বাকিটা হবে। আজ আর'কোনো প্রশ্ন নয়।

অনিলকে তারা রেল-লাইন পর্যন্ত এগিয়ে দিল। তারপর অনিল একা। রাস্তা নির্জন হয়ে আসছে। উত্তরবঙ্গের ট্রাক বাস সাঁ সাঁ করে বের হয়ে যাচ্ছে। হাইওয়ে পড়ার সময় পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য এই রাস্তাটা গাড়ির চালকরা ব্যবহার করে থাকে। বাড়িতে যত দুশ্চিন্তা—এই রাস্তাতেই পড়লে! মাঝে মাঝে দুর্ঘটনার শিকার হতে হয় সাইকেল আরোহীদের। সে কিছুটা অন্যমনস্ক। তবু রাস্তা বড় বিপজ্জনক। অন্যমনস্ক হলে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে।

কিসের রিহার্সেল!

এমন গম্ভীর গলায় বলল রতন, যে সে আর কোনো প্রশ্ন করতে পারেনি। প্রশ্ন করলে রতন কি বলত তাও সে জানে। কাল আয় না। এলেই বুঝতে পারবি কিসের রিহার্সেল। সি ইজ সামথিং স্পেশাল। সহেলি সম্পর্কে স্পেশাল কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা, রতন বোঝাতে চায়। সে অন্য মেয়েদের মতো নয় বলেই এত আকর্ষণ বোধ হয় তাদের।

রাতে সে খেতে পারল না ভাল করে। কেমন গুম মেরে গেছে। তার কেন জানি কিছুই ভাল লাগছে না। সে অন্যদিনের চেয়ে বরং একটু বেশি আগেই শুতে চলে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। জেগে থাকলে বৌদিরা পেছনে লাগতে পারে। বাবুর কি হয়েছে! মুখ ভার। কোথায় ঠোক্কর খেলে বাপু? ভাল করে খেলে না পর্যন্ত!

কথায় কথায় যদি সে সহেলির কথা বলে ফেলে। কিছুটা পেট পাতলা স্বভাবের। পেটে কথা থাকে না। আর এ তো এক সামনে যুদ্ধক্ষেত্র! রতনের ধারণা, সেই তাকে নিরাময় করে তুলতে পারবে। যে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, বালির চড়া জাগছে, ক্যাকটাসের অরণ্য সৃষ্টি হচ্ছে, সাপখোপ কীটপতঙ্গে ছেয়ে যাচ্ছে—সেখানে সে মরা গাঙে বান নিয়ে আসতে পারে। সে ভগীরথ।

রাতে তার ভাল ঘুমও হলো না। জলতেষ্টা পাচ্ছে। রতন হয়তা অনাদি কাকা থেকে পলি মলির সঙ্গেও তার সম্পর্কে আলোচনা করে নিয়েছে। এমন কি রতনের মা বাবারও সায় আছে। সাইকিয়াট্রিকেরা বলছেন, এটা একটা ট্র্যানজিসন্যাল পিরিয়ড। খুবই মারাত্মক সময়। শুধু সময়টা পার করে দেওয়া। কারণ তার চোখের চিকিৎসার জন্য নেত্রালয়ে নিয়ে যেতে হলেও তাকে স্বাভাবিক করে তোলার দরকার। যে চিঠি ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে, সে তার শেষ চিঠিও ছিঁড়ে ফেলতে পারে। সব নষ্ট করার শেষে আয়াসে নিজেকেও নষ্ট করে দিতে পারে। মগজের কোষে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে হিংসা এবং জ্বালা। এটা কত যন্ত্রণাদায়ক সহেলির সামনে গিয়ে না দাঁড়ালে

বোঝা যায় না। রতন মাথা নিচু করে এমন বলেছিল। দাদার কৃতকর্মের পাপ সে মাথা পেতে নিতে চায়।

পরদিন সে সত্যি বেশ আগেই গুদামখানার কাছে চলে গেল। রতন সমীর তার জন্য অপেক্ষা করছে। চাঁদমারির মাঠে বসার আর আগ্রহ নেই কারো। রিহার্সেল হবে। কিসের রিহার্সেল সে জানে না।

রতন বলল, চল কারবালার মাঠে গিয়ে বসি।

কারবালার মাঠ লাইন পার হয়ে। জায়গাটা খুবই নির্জন। কিছু পরিত্যক্ত ইটভাটা এবং বিশাল সব বৃক্ষের জঙ্গল। কবরভূমি, মিনার মসজিদ আছে কিছু। সবই ভগ্নপ্রায়। পলেস্তারা খসা। এত নির্জন যে দিনদুপুরে এলেও গা ছমছম করে। এমন একটা নিরিবিলি জায়গারই যে দরকার, রিহার্সেলের পর্ব শুরু হতেই অনিল এটা হাড়ে হাড়ে টের পেল।

অনিল, মনে রাখবি, চোখে যারা দেখে না, তাদের অন্য একটা ইন্দ্রিয় খুব প্রবল। স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ, স্বর-সবই কোনটা কার সে সহজে টের পেয়ে যায়।

ওরা তিনজনই একটা গাছের শেকড়ের উপর বসেছিল।

রতন বলল, সহেলি বলব, না সহেলিদি? আমি সহেলিদি ডাকতাম। তোরা শিউলি শেলি পছন্দ করিস। তবে সহেলি কিন্তু সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলেই টের পায় কে উঠে আসছে। পলি, মলি, অনাদি কাকা না, গোষ্ঠদা।

সমীর বলল, গোষ্ঠদা কে?

সে এক জীবনে এসেছিল সহেলিদির বাড়িতে রাজমিস্ত্রি হয়ে—আর এক জীবনে সে প্রায় বাড়ির কাজের লোক কাম গার্জিয়ান। সিঁড়িতে দাদার পায়ের শব্দ সহেলির চেনা। দাদা টো-এ লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙত। নিচ থেকেই চিৎকার করত, সহেলি, তোমার ফুল। সহেলি তোমার থিয়েটারের টিকিট। সহেলি কোথায় কোন আড়ালে আছ—সহেলিদি লুকোচুরি খেলত, উত্তর দিত না। আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ত। দাদা কোনো জবাব না পেলে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে শেষ অস্ত্রটি ছুঁড়ে দিত—হামভি পাগল হো জায়েঙ্গে। গজলের এ-লাইনটা দাদার ছিল মোক্ষম অস্ত্র। খুব চটপটে, দ্রুত লাফিয়ে ওঠা। এই দ্যাখ, বলে টো-এর উপর লম্বা হয়ে দাঁড়াল রতন। তারপর সিঁড়িতে লাফিয়ে ওঠার কায়দা।

দাদার পছন্দ ছিল বিদেশী আতর। আতর মাখতে কখনও ভুলবি না। চুলে জবাকুসুম। সব আমি দেব।

অনিল বলল, জবাকুসুম মাখলেই হবে।

রতন বলল, দাদা দশাসই পুরুষ। তুইও। একটা অসুবিধে হবে। দাড়ি তো তোর নরম উলের মতো। কাল আমরা যাব। দাড়ি কামিয়ে আসবি।

অনিল বলল, ধরা পড়ে গেলে। কিংবা পলি মলি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

করবে না। কারণ দিদিকে নিয়ে তারা খুবই অশান্তিতে আছে। দিদির কথা বলতে গেলেই ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলে। এত খারাপ লাগে। দু-হাতেই তোর বেশ লোম গজিয়েছে। বুকেও। বলা যায় না, তোর থুতনিতে হাত দিয়ে দেখতে পারে। গায়ের গন্ধ শুঁকে যদি টের পায়? পাবে না—আতরের গন্ধে সব ঢেকে যাবে।

মানুষের গায়ের গন্ধ কি আলাদা? এটা কিন্তু বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ছে। সমীর কিছুটা বিরক্ত হয়েই কথাটা বলল। হাড়িকাঠে নিয়ে যাবার আগে জবাফুলের মালাটি বেশ জুৎসই করে পরাচ্ছিস—বুঝি দরকার আছে, তাই বলে মানুষের গন্ধ কখনও আলাদা হয়। অনিল ভয় পেয়ে যাবে না। হাড়িকাঠে নিয়ে যাওয়াই দেখবি শেষে মুশকিল হবে।

রতন অপলক তাকিয়ে দুজনকেই দেখল।

এখানে গাছের নিবিড় ছায়া।

পাখির কলরব বনজঙ্গলে।

ওরা তিনজন শেকড়ে বসে আছে। বিশাল মহীরুহ। শিরীষ গাছ, প্রকাণ্ড কাণ্ডের তলায় তিমিমাছের মতো বড় বড় শেকড় ভেসে আছে।

রতন বলল, শিশুরা মায়ের গন্ধ টের পায় কি করে? কে তাকে কোলে নিয়েছে, মা না অন্য কেউ বোঝে কি করে? বলতে পারিস সহেলিদি এখন শিশু। তার অনুভূতিগুলি সাধারণ মানুষের চেয়ে প্রবল।

অনিল বলল, বেশ ঠিক আছে। চড়া আতরের গন্ধ তো থাকলই।

তুই তুড়ি বাজাতে পারিস?

তুড়ি! অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

রতন দু আঙুলে ফটাফট তুড়ি বাজাল। তারপর বলল, দু একদিনের মধ্যে এটাও তোমাকে রপ্ত করতে হবে। এই দ্যাখ, বলে বুড়ো আঙুল আর মধ্যমা সহযোগে কয়েকবার তুড়ি বাজিয়ে বলল, কাজটা কঠিন না। সহেলিদির কিছু প্রিয় গান আছে। দাদাকে গানগুলি শোনাতে ভালবাসত। গানের তালিকাটি এই নে। তুই গলা না মেলালেও চলবে। তবে মাঝে মাঝে সহেলিদি গান করতে না চাইলে জোরজার করবি। দাদার প্রিয় গানগুলি তোর জেনে রাখা দরকার।

এক নম্বর: যতখন আমায় বসিয়ে রাখ বাহির বাটে।

দুই: কোন সে ঝড়ের ভুল, ঝরিয়ে দিল ফুল।

তিন: বাজল তোমার আলোর বেণু, মাতল রে ভুবন।

বলে প্রায় দশ বারোটি গানের প্রথম চরণের একটি তালিকা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, এগুলো দাদার প্রিয় গান। দাদার এত সুন্দর রুচি গড়ে উঠেছিল—আসলে

ওদের বাড়িতে ঢুকলেই বুঝতে পারবি, ওদের কত সুন্দর রুচিবোধ।

একদিন বিকেলে আবার তিনজন হাজির। গেটের সামনে ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজাল তারা। উপরের ব্যালকনিতেও চোখ গেল। কেউ নেই। গেট খুলে দিয়ে সেলাম জানাল দারোয়ান—তারা যে আসবে বোধ হয় জানে। সেলামের বহর দেখেই তারা টের পেয়েছে। দু পাশে টবে নানা ক্যাকটাস পাতাবাহারের গাছ। সামনে সবুজ লন। ওরা ঢুকতেই দেখল পলি মলি ছুটে আসছে। অনাদি কাকা পেছনে। এত সামনাসামনি অনিল সমীর মেয়েদের এভাবে ছুটে আসতে কখনও দেখেনি। বিশেষ করে তারা দুজনই বলতে গেলে এ শহরে আগন্তুক। অনিল দারুণ নার্ভাস। তার গলা শুকিয়ে উঠছে। উৎসবের আনন্দ ছিল যে নারী, যে পৃথিবীর অপার সৌন্দর্য নিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে ক্ষণিকের জন্য দেখেছিল, কিংবা সে জানেই না, সেই মেয়ের চোখের নজর কমে আসছে, সে কিছুই দেখছিল না, তবু অনিলের কেন যে মনে হয়েছিল তাকেই দেখছে—চোখে চোখ পড়ে গেলে এত রোমাঞ্চবোধ সে কোনোদিন করেনি। এত উষ্ণতাও টের পায়নি—আজ তারই কাছে তাকে যেতে হচ্ছে একজনের প্রক্সি দিতে। তাকে নিরাময় করে তোলার এটা নাকি এক ধরনের চেষ্টা। সে যদি সত্যি কাজে লেগে যায় তবে আর কিছু না হোক, যে উষ্ণতার জন্ম প্রথম শিশিরবিন্দুর মতো হালকা নীলাভ আলোর গতিপথ সৃষ্টি করে দিয়েছে, তাকে মান্য না করে উপায়ই বা কি!

গাড়িবারান্দায় সাদা রঙের মারুতি। লাল রঙের সিট। সাইকেল তিনটি খুবই বেমানান। তবু আনন্দ, তারা তিনজন তিন বন্ধুর মতো হাজির।

হঠাৎই রতন ইশারা করল অনিলকে। অনিল ওর কাছে গেলে বলল, তোকে কিন্তু মাঝে মাঝে বিদেশ ভ্রমণের গল্পও করতে হবে।

বিদেশ ভ্রমণ! আমি তো কলোনি ছাড়া আর ইদানিং এই শহর ছাড়া কিছুই জানি না।

রতন বলল, তাহলে দাদার চিঠিগুলি দিলাম কেন। পড়িসনি! চিঠিগুলি পড়ে ফেললেই হবে। চিঠিগুলি আজই পড়ে ফেলবি। তোর বোহেমিয়ান স্বভাব সহেলিদি ভালই জানে। এমন একটা ভাব দেখাবি, যেন তুই ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর খবর পেয়ে গেছিস। গাছের মাথার উপর জমে আছে কুয়াশা, সামনে আঁকাবাঁকা বাঁধানো রাস্তা।

জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্টের ভেতরে গহন অরণ্যপথ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ কেঁপে দাঁড়িয়ে গেছিস-কোনও কবির লাইন মনে পড়ে গেছে—অথচ কোনো নারীসঙ্গের কথা মনে আসেনি। সহেলিদি আমার বড় সরল মেয়ে। সহজেই সব বিশ্বাস করে।

পলি মলি ছুটে গাড়িবারান্দায় এসেই চিৎকার, ও দিদি, রতনদা কাঁকে নিয়ে এসেছে দ্যাখো।

অনাদি কাকা ভালই ট্রেনিং দিয়ে রেখেছেন। অবশ্য দিদির কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

রতন পলি মলিকে বলল, এই অনিল চন্দ, আর এই হলো সমীর দত্ত। আমাকে তোরা চিনিস তো!

মারব গাঁট্টা। বাবুর পাত্তা নেই। দেখি সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন, যেন আমাদের চেনেই না।

রতন নিজের অপরাধবোধে ক্ষতবিক্ষত। তার দাদা ওদের দিদির সর্বনাশ করে পালিয়েছে। সে ওদের দেখলেই কেমন গুটিয়ে যেত। আসলে সে যে দাদার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছে তারা জানেই না হয়তো। কার মাথায় এমন পাকা বুদ্ধি খেলে গেল, অপ্রকাশ থাকতেই পারে।

অনাদি কাকা বললেন, ভিতরে এসে বোস।

তিনি পরেছেন সিল্কের লুঙ্গি। গায়ে লম্বা ঢোলা ফতুয়া। মুখে চুরুট।

এই রঞ্জন? রতনের দিকে বিমর্ষ মুখে অনাদিবাবু তাকিয়ে বললেন, রঞ্জন যাও উপরে যাও। ও তো চোখে একেবারেই দেখতে পায় না। বলেছি, রঞ্জন ফিরেছে। আজই আসবে।

অনিল খুবই ঘাবড়ে গেছে। অনাদি কাকা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এটা ভালই টের পেয়েছেন। শুধু বললেন, আমরা তো আছি। আমরা তো চাই সহেলি আরোগ্যলাভ করুক। নিজেকে তুমি এ-বাড়ির ছেলে মনে করলে আমরা খুশি হব। রতন তোমার সম্পর্কে সবই বলেছে। তবে ভুলেও শিউলি ডাকতে যাবে না।

অনিল খুবই লজ্জায় পড়ে গেল। সহেলির নাম নিয়ে তারা যে লটারি করত তাও তিনি নিশ্চয় জানেন। না জানলে বলবেন কেন, ঘুণাক্ষরেও ও নামে ডাকবে না।

এই পলি, ওদের ভিতরে এনে বসা। রতন, তুমি দেখছি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছ। এস, এস, ভিতরে এস। রঞ্জন উপরে উঠে যাও। তুমি ফিরেছ শুনে, সহেলি আজ অত্যন্ত স্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করেছে। ওকে বলেছি, আমি আশা করছি রঞ্জন নিশ্চয়ই হঠাৎ এসে তোমাকে সারপ্রাইজ দেবে।

অনিল অস্বস্তি বোধ করছে।

রতন বলল, ওকে একটু ধাতস্থ হতে দিন। দেখছেন না বাড়িতে ঢুকেই মুখ কেমন চুন হয়ে গেছে। জলে পড়ে গেছে মতো।

অনাদি কাকা মাথা নাড়লেন।

খুব কঠিন কাজ। কি যে হবে জানি না।

বাবাও বললেন, তোমরা ফাটকা খেলছ। ও-ভাবে হয় না। অনিল নিজেও সরল নিষ্পাপ ছেলে। ওকে এতবার সিঁড়িতে ওঠানামা করাচ্ছ—সে বলেই করছে। হচ্ছে না।

সিঁড়ি লাফিয়ে।

একটা করে সিঁড়ি বাদ যাবে। একি এতেই হাঁপিয়ে উঠলি!

বেশ দ্রুত উঠে যেতে হবে। তারপরেই ফিসফিস করে বলবি, সহেলি।

প্রথম দেখে সহেলিদি অভিমানে কথা নাও বলতে পারে। আরে তুই তো জীবন বাজি রেখেছিলি, আর এখন এত হাতের নাগালে, পা ফসকে যাচ্ছে? মরবি দেখছি।

মা কাছে এসে বলল, ইস! কি ঘেমে গেছে! বোসো অনিল। এই রন্টু বাবুদের চা দে। কিছু খাও। মিষ্টি না হয় চিকেন স্যান্ডুইচ। কি দেবে?

মাসিমা আমার চিকেন স্যান্ডুইচ খেতে খুব ভাল লাগে। বাড়িতে বাবা জানলে ধড়ুম পেটা করবে। আমি মুখ মুছে ফেলি, কাউকে বুঝতে দিই না।

এরপর মা কেমন গুম মেরে যান। বাবাও সিঁড়িতে ওঠার মুখে বলেন, অনিল একটা কথা মনে রাখবে, জীবনে যে কোনো বিষয়ে আন্তরিক হলে তার হার নেই। তবু তুমি এত সরল নিষ্পাপ, ভয় করে।

অনিল এটা অবশ্য বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে সে সহেলিকে সামনাসামনি দেখতে পাবে, কথা বলতে পারবে। সহেলি খুশি হলে তাকে গানও শোনাতে পারে—কিন্তু সহেলির সঙ্গে সে কথা বলতে গেলেই বিপদে পড়ে যাবে। সমবয়সী কিংবা দিদিদের বয়সী মেয়ের সঙ্গে সে তো কখনও প্রেম করেনি। প্রেমের ভাষা কি রকম হয় তাও জানে না। তার মুখ তবে চুন হবে না?

পলি মলি দারুণ সেজেছে।

খুশি ঝিকমিক করছে সারা শরীরে।

এই প্রথম সমীর টের পেল, সুন্দরী যুবতীর হাসির মতো সৌন্দর্য থাকে কোনো গয়নায়। অনিন্দ্য সুন্দরী যাকে বলে এই দুই বোন তাই। পলি পরেছে রুপোর গয়না। প্রেসাস আর সেমিপ্রেসাস স্টোন সেট করা।

সমীর নিজেও খুব ভাল জানে না অলঙ্কার বিষয়ে। হঠাৎ খুব আধুনিক সাজতে গিয়ে, অর্থাৎ এ-বাড়ির মানানসই যুবক হতে গিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। রতনই বলেছে, এরা কিন্তু তোমার আমার বাড়ির মেয়েদের মতো নয়। খুব খোলামেলা। বাড়িতে আলো হাওয়া ঢুকুক অনাদি কাকা চান। তবে কোনো দুর্গন্ধ থাকবে না—সহেলিদিকে দিয়ে এই খোলামেলা খেলাটা খেলতে গিয়ে হেরে গেছেন। তবে দমে যাননি।

নারী স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী। তোমরা কুয়োর ব্যাঙ হয়ে থাকলে নিজেরা ঠকবে বলে দিলাম।

সুতরাং সমীর যে কুয়োর ব্যাঙ নয় প্রমাণ করতেই উঠে গেল পলির কাছে। বলল, পাথরের মালার মাঝখানে তারের কাজ করা লকেটটা দারুণ দেখতে। কি পাথর ওটা ?

টাইগারস আই স্টোন।

ওরে বাপস। গলায় টাইগারস আই স্টোন ঝুলিয়ে বসে আছ ? আমাদের ভয় দেখাবে বলে ?

রতন খুশি। যাক একটার তবু জড়তা ভাঙছে।

পলি এবার নিজেই বুক থেকে পাথর মালা তুলে বলল, রাইস পার্লের মালার মাঝখানে বড় ডিমের মতো যে পাথরটা দেখছেন এটা গ্রে মুন স্টোন।

কি সুন্দর কথা বলছে। মেয়েদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মিশলে বন্ধুর মতো মিশলে কত সহজ হয়ে যায় তারা ! সমীর আজ পর্যন্ত সমবয়সী অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে এত সহজে কথাই বলতে পারেনি। মেয়েরা তাদের পোশাক এবং অলঙ্কারের প্রশংসা শুনলে খুশি হয়।

সমীর আরও মডার্ন হবার জন্য বলল, তাঁতের শাড়ির সঙ্গে এটা পরলে দারুণ মানাবে।

অনিল জড়সড় হয়ে এক কোণায় বসে আছে। অনাদি কাকা বোধ হয় হতাশ। তিনি উপরে উঠে গেছেন। গোষ্ঠদা চায়ের পট, চানাচুর এবং সন্দেশের থালা সাজিয়ে দিয়েছে। কাকার এই সব সাহেবি কায়দা বাবার খুব পছন্দ না, রতন জানে। তবু এবাড়ির দেয়ালে জানালায়, ঝাড়লণ্ঠনে এক দারুণ আভিজাত্য এবং কাকার এই রুচিবোধের সঙ্গে মানানসই তাঁর তিন কন্যা। কিন্তু সমীরটা যত সহজ হয়ে যেতে পারছে, অনিল পারছে না। বসার ঘরে ঢুকেও সে চুপচাপই ছিল। যেন মাথায় সে গন্ধমাদন নিয়ে বসে আছে। তা এমন হওয়াটা বিচিত্র নয়। অনাদি কাকা তো বলেছেন, চেষ্টা করে দেখ। অপমান, অসম্মান গায়ে মাখবে না। কি বিহেভিয়ার তার কাছ থেকে পাবে তাও বলতে পারব না। তবে রতনের কাছে শুনেছি, তাকে ব্যালকনিতে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলে। পৃথিবীর সব আনন্দকে আবিষ্কার করেছিলে তাকে দেখে। সে নিরাময় হয়ে উঠলে, আনন্দ কত গভীর হয় টের পাবে।

এত সব উৎসাহ সত্ত্বেও ব্যাটা তুই ম্যাদামারা হয়ে গেলি ! এবারে টেনে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ির দিকে ঠেলে না দিচ্ছি তো আমার নাম রতন নয়। তবে তার আগে বাড়ির সঙ্গে খাপ খেয়ে নিতে না পারলে অসুবিধে হবে। সে ইশারায় মলিকে দরজার কাছে নিয়ে গেল— কি বলল, কে জানে !

মলি চায়ের পট থেকে দুধ ঢালার সময় বলল, দুধ ?

অনিল ঘাড় নাড়ল। মানে হ্যাঁ।

চিনি ক' চামচ ?

তিন চামচ।

খুব মিষ্টি হবে কিন্তু।

হোক।

যা হোক কথা ফুটছে।

তারপরই পলি গলার লকেটটা তুলে বলল, বলুন তো লকেটের চারপাশে ঘিরে পাথরগুলি কি পাথর ?

জানি না।

কিছুই জানেন না অথচ লটারি করতে জানেন ! ভেবে নিন না এটাও লটারি। যা হয় কিছু বলুন। মিলে গেলে ভাল না মিলে গেলেও ভাল। সব মেলে না জানেন। আপনি সর্বজ্ঞও নন। এটা একটা খেলা হোক না।

অনিল বলল, টিকটিকির ডিমের আবার বাহার কি !

মশাই এগুলি টিকটিকির ডিম নয়। আমেরিকান ডায়মন্ড।

হবে।

হবে না, বলুন এগুলো আমেরিকান ডায়মন্ড।

আমেরিকান ডায়মন্ড। হলো তো ! খুশি।

না খুশি না। লটারি খেলবেন, হারজিত থাকবে না ? সারাজীবন লটারির টিকিট কেটে একটাও ওঠে না। আবার কেউ প্রথম টিকিটেই লক্ষ টাকা পেয়ে যায় জানেন ?

জানি।

তবে এটাও লটারি ভাবতে ক্ষতি কি !

ক্ষতি নেই।

সব তো বোঝেন। জানেন আমার দিদির পাথরের গয়নার দুর্দান্ত কালেকশান আছে। রঞ্জনদার সব পাথরগুলো চেনা। এটা বলুন কি ? বলে মলি তার নিজের পুঁতির মালা তুলে ধরল অনিলের সামনে।

জানি না।

কিছুই জানেন না। সহেলি পছন্দ না। শিউলি। কেন শিউলি ছাড়া কি আর ফুল নেই, শিউলি ছাড়া কি আর ফুলের মালা গাঁথা যায় না। পাথরের মালা কত সুন্দর হয় জানেন ?

দেখছেন তো দু লহরি মালটিকালার পুঁতির মালায় লাগানো হয়েছে তারের কাজ করা একটা ঢোলকের মতো লকেট। গলায় পরলে একেবারে অন্য চমক। কোথায়

লাগে শিউলি ফুল।

অনিল জড়তা কাটিয়ে উঠেছে। বলল, ফুল, ফুলই। তার অন্য কোনো উপমা নেই।

আছে। উপমা আছে। উপমা তৈরি হয় চোখের গুণে। সাদা রঙ ছাড়াও উপমা থাকে যেমন গাঢ় সবুজ, হালকা সবুজ অনিকস্, হালকা বেগুনি অ্যামথিস্ট, ক্যাটস আই, গোল্ডেন টোপাজ, স্যান্ডস্টোন। তাদের সঙ্গে মুক্তোর ছড়া মিলিয়ে হয়েছে অপূর্ব সব লকেট। লকেটের চার পাশের সূর্যচ্ছটায় নারী আরও সুন্দর। বুঝতে শিখুন।

তারপরই মলি অনিলের পাশে বসে পড়ল।

অনিল সরে বসতেই মলি তাকাল রতনের দিকে। তারপর দুই বোনই হেসে দিল।

পলি বলল, হবে না।

মলি বলল, গাঁইয়া।

অনিল, তোর মান অপমান বোধ নেই? তুই কিচ্ছু বলছিস না!

সমীর সহজেই তবে পাল্লা দিতে শিখে গেছে।

মলি এবার অনিলের পাশে আরও সরে গেল। অনিল বুঝল, সরে বসা ঠিক হবে না। মলিকে এতে ছোট করা হয়। মলি খুশি। যাক বোধবুদ্ধি জন্মাচ্ছে। তার গায়ে পড়া ভাবটা অনিলের পছন্দ না। কিন্তু উপায়ও তো নেই। সহজ স্বাভাবিক করে তুলতে না পারলে সিঁড়ি আর ভাঙতে হবে না। তার আগেই ঠোক্কর খেয়ে চিৎপাত। দুর্ঘটনা।

নিন চা।

মলি চা দিল হাতে।

আপনি ফ্লেভার পছন্দ করেন, না লিকার।

দুটোই পছন্দ করি।

যাক তবে আর ভাবনা নেই। বলেই কানের একটা দুল চুল সরিয়ে ধীরে ধীরে খুলে ফেলল। হাতে নিয়ে বলল, দেখছেন তো সোনার ফুলটির মাঝখানে কেমন এক আশ্চর্য স্বপ্নের মতো কোরাল বিডস ঝুলছে। এই দুল পরে যেই যাবে বিয়ে বাড়ি কিংবা পার্টিতে, সবার নজর তার দিকে পড়বেই। কোনটা ক্যাটস আই, ল্যাপিসল্যাজুলি, গোল্ডেন টোপাজ, স্যান্ডি স্টোন, কোরাল বিডস না চিনলে ধরা পড়ে যাবেন। দিদি হাত দিয়েই চিনতে পারে কোনটা কি স্টোন। রঞ্জনদার কাছ থেকে আমরা এই অলঙ্কারের নেশা খুঁজে পেয়েছিলাম। তিনি আমাদের গড়িয়াহাটে নিয়ে ঘুরতেন। সব চেনাতেন। আপনি না চিনলে চলবে কেন?

ধরা পড়লে বলব ভুলে গেছি। তিন চার বছরে ভুলে যাওয়াটা নিশ্চয় অন্যায় নয়।

সাবাস অনিল। রতন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। উপস্থিত বুদ্ধি তোর আছে। মুখ চুন করে রাখার আর দরকার নেই।

অনিল চুপচাপ হয়ে গেল ফের। চা খাচ্ছে। দুঃশ্চিন্তা কাটছে না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে বোকামি করে ফেলেছে। কেন যে রাজী হয়ে গেল? রাজী হয়ে গিয়ে কতটা ফাঁপরে পড়ে গেছে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। তবু কেন যে থেকে যায় মনের গভীরে অপার কৌতুহল—সহেলিকে সামনাসামনি দেখার প্রলোভনে এতটা দায় নেওয়া খুবই অনুচিত কাজ হয়েছে। বাবার কানে কথাটা উঠলে তিনি ক্ষেপে যাবেন। চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করবেন, তুমি কি পাগল? তোমার বোধবুদ্ধি যুক্তি সব হারিয়েছ? কে এক সহেলি তার কাছে যাচ্ছ। মাথা খারাপ তোমার না সহেলির বুঝতে পারছি না।

পলিকে রতন কেন উপরে পাঠাল বুঝছে না।

পলি তরতর করে ফের নেমে এল।

কি করছে!

বসে আছে।

দীপুদি কি করছে?

দীপুদি ক্যাসেট খুঁজছে।

আর তখনই মনে হলো রিনরিন করে বেজে উঠছে—ভালোবেসে যদি কিছু নাহি, তবে কেন মিছে ভালবাসা।

দীপুদি ক্যাসেট চালিয়ে দিয়েছে। দীপুদিই দেখাশোনা করে সহেলির। অনাদি কাকার দূরসম্পর্কে আত্মীয়া। মেয়েটা সারাদিন ক্যাসেট চালিয়ে নিভৃতে শুধু গান শুনতে ভালবাসে। পৃথিবীর এক অখণ্ড মণ্ডলের মহিমা সম্ভবত গানে টের পায়। অনিল সবই জানে। এই গানই তাকে জীবনের নব নব উন্মেষে হয়তো একদিন পৌঁছে দেবে। যে গান ভালবাসে সে কখনও নিজেকে বিনাশ করতে পারে না। সে ভিতরে সাহসী হবার চেষ্টা করছে। ধীরে ধীরে উঠল। ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে এগোল। রতন প্রায় দম বন্ধ করে তাকিয়ে আছে। কি হয় কি হয়? এ কি অনিল তো একদম পাত্তা দিল না—দৌড়ে ওঠা সিঁড়ি লাফিয়ে ভাঙা—কিছুই করছে না। সে যে-ভাবে সিঁড়ি ধরে উঠে যায়, তার এতটুকু ব্যতিক্রম নেই—অনিল কি বোঝাতে চায়, সে অনিলই, সে রঞ্জন নয়!

সিঁড়ির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলে ওরা চারজনই ধপাস করে বসে পড়ল।

আর অনিল উপরে উঠে দেখছে, সহেলি কোনো দিকে তাকাচ্ছে না। সে করতলে

মাথা রেখে নিজেই গান গাইছে। এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।

সে দেখছে। শুধু দেখছে।

দুধে আলতায় রঙ। চুল এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছে। দেয়ালের দিকে চোখ। দেবী প্রতিমার মতো অপলক। সে কাছে যেতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না। তার পায়ের শব্দে কোনো বাধা সৃষ্টি করুক গানের সে চায় না।

দীপুদি ইশারায় তাকে বসতে বললেন।

কোনো শিশু যখন সমুদ্র দেখে অবাক হয়, জল ছলছল করে ধেয়ে আসে, শিশুর ভয় থাকে না, উচ্ছল নীল ফেনিল জলোচ্ছ্বাসের মতো সহেলির সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করছে। নারী দেবী হয়ে যায়, সহেলিদিকে না দেখলে সে বুঝতে পারত না। গলার স্বর নকল করে হারিয়ে যাওয়া মানুষের প্রক্সি দেওয়া গেলেও, ব্যর্থতার শেষ কথা রঞ্জন নামক কোনো যে যুবার কাছে গচ্ছিত নেই, গানের ভাষা থেকে সে তা যেন ধরতে পারছে।

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।

রঞ্জন ফিরে আসতে পারে, গ্রহণও করতে পারে। কিন্তু সবই শারীরিক ঘটনা, সহেলিদি আরও অনেক দূরের খবর পেয়ে গেছে। গলা নকল করে তাকে কিছুতেই ঠকানো যায় না। তার মাথা নুয়ে আসছে। ভালবাসা মানুষকে কত কাঙাল করে দেয়, সহেলিদিকে না দেখলে সে টের পেত না।

তার চোখ জলে ভার হয়ে আসছে। ভালবাসা মানুষকে পবিত্রও করে দেয়। সে কাছে এগিয়ে গেলে সহেলিদি তার দিকে মুখ ফেরাল।

কে ?

আমি অনিল সহেলিদি। রতনের বন্ধু। অনেক দিন থেকে তোমাকে দেখার ইচ্ছে ছিল। গান শোনার ইচ্ছে ছিল। বলে সে দু হাত বাড়িয়ে পা ছুঁল।

তুমি রঞ্জন না ?

না দিদি !

আশ্চর্য মুখের অবয়বে কোনো বিষাদের রেখাই ফুটে উঠল না। বরং যেন মুক্তির স্বাদ পেয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে শুধু সহেলি বলল, তুমি আমাকে ঠকাওনি অনিল। আমি জানতাম তুমি আসবে। গলায় তোমার রঞ্জনের আভিজাত্য আছে। তবু তুমি ধরা পড়ে যেতে। আর আমি ঠকে গেলে তুমি নিজেই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেতে। বোস।

অনিল চুপচাপ বসে থাকল। গান শুনল। সহেলিদি কী তবে সব খবরই পায় ! যার ষষ্ঠেন্দ্রিয় এত সজাগ তাকে দেবী ছাড়া আর কি ভাবতে পারে।

সে বলল, সহেলিদি আমি যদি রোজ আসি, গান শুনি, তুমি খারাপ ভাববে

না তো !

সহেলিদির মুখে সেই এক অপার্থিব হাসি।

বলল, তা কখনও হয়।

তুমি ভাল হয়ে যাবে কথা দাও।

আমি তো ভালই আছে।

রতন যে বলল, তুমি ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে চাও না।

আমার ইচ্ছে করে না। আমার সব কিছু এই ঘর বা ব্যালকনি, এখানে বসে থাকলে সব দেখতে পাই।

তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ।

সহেলি বলল, না দেখতে পেলে কি দেখা হয় না !

অনিল এবার আব্দার না করে পারল না, তুমি নাকি ঘরে ছেড়ে যাবে শুনলেই ক্ষেপে যাও।

কে বলেছে ?

রতন।

আমি যদি ঘর ছেড়ে যাই কি হবে ?

তোমার চিকিৎসা। চোখের।

কি হবে ! চোখের চিকিৎসা করে ?

কি বলছ সহেলিদি। কি হবে মানে ?

সহেলি হেসে দিল। বলল, যখন চোখ ছিল, তখন সব দেখতাম নিজের মতো করে। এখন সব দেখি তাঁর মতো করে। এতে কত আনন্দ আছে বুঝবে না।

অনিল বলল, তুমি কি করে জানলে, আমি প্রক্সি দিতে আসব। কেউ তোমাকে বলেছে।

না। কেউ বলেনি। তোমরা মাঠে বসে থাকো। গাছের ছায়ায় কিংবা জোৎস্নায়—আমি শুয়ে থাকি ঘরে। বিছানায় কান পেতে শুয়ে থাকলে পৃথিবীর কত খবর যে চলে আসে। একদিন শুনলাম, গাছের নিচে বসে আমার নাম নিয়ে কারা লটারি করছে। রতনের গলা পেলাম, দীপুদিকে বললাম, জিজ্ঞেস কর তো রতনকে, আমাকে নিয়ে কারা লটারি করে ?

রতন বলেছিল, সহেলিদিকে নিয়ে আমরা লটারি করি। তাছাড়া রতন দীপুদিকে বলেছিল। খুব গোপন—অনিল আমার বন্ধু। দাদার হয়ে আর কিছুদিন যদি অনিল প্রক্সি দিতে পারে, তবে সহেলিদি হয়তো আরোগ্যলাভ করতে পারে। রতনটা এত বোকা ! আচ্ছা তা কখনও হয়। রতন কেন—সবাই বাবা, পলি, মলি, মাসিমা মেসোমশাই সবাই। ওরা জানেই না আমার কাছে রঞ্জন বলে কোনো পুরুষের গুরুত্ব

নেই।

তবে তুমি যাবে না কেন?

কোথায়?

তোমার চোখের চিকিৎসার জন্য।

গিয়ে কি হবে?

তুমি ভাল হয়ে যাবে সহেলিদি।

না। আমি জানি ভাল হব না।

তুমি কি ডাক্তার?

ভাল হলে লাভই বা কি?

আমি যে বসে আছি।

তোমাকে দেখার জন্য আমার চোখ ভাল হওয়া দরকার বুঝি! তুমি অনিল দেখতে কেমন, আমার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে দেখি। তারপর থেমে থেমে বলল, সবাইকে বল, আমি যাব। আমি রাজী। অন্তত চোখ ভাল হলে তোমাকে দেখতে পাব এই আশাতেই যাব। অন্তত রঞ্জনের প্রক্সি দিয়ে তুমি নিজেকে খাটো করনি, তুমি নিজের মতো আমার কাছে এসেছ—আমি তোমাকে দেখতে পাব ভাবতে কী ভাল লাগছে।

অনিল বলল, উঠি সহেলিদি।

এস।

আবার আসব।

নিশ্চয়,

গান শুনব।

শুনবে। আমি আর কি গাই!

সে উঠে দাঁড়ালে সহেলিদি এগিয়ে আসতে লাগল। একজন অতিথিকে যেমনভাবে দরজায় বিদায় জানায় সহেলিদি, তাকে ঠিক সেইভাবে বিদায় জানাল।

অনিল নিচে নেমে কারো সঙ্গে কথা বলল না। কেমন ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছে। সে রাস্তায় নেমে সাইকেলে ওঠার সময় দেখল, সহেলিদি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে, তাকে হাত তুলে বিদায় জানাচ্ছে। হাত নাড়ছে।

কি করে হয় সে বোঝে না।

তবু হয়। এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

প্রেম—এক

সকালবেলার ট্রেনে সে এসে স্টেশনটায় নামল। ডিসেম্বরের সকাল বলে বেশ শীত জাঁকিয়ে পড়েছে। তার ঘড়ি নেই, তবু বুঝল নটা বেজে গেছে। সাড়ে আটটায় ট্রেন ইন করার কথা। গাড়িতে যাত্রীরা বলাবলি করছিল, আধঘন্টা লেটে ট্রেন রান করছে। দশটায় হাজিরা দেবার কথা। রিকশাতে মিনিট ত্রিশেক সময় আর লাগতে পারে। সে নেমেই সুটকেস এবং বেডিং বগলদাবা করে স্টেশনের বাইরে চলে এল। বাইরে এসে বুঝল, সে একাই ওখানে যাচ্ছে না। আরও কেউ কেউ আছে। এদের মধ্যে দুচারজন মেয়েও আছে। সঙ্গে আছেন তাদের অভিভাবকরা। কেউ দাদা কিংবা কাকা হবে। রিকশার সঙ্গে দরাদরি করার সময় তাদের কথাবার্তা কানে আসছিল। আজই শেষদিন। চিঠিটা সে একটু দেরিতে পেয়েছে। লেখা আছে সেকেন্ড ডিসেম্বর থেকে সিক্সথ ডিসেম্বরের মধ্যে হাজির থাকতে হবে। সিক্সথ ডিসেম্বর সকাল দশটার মধ্যে হাজির না হলে ধরে নেওয়া হবে সে বাতিলের খাতায়।

সে যে মফস্বল শহরটায় থাকে, সেখান থেকে আরও একজন এসেছে। নাম দিলীপ ভৌমিক। দিলীপ খোঁজখবর নিতে গেছিল তার চিঠি এসেছে কি না। এলে একসঙ্গে রওনা হওয়া যেত। কিন্তু না আসায় দুদিন আগেই দিলীপ রওনা হয়ে চলে এসেছে।

সে ধরে নিয়েছিল, প্রাথমিক স্কুল থেকে তবে সত্যি পি জি বি টির জন্য ডেপুটেশনে আসা যায় না। তার হবে না, এটাও সে নিশ্চিত হয়ে গেছিল। এটা যে ডাক গোলযোগের বিভ্রাট, সে তা আদৌ অনুমান করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত ঠিক সময়ে স্টেশনে পৌঁছে গেছে। ভিতরে যে অস্বস্তি ছিল সেটা মুহূর্তে উবে যাওয়ায় চারপাশটা এক নজর ভাল করে দেখে নেবার যেন সুযোগ পেয়ে গেল।

স্টেশনটা একটা মহকুমা শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে। যেমনটা হয়ে থাকে স্টেশন সংলগ্ন শহর—যেমন মিষ্টির দোকান, স্টেশনারি দোকান অথবা হিন্দু হোটেল এই সব আর কি, সবই আছে একই রকম ভাবে। রিকশায় বসে সে এসব দেখতে দেখতে বলল, কতক্ষণ লাগবে?

রিকশার চালকটি বুড়ো। সে বলল, বলা যাবে না।

কথাটাতে সে বিষম খেল যেন। বলে কি!—বলা যাবে না মানে?

রেলের ক্রসিংয়ে দেরি হতে পারে বাবু।

সে বুঝল, তাহলে একটা রেল ক্রসিং পার হতে হবে।

সুটকেসটা হড়কে যাচ্ছিল। সে সেটা ধরে ফেলল। ভেতরে যে অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করছিল, সেটা আবার শুরু হয়েছে। রিকশায় বসলে চারপাশ দেখে যাবার একটা বাতিক আছে তার। এই যেমন শহরের কোন দিকটায় কোন পথ চলে গেছে। সিনেমা হাউস কোন দিকটায়, কি নাম, কিংবা নতুন জায়গাটা তার শহরের থেকে কোথায় ব্যতিক্রম সেটাও জানার ইচ্ছা থাকে তার। 'বলা যাবে না' কথাটা শোনার পর সে শহরের বাড়িঘর দেখার আর কোনো স্পৃহা বোধ করল না। আর তখনই মনে হল, একবার জিজ্ঞেস করবে নাকি। পাশ দিয়ে একটা রিকশা তার রিকশাটা কাটিয়ে যাচ্ছিল। সেই মেয়েটি। মেয়েটি তার দিকে স্টেশনে তাকিয়েছিল একবার। বোধ হয় মেয়েটিরও মনে হয়েছিল, একই জায়গায় তাদের গন্তব্যস্থল। আর কি যেন থাকে, কোথাও কেউ চোখ তুলে তাকালেই বুঝতে পারে এ-মেয়ের স্বভাব কেমন। রাগী, অহংকারী, না সরল। কিন্তু সে মেয়েটির চোখ দেখে কিছুই অনুমান করতে পারেনি। বড় নির্বিকার যেন চোখের দৃষ্টি। তবু সে সাহস করে বলল, এই যে শুনুন।

মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখল। একটা ছোট্ট জ্যামের মধ্যে তারা পড়ে গেছে। সে নেমে বলল, আপনি কি রানীসোলে যাবেন?

'রানীসোল যাবেন' কথাটা যেন মেয়েটি শুনতে পায়নি। শুনলে অন্তত চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ত। তা পড়েনি। আসলে চারপাশে এত কোলাহল, গাড়ির হর্ন, রিকশার প্যাক প্যাক শব্দ, তার প্রশ্ন না শোনারই কথা। নাকি সে খুব নিচু গলায় কথাটা বলেছে। গলার স্বর ভাল সরেনি। অস্পষ্ট ছিল। কিংবা কোথাও গোলমাল করে ফেলেছে।

রিকশায়ালা বলল, লেবেল ক্রসিং খোলা নেই বাবু। দেরি হবে। রিকশায়ালা গাড়ি থেকে নেমে পাশের একটা দোকানে ঢুকে কি কিনতে গেল। সে নতুন। রিকশায়ালা নেমে যেতেই বুঝল, সময় লাগবে। কপালে দুর্ভোগ আছে। এবারে মনে হল তার, কাছে গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে।

সে নিজেও নেমে গেল।

আপনি রানীসোলে যাচ্ছেন—যদি যায়, যেন তবে লেট মার্কের আরও একজনকে পাওয়া গেল—একা থাকলে যে অস্বস্তি, দুজনে কিংবা আরও যাদের মনে হয়েছে, সঙ্গে যাচ্ছে—সবাই মিলে লেট মার্কে পড়ে গেলে একটা ভিন্ন ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু কাছে গিয়ে ওর কি যে মনে হল, কে জানে, কিছুই না বলে আবার ফিরে আসার মুখে শুনল, মেয়েটি তাকে জিজ্ঞেস করছে, আপনি কি রানীসোলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ, কিন্তু....।

মেয়েটি বলল, চলুন, বেশি দূর না।

রানীসোল জায়গাটা সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই। মেয়েটি তবে রানীসোলে আগে এসেছে। অথবা দেখে গেছে জায়গাটা কেমন। না হলে এত সহজভাবে বলতে পারে না, চলুন, বেশি দূর না। অথবা এও হতে পারে, এখানকারই সে। আসলে, স্টেশনে নেমে যাদের সঙ্গে লটবহর দেখেছে, এই যেমন বেডিং ট্রাঙ্ক কিংবা সুটকেস নিয়ে সমবয়সী যুবক কিংবা যুবতী— সবাইকে মনে হয়েছে, পকেটে তাদের চিঠি আছে।

সে বলল, রানীসোলে থাকেন?

না। কলেজে যাচ্ছি।

আমিও। আপনি কি আগে এসে দেখে গেছেন! মানে বলছিলাম ভর্তি-টর্তির ব্যাপারগুলো....।

কাল থেকে সেসন শুরু। আপনি ভর্তি হননি?

না। চিঠিটা কেন যে এত দেরিতে পেলাম! সকাল দশটার মধ্যে না যেতে পারলে...

ও আটকাবে না। চিঠিতে অনেক কিছু লেখা থাকে। গেলেই বুঝতে পারবেন।

এতক্ষণে কেন জানি তার মনে হল, মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গী। এবং তাঁতের শাড়ি পরনে বলে খুবই সম্ভ্রান্ত দেখাচ্ছে।

সে কিছুটা হাল্কা বোধ করল। রিকশায়ালা দোকান থেকে ফিরে আসছে। হাতে এক বান্ডিল বিড়ি। একটা বিড়ি ধরিয়ে নিশ্চিন্তে টানছে। মুখে চোখে এমন একটা ভাব যেন ট্রেনটা আজও আসতে পারে কালও আসতে পারে। কিছু বলাও যাচ্ছে না। কারণ লোকটা নিজে তো কিছু করতে পারে না। ট্রেন না এলে গেট না খুললে রিকশা যাবে কি করে!

তার একবার ইচ্ছা হল, মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে কলেজ সম্পর্কে আরও দু একটি খবর জেনে নেয়। নতুন জায়গা, এক বছরের মতো হোস্টেলে থাকতে হবে। মেয়েটি তার সহপাঠী। এটা ভাবতে তার খুবই ভাল লাগছিল। কেমন ভেতরে ভেতরে সে এক নতুন জগতের খবর পেয়ে যাচ্ছে। এবং এ-সময়ই চারপাশটায় একবার তার চোখ গেল। পাশেই একটা সিনেমা হল। মর্নিং শো হচ্ছে। ডাইনে সব পেতল-কাঁসার দোকান। এদিকটায় শহর শেষ মনে হয়। রেল ক্রসিং পার হলেই গ্রাম মতো জায়গা। গাছপালা দেখা যাচ্ছে অনেক।

এখান থেকে রেল লাইনের অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তার চোখ মাঝে মাঝেই সেদিকে চলে যাচ্ছে। ইঞ্জিনের ধোঁয়া চোখে পড়লে সে বুঝতে পারবে ট্রেনটা আসছে।

রিকশায় বসে ট্রেন দেখা এবং ফাঁক পেলেই চুরি করে যুবতীটিকে দেখা—এই করে সময় কেটে যাচ্ছিল তার। এক একটা মিনিট কখনও এত দীর্ঘ হয় সে জানত না। মেয়েটির পেছনটা দেখা যাচ্ছে। ঐ কথাটুকু বলার পর আর একবারও ফিরে তাকায়নি। এজন্য অবশ্য সে কোন দোষ দেয় না। মেয়েরা তো এমনই হবে। তার দিকে ফিরে তাকাবেই বা কেন। তার এ পোশাক-আশাক খুবই সাধারণ। তাছাড়া সঙ্গে একটি সাধারণ ফুল তোলা টিনের সুটকেস এবং শতরঞ্জ দিয়ে বাঁধা বেডিং দেখলে এমন সুশ্রী মেয়ের আগ্রহ কমে যাবারই কথা। বোঝাই যায় বেশ বড় ঘরের হবে। গায়ের র‍্যাপারখানা সাদা এবং নরম। পায়ের কাছে লেদার সুটকেস, এবং হোল্ডলে বিছানা বাঁধা। বেশি আগ্রহ দেখালে অপযশ হতে পারে। মেয়েদের সম্পর্কে তার বরাবরের ভীতি আছে। ঠিক ভীতি বলা যায় না, কেমন এড়িয়ে যাওয়ার স্বভাব। সে যে খুব লাজুক স্বভাবের তাও না। তবু মেয়েদের সঙ্গে আগ্রহ ভরে কথা বললে, সেটা কিসের টানে সবাই যেন ধরে ফেলবে। বলবে, ব্যাটা তোর কুমতলব আছে, বুঝি না।

আসলে এই মেয়েটিকে প্রেমিকা ভাবতে তার ভাল লাগে। যে-কোনো সুন্দর মেয়ে দেখলেই তার প্রেমে পড়তে ইচ্ছে হয়। এটা তার একটা দুঃস্বভাব। এই দুঃস্বভাবের ভয়েও মেয়েদের খুব কাছে একটা ঘেঁষে না। কি জানি সত্যি যদি প্রেমে পড়ে যায়। প্রেমে পড়ে গেলে তো মানুষের হুঁশ থাকে না। হুঁশ না থাকাটা মানুষের পক্ষে খুবই অসমীচীন কাজ। শুধু এ-কারণেই তার এ-পর্যন্ত প্রেমে পড়া হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া জীবনে এ-ব্যাপারে হাতে কলমে বেশ শিক্ষা হয়ে গেছে।

তাছাড়া সে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরই স্পেশাল ক্যাডারে এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে। দিলীপের তাড়নায় সে শেষ পর্যন্ত প্রাইভেটে বি এ-টাও পাস করেছে। পাস করার পর মনে হয়েছে, বি এ পাস করাটাও ঠিক সমীচীন কাজ হয়নি। কারণ পাসের সঙ্গে উচ্চাশার যেন কোথায় একটা সম্পর্ক আছে। জীবনে সে উচ্চাশা পোষণ করতেও ভালবাসে না। প্রাথমিক স্কুলের চাকরিটা পেয়েই সে বর্তে গিয়েছিল। বাবার যজমানি এবং তার বেতন এবং কিছু জমিজমা মিলে সংসারে বলতে গেলে কোনো অভাবই ছিল না। দুটো গরুর একটা দুধ দেয়—তার সাইকেল আছে একটা, ভাইবোনেরা স্কুলে পড়ে। দশটা বাজলে বাড়ি থেকে সাইকেলে মাইল তিন দূরে স্কুলে যাওয়া, ফিরে আসা, তারপর শহরে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারার সুখ—সব বি এ পাস করায় ফলে গেছে। এখানে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ট্রেনিংও এ-কারণে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে কোনো মেয়ে প্রেমে পড়ে, তার জানা নেই। এ-কারণেও তার মনে হয়েছিল, তার মতো মানুষের পক্ষে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতাই যথাযোগ্য চাকরি। খুব একটা দায়-

দায়িত্ব নেই। ঘুম থেকে উঠলেই সামনে মাঠ, পরে সড়ক এবং তারপরে সব জলাজমি, সড়ক ধরে স্কুলে যাওয়া, গাছপালার ছায়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলার মধ্যে এক অপার আনন্দ আছে তার। সে-সব ফেলে কোথায় যে মরতে এল।

আসলে সে বুঝতে পারে মানুষ হিসাবে সে ঘরমুখী স্বভাবের। যতই সে বছর তিনেক বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজে চাকরি করুক কিংবা মন উধাও হলে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াক—কিন্তু কোথাও সে স্বস্তি পায় না। বাড়ির বাইরে গেলে মনটা কেন যে এত ঘরে ফেরার জন্য পাগল হয়ে যায়, সে বোঝে না। বাড়ি ফিরে মনে হয়, এই বেশ, মা-বাবা ভাই-বোন মিলে মৌমাছির মতো চাক বেঁধে থাকা। প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা পাবার পরও মনে হয়েছে—এই বেশ। অভাব নেই, আবার খুব সচ্ছলতাও নেই, ঘরবাড়ি, গাছপালা, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী সব মিলে এক একান্ত নিজস্ব পৃথিবী।

দিলীপ বলেছিল, এবারে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ট্রেনিংটা নিয়ে নে। আমিও যাচ্ছি। হাইস্কুলে চলে আসতে পারবি। ইচ্ছা করলে স্কুলের সাব-ইন্সপেক্টার হতে পারবি। সবাই তো বড় হতে চায়। বাবাকে বললে হয়ে যাবে।

সে বলেছিল, মাইনে আর কতই বা বাড়বে। এই বেশ আছি।

মাইনেটাই বড় কথা। মান-সম্মান আছে না!

ধুস, বাড়ির কাছে হলে হয়। সেই কোথায় না আবার যেতে হবে। এই বেশ আছি।

দিলীপের কি ধারণা কে জানে! তার এক কথা—তোর মতো ছেলে প্রাইমারি স্কুলে পড়ে থেকে পচে মরবি!

দিলীপের অনুমান বোধ হয়, সে আর পাঁচটা ছেলের চেয়ে আলাদা। এই ভেবে তার মুখে হাসি খেলে গেল। এই একটু লেখালিখি করে বলে, দিলীপের বোধ হয় এটা মনে হয়েছে। দিলীপ দু দুবার শহরের কাগজে তার ছাপার অক্ষরে নাম দেখেছে। এটা দিলীপের কাছে খুবই একটা বড় গৌরবের বিষয়। তখনই ভিতর থেকে হাহাকার হাসি উঠে এল—কত সামান্য কারণে যে আমরা সবাই গৌরব বোধ করে থাকি! আসলে বয়স—উঠতি বয়সে কত স্বপ্ন থাকে মানুষের। তারও এটা এক স্বপ্নের জগৎ। মাঝে মাঝে কি হয়, নিজের মধ্যে এক অন্য মানুষ কথা কয়ে ওঠে। সে বলে, তুমি কে হে?

এ-প্রশ্নের জবাবে সে শুনতে পায়, তার গম্ভীর কথাবার্তা। —আমি সবার মধ্যেই থাকি। কেউ টের পায়, কেউ টের পায় না।

আমি তাহলে টের পাই, তুমি আছ!

টের পাও। আর এরই নাম উচ্চাশা।

ধুস, উচ্চাশার খ্যাতাপুড়ি। তারপরই মনে হল, উচ্চাশা না থাকলে স্টেশন থেকে নেমেই এত উদ্বেগ বোধ করছিল কেন ! ঠিক সময়ে হাজির না হতে পারলে, সে বাতিলের খাতায় এমন মনে হচ্ছিল কেন ! ও কি যে দেরি করছে—আর তখনই হুস করে ট্রেনের হুইসিলের শব্দ শুনতে পেল। লেবেল ক্রসিংয়ের সিঁড়ি উঠে যাচ্ছে। সব যানবাহন চলতে শুরু করেছে। কেমন মৃতের মতো এতক্ষণ সব স্থির ছিল। একটা লেবেল ক্রসিং খুলে গেলে আবার সব সচল হয়ে উঠল। জীবনের কোথাও এ-ভাবে বুঝি বার বার লেবেল ক্রসিংয়ে আটকে যেতে হয়। যুবতীকে সে তখনও দেখতে পাচ্ছে। তার দিকে আর একবারও ফিরে তাকায়নি। আর একটা কথাও বলেনি।

এটা কোন্ ক্রসিংয়ে এসে হাজির হল শেষ পর্যন্ত, সে নিজেও বুঝতে পারে না। দেখল রিকশাটা একটা ফাঁকা মতো জায়গা দিয়ে যাচ্ছে। শহর শেষ হয়ে গাছপালা এবং মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। দু-পাশে ধানের জমি, তারপর বাঁক, সরু মতো রাস্তায় উঠে খানিকটা ঢোকা, তারপর পাকা রাস্তা, কি ঝকঝকে—দূরে নতুন সব হোস্টেলের ইমারত, কলেজ ভবন, অধ্যাপকদের সুন্দর ছিমছাম কোয়ার্টার চোখে ভেসে উঠতেই সে বুঝল, এসে গেছে। জায়গাটা খুব সুন্দর সে শুনেছে। কিন্তু এমন সাজানো-গোছানো বিরাট আশ্রম এলাকার মতো দেখতে জায়গাটা, সে আন্দাজই করতে পারেনি।

আর দূর থেকেই কার চিৎকারে সে সচকিত হয়ে উঠল। এসে গেছে ! এসে গেছে ! বাঙ্গালটা এসে গেছে। সে দেখল দৌড়ে দিলীপ তার রিকশার দিকেই এগিয়ে আসছে। সে হাত তুলে দিল।

রিকশা থামিয়ে দিলীপ উঠে বসল। আর অজস্র কথা।—আমি জানতাম তুই আসবি। এসে দেখি ভর্তির লিস্টে তোর নাম আছে। একটা চিঠিও দিয়েছি। কাল পরশু হয়ত পেয়ে যেতিস। বিমলেন্দুদার কাছে বলে রেখেছি, দাদা, চিঠির কিন্তু গণ্ডগোল হয়েছে। অনীষ চিঠি পায়নি। বিমলেন্দুদাই বললেন, একটা চিঠি দিয়ে দাও। আমরাও কলেজ থেকে ফের চিঠি পাঠাচ্ছি। তারপর সে দম নিল। রিকশায়ালাকে বলল, এখানে নয়। রবীন্দ্র ভবনে চল।

ছড়ানো ছিটানো একতলা সব হলুদ রঙের বাড়ি। সামনে ফুলের বাগান। বড় বড় ডালিয়া গোলাপী রঙের, সাদা রঙের ক্রিসেন্থিমাম—এই সব পার হয়ে যাবার সময় দিলীপ কোন ভবনের কি নাম বলে যাচ্ছিল। এটা তোর অরবিন্দ ভবন, এটা ক্যান্টিন, এটা তোর বিবেকানন্দ ভবন, এটা গান্ধী ভবন। সবই ছাত্রাবাস এগুলি। নতুন রিকশা দেখলেই ওরা অনুমান করতে পারে ছাত্রাবাস যাচ্ছে। দূরে

আঙুল তুলে বলল, ওটা কমিউনিটি ডাইনিং হল। পাশে মাধবীলতার কুঞ্জ দেখছিস, গেটের মুখে, দেখছিস না—ওটা আমাদের মিউজিক ভবন। আর রাস্তাটা পার হলেই তেনাদের এলাকা। নো এনট্রি।

অনীষ বলল, বিমলেন্দুদাটা কেরে ?

আরে আমাদের প্রিন্সিপাল। ভেরি মাই ডিয়ার। ক্যানেডা থেকে এই সেদিন ফিরে এসেছেন। দেখবি কি সুন্দর কথাবার্তা ! তার মাইরি একটিই দোষ।

সেটা কি !

সে বলল, এই একটু আলুবাজ !

অনীষ জানে, দিলীপ এ-ভাবেই কথা বলে।

আলুবাজ বলছিস কেন !

ও থাকতে থাকতে বুঝতে পারবি।

এই রোখকে—রোখকে, বলেই দিলীপ লাফিয়ে নেমে পড়ল। ভবনের সামনে পিচ বাঁধানো সব রাস্তা। সে নেমেই সহসা হাঁকডাক শুরু করে দিল, জ্যোতিদা, গোকুলদা আমাদের বাঙ্গালটা এসে গেছে, বলেছি না আসবে। চিঠি ও পাবেই। বাবা বলেছেন, ওর তো না হবার কথা নয়। ডেপুটেশনে পাঠালে কেউ আটকাতে পারে না। তবে বাঙ্গাল তো রগচটা। ইন্টারভিউতে কাকে কি বলে ফেলবে এই ছিল ভয়। কিন্তু বাবা বলেছেন, অনীষের না হলে তোমাদের কারো হওয়া উচিত না।

অনীষ বুঝতে পারল, দিলীপ এখানে এসেই তার সম্পর্কে সাত কাহন সবাইকে বলে রেখেছে। এমন কি তার সিট, সে কোন্ ঘরে থাকবে, পুবের জানলা তার ভারি পছন্দ, সব দিলীপ ঠিক করে রেখেছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় জ্যোতিদা বলল, যাক ভাই, এসে বাঁচালে। তোমার বন্ধুটি তো কেবল বলছে, আমি থাকছি না। অনীষ না এলে আমি থাকছি না। চলে যাব। একেবারে পাগল ছেলে।

অনীষ ছোট্ট করে বলল, পাগলের পাল্লায় না পড়লে আমারও বোধ হয় আসা হত না।

কামিনী ফুলগাছটায় সামান্য ম্লান জ্যোৎস্না ঝুলেছিল। রাস্তার আলোগুলি এক রহস্যময় পৃথিবী সৃষ্টি করে রেখেছে। ক্যান্টিনের বারান্দায় কিছু ছাত্রছাত্রীর কোলাহল। ছাত্রীরা একসঙ্গে দঙ্গল বেঁধে একটা টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে। অদূরে শানবাঁধানো কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে দু একজন অধ্যাপক। এখনও সভার কাজ শুরু হয়নি। পাঠভবনের বারান্দায় ছাত্র-অধ্যাপকদের আনাগোনা চলছে। আজ পরিচয় সভা। কাল থেকে ক্লাস শুরু। যে যার আবাস থেকে একে একে

আসছে।

এখানকার সম্পর্ক কার সঙ্গে কি হবে, তার একটা চালু নিয়ম অনীষ এসেই জেনে নিয়েছে। যেমন হীরা চন্দনা অঞ্জলি শুধু হীরা চন্দনা অঞ্জলি নয়, তারা সম্পর্কে বোন। ডাকলেই বলতে হবে, এই যে হীরা বোন শুনুন। হীরা ডাইনিং হলে এসেছিল একা। ওর সঙ্গে কেউ ছিল না। প্রথম দিন বলে এগারটা থেকেই যে যার মতো খেয়ে গেছে। অনীষেরও ভর্তি হতে হতে প্রায় বারটা বেজে গেছিল। সে যখন যায়, তখন দেখেছিল হীরা উঠে যাচ্ছে খেয়ে। সঙ্গে দিলীপ ছিল, ইতিমধ্যেই সে অনেকের নাম জেনে নিয়েছে। ঢুকেই মুখোমুখি দেখা হতে বলেছিল, হীরা বোন আজ পরিচয় সভা। আপনাকে কিন্তু গাইতে হবে।

হীরা বলেছিল, যা, আমি গান জানিই না।

ওসব বলে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। আমরা সব জেনে ফেলেছি।

দিলীপের সহজ কথাবার্তা, সে অনীষের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, থালা গ্লাস ধুয়ে নিয়ে আয়। হীরাকে লক্ষ্য করে বলল, আজই এসেছে। তারপর অনীষের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, হীরা বোন। দারুণ গায়। এবং হীরার এক বিখ্যাত গাইয়ে দাদার নাম বলে, হীরা যে একটা বড় ঘরানার মেয়ে এমন বোঝাবার সময় দেখেছিল, হীরা তাদের পাত্তা না দিয়েই চলে যাচ্ছে। আর চলে গেলেই বলল, কেমন দেখলি ?

অনীষ বলল, ভাল।

শালা শুধু ভাল বলে খালাস। কি সুন্দর দেখতে দেখলি না। হীরা দেখবি সব সময় হলুদ রঙের শাড়ি পরে থাকে। আমি হীরাকে ভালবাসব ভাবছি।

হলুদ রঙের কেন ?

ও বোঝে ওতে ওর গায়ের রঙ আরও খুলে যায়।

বিকালের দিকে সে আরও সব মেয়েদের দেখেছে রাস্তায় ঘুরতে। ওরা কখনও একা বের হয় না। দু'জন তিনজন একসঙ্গে চলাফেরা করে। ক্যান্টিনে এলেও তাই। আলাদা টেবিলে বসে খায়। কলকল করে কথা বলে। এবং সাজগোজের মধ্যে আশ্চর্য রকমের শালীনতা বোধ। সে কেবল সেই মেয়েটিকে সারাদিন একবারও দেখতে পায়নি। এখানকার ছাত্রী হলে পরিচয় সভাতে ঠিক দেখা হয়ে যাবে।

জ্যোৎস্না রাত হলে অনীষ এমনিতেই নিজের মধ্যে কেমন এক কাব্যমহিমা আছে টের পায়। তার গান গাইতে ইচ্ছে করে। কখনও নিজের মধ্যে আবিষ্কার করে ফেলে আর এক আগন্তুককে। সেই আগন্তুকের স্পৃহা অনেক। সব কিছু চেটে-পুটে খাবার ইচ্ছা। সে যেহেতু প্রকৃতির মধ্যে বড় হয়েছে যেহেতু তার চারপাশে আছে প্রকৃতির নিঃশব্দ বিচরণ, সে জন্য যেন কামিনী ফুলের গাছটা ছেড়ে তার যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে আর দিলীপ চুপচাপ দাঁড়িয়ে মেয়েদের এক এক করে

আসা দেখছে। আশ্চর্য মেয়েরা তাদের দিকে একবার চোখ তুলেও দেখে না। কেমন অহংকারী ভাব। বয়স কারো ত্রিশ বত্রিশের ওপর নয়। আবার সদ্য গ্র্যাজুয়েট হওয়া মেয়ের সংখ্যাও যেন অনেক। তবে অনীষ মেয়েদের মুখ দেখে কখনও বয়স অনুমান করতে পারে না। যেন যুবতী মেয়েরা সবই একই বয়সের। শাড়ির খসখস শব্দ, ধীরে চলা কিংবা শরীর ঢেকেঢুকে রাখার মধ্যে কোথাও এক আশ্চর্য গোপন ভালবাসা এরা সব বয়ে বেড়াচ্ছে।

সহসা দেখল গোকুলদা ওদের ডাকছে।—তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ? চলে এস। ভিতরে বসে পড়।

সবাই বোধ হয় তবে এসে গেছে। দিলীপ সিগারেট নিভিয়ে বলল, চল।

ওরা সিঁড়ি ভেঙে পাঠভবনের বারান্দায় উঠে এল। লম্বা করিডোর চলে গেছে। দুটো একটা আলোর ডুম জ্বলছে। অধ্যাপকরা আসছেন—ভারি ছিমছাম দেখতে। এক প্রবীণ অধ্যাপকের চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। মুখ গম্ভীর। মনেই হয় না দেখলে, এঁরা কেউ কুটিল কিংবা কুচক্রী অথবা লম্পট। যেন এরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক বিরাট কর্মযজ্ঞের সব পুরোহিত।

ভিতরে ঢুকে অনীষ দেখল সেই মেয়েটিও এক কোণায় চুপচাপ বসে। গায়ে কারুকার্য করা পশমের সাদা চাদর। লাল পাড় দেওয়া মুর্শিদাবাদী সিল্ক পরনে। বিরাট কার্পেট পাতা। তার উপর সাদা চাদর। সবাই করিডোরে জুতো রেখে ভিতরে ঢুকছে। ফিসফাস কথাবার্তা। মেয়েরা একপাশে। ছেলেরা পেছনের দিকে সব একে একে যে যার জায়গা নিয়ে বসে যাচ্ছে। সামনে ছোট্ট কারুকাজ করা সাদা চাদরে ঢাকা ছোট্ট জলচৌকি। ফুলদানি উপরে। একগুচ্ছ সাদা ক্রিসেন্থিমাম যেন এই সভার পবিত্রতা রক্ষা করছে। ধূপদানিতে একগুচ্ছ ধূপকাঠি পুড়ছে। ভারি সুঘ্রাণ ছড়িয়ে দিচ্ছে হলঘরটায়। পেছনে বড় একটা ব্ল্যাকবোর্ড। তাতে তারিখ, বার এবং বছরের উল্লেখ। নিচে লেখা, আজ 'পরিচয় সভা'।

অনীষের মনে হয় এ-ভারি এক নতুন জীবন। দিলীপ তার পাশে বসে দু-একজন মেয়ে সম্পর্কে ফিসফিস করে ফাজিল কথাবার্তা বলছে। অনীষ দিলীপের কথাবার্তায় মজা পাচ্ছিল। তারও বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, প্রিন্সিপাল মানুষটির নজর আছে বলতে হবে। দু'একজন মেয়ে তো সত্যি যেন দেবী। চোখে মুখে আশ্চর্য দেবী মহিমা তাদের। দেখলেই যেন গড় করতে ইচ্ছে হয়। বলতে ইচ্ছে হয়, মা-জননীরা, আপনারা এই যে ভারি পবিত্র মুখ চোখ নিয়ে বসে আছেন সেটা কতটা সত্যি। দু'একজন অধ্যাপক বেশ তরুণ। একজন অধ্যাপক তো প্রায় দেবানন্দের মতো দেখতে। আমরা অভাজন, আমাদের নিয়ে আপনারা কিছু ভাববেন না জানি, কিন্তু তরুণ দেবানন্দকে দেখে রক্তে নিশ্চয়ই মাকড়সা হেঁটে বেড়াচ্ছে।

অনীষ দেখল তাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ বয়সী সহপাঠী আছেন। তাদের ভবনে গোকুলদা জ্যোতির্ময়দার বোধ হয় চল্লিশ পার হয়ে গেছে। অনীষের ভারি খারাপ লাগছিল ভেবে, বিবাহিত মানুষদের কাছে এই মহাবিদ্যালয়ের মহিমা কোনো বোধ হয় সুখবর বয়ে আনছে না। আরও বেশ পাঁচ সাতজন গোকুলদার বয়সী আছেন মনে হয়। পরিচয় সভাতে সবার নাম জানা যাবে।

গোকুলদা বোধ হয় অধ্যাপকদের সঙ্গেও ইতিমধ্যে আলাপ করে নিয়েছেন। না হলে সোনালী চশমা পরা অধ্যাপকটি গোকুল ভাই বলে ডাকবেন কেন! গোকুলদা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়েছেন। সে যে কত গুরুত্বপূর্ণ এই সভার পক্ষে, তাঁর উঠে যাওয়ার ভঙ্গি দেখেই সেটা অনীষ টের পেল। মেয়েরাও সবাই চোখ তুলে গোকুলদাকে দেখছে। গোকুলদা মানুষটি কালো বেঁটে দোহারা চেহারা। গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি। চুল ছোট করে ছাঁটা। দেখলেই মনে হয় গৃহী এবং খুবই সংসারী মানুষ। গোয়ালে গরু মোষ আছে। জমি-জমা আছে। কৃষিজীবী মানুষের মতো কিছুটা চলাফেরা।

গোকুলদা কাছে গেলে বললেন, সবাই এসেছে?

গোকুলদা হলঘরটার দিকে তাকিয়ে বললেন, মনে হয় সবাই এসে গেছে।

তাহলে বিমলেন্দুদাকে খবর দাও।

গোকুলদা পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন। একজন অধ্যাপক নাকে নস্যি নেবার সময় দু-বার নাক ঝাড়লেন, পরে সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখলেন। ব্ল্যাকবোর্ডে তারিখ মাস উল্লেখ আছে। ধূপধানিতে ধূপকাটি জ্বলছে। জলচৌকির উপর কারুকাজ করা চাদরে সামান্য ভাঁজ ছিল, সেটা টেনে ঠিক করে দিলেন।

অনীষের কেন জানি অধ্যাপকটির আচরণ দেখে ফিক করে হাসি পেল। গাবদা মোটা। ততোধিক বেঁটে। আবলুস কাঠের মতো গায়ের রঙ। মুখখানা ছেঁড়া ফুটবলের মতো। বারবারই পাঞ্জাবির হাতা গোটাচ্ছিলেন। যেন হাতাটি গা থেকে খসে পড়বে। খসে পড়ার ভয়ে বার বার গুটিয়ে রাখছেন।

বিরাট এবং ভারি শতরঞ্চের উপর ধবধবে সাদা চাদর বিছান। ভারি নিবিষ্ট ভাবে সবাই বসে আছে। এখন শুধু বিমলেন্দুদার আসার অপেক্ষা। তিনি বোধ হয় অফিস ঘরে এসে বসে আছেন। তিনি এলেই পরিচয় সভার কাজ শুরু হবে। দিলীপের পক্ষে বোধহয় এতক্ষণ অনড় হয়ে বসে থাকা অসম্ভব। তাই ফিসফিস করে তখনও ফাজিল কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ দিলীপ উচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং সামান্য তরলমতি যুবক।

বিমলেন্দুদা পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়াল। পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবি, হাফ হাতা। বেশভূষা খুব উজ্জ্বল নয়। মোটা খদ্দরের ধুতি। পাশ থেকে

কে টিটকিরি কাটল, ওয়ার্ধার মাল। ওয়ার্ধার মাল কেন, সে ঠিক বুঝতে পারল না। পরে অবশ্য ওয়ার্ধা সম্পর্কিত অনেক খবর পেয়েছে। গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা এবং এমন হরেক রকমের শিক্ষার সঙ্গে ওয়ার্ধা শব্দটিতে একটা কেমন যেন নিরামিষ ঘ্রাণ আছে।

অনীষ এর মধ্যে বারদুই মেয়েটির মুখ চুরি করে দেখার চেষ্টা করেছে। ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না। মাথা উঁচু না করে দিলে দেখা যায় না, তাও আংশিক। কারণ সে পেছনের দিকটায় বসেছে। সে, দিলীপ, জ্যোতির্ময়, ধীরেন একঘরে থাকে। চারজনের চারটা তক্তপোষ। কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। ওরা একসঙ্গে বের হয়ে এসেছিল। সে দিলীপের সঙ্গে ঢুকলে, ধীরেন ডেকে বলেছিল, এই যে, এখানে। জায়গা রাখা আছে। সামনের দিকে আর না এগুলেও চলবে।

ধীরেনের কথায় দিলীপ বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিল—কিন্তু অদূরে অধ্যাপকরা বসে আছেন, তাছাড়া বোনেরা। সুতরাং তার খুব ভাল ছেলের মত ব্যবহার—বলল, না যাচ্ছি না। দাদারা যখন আছেন, অতদূর যাবার সাধ্য আমাদের বোধ হয় হবে না।

ধীরেন বলল, দেখছিস সব কেমন ঋষি পুরুষ। পাশে সব দেবযানীরা—একেবারে তপোবন করে তুলেছেন দেখছি দাদারা। অনীষ, তুই কাছে গিয়ে বস। মুখখানা বড় মায়াবী তোর। কৃপালাভ হতে পারে।

অনীষ বললে, হলে মন্দ হয় না। কিন্তু যা বাড়িঘর, নিয়ে রাখবটা কোথায়? ঢাকের দায়ে শেষে মনসা বিক্রি।

সুতরাং এত পেছনে বসে ভাল করে দেখা সম্ভব নয়। এসব জানা সত্ত্বেও গোপনে দেখার তার বিরাম ছিল না। মেয়েটির কথাবার্তায় এক ধরনের অদ্ভুত সাহসিকতার পরিচয় আছে। ও অমন লেখা থাকে। কিচ্ছু হবে না।

সে এসে বুঝেছিল। সত্যি অমন লেখা থাকে। কারণ এখনও কয়েকজন এসে পৌঁছতে পারেনি। তবে এলে ফিরে যাবে না। চিঠির মধ্যে যত কড়া নির্দেশই থাক—এখানকার জীবনে সেটা কোনো ঘুঘু ডাকা নির্জন দুপুর—প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষাদানের মধ্যে বোধ হয় এত কড়া নির্দেশে চলা যায় না। মেয়েটি আগেই তা কি করে টের পেয়েছিল।

বিমলেন্দুদা বললেন, আজ আমাদের পরিচয় সভা।

দিলীপ খুব মনোযোগী ছাত্রের মতো তাকিয়ে আছে। দিলীপ কেন, সবাই। কারণ কিউমিলেটিভ রেকর্ড বলে এখানে বড় একটি আখাম্বা বাঁশ পোঁতা আছে। বাঁশটি বড় নিষ্ঠুর। বাঁশটির ভয়ে সবাই জুজু। সেও মনোযোগী ছাত্র হয়ে গেল।

খুব ধীরে এবং স্পষ্ট করে বলার স্বভাব বিমলেন্দুদার। চুল কোঁকড়ান। পঞ্চাশের

কাছে বয়স। অধিক পাওয়ারের চশমা। মুখখানা চ্যাপটা। থুতনিটা খানিকটা বেঢপ। কথা বলার সময় একটু বেশি উঠানামা করে।

পরিচয় সভাতে তিনি প্রথম ওয়ার্ধা দিয়ে আরম্ভ করলেন, শেষ করলেন গিয়ে মনট্রিলে। আসলে উপরে গান্ধীবাদী, ভেতরে পুরো মনট্রিলের গর্ব। তীর্থদর্শন এবং সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বক্তৃতা। তার সঙ্গে কত দেশ দেখেছেন, তিনি কত বড় কৃতী মানুষ, এ-সব বোঝাবার জন্য দুটো একটা ছোট্ট গল্পের অবতারণা—যেন এগুলো বলার অর্থ, অভিজ্ঞতা মানুষকে বড় করে, মানুষকে শেখায়। শিক্ষাদান পদ্ধতির সঙ্গে তার বিদেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত যুক্ত করে মহান পুরুষের মতো হাত তুলে দিলেন।

এর সঙ্গে তিনি নবযুগের শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখার সামান্য আঁচ দিলেন। পেস্টালৎসির বাস্তবভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতির কিছু কথা বললেন। তারপর হড়হড় করে বের হয়ে পড়ল হাবার্টিয় পদ্ধতি, ফ্রয়েবেলের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি, মন্তেসরির স্বয়ং শিক্ষা, প্রজেক্ট পদ্ধতি, ইউনিট প্ল্যান এবং এ-ভাবে ক্রমে গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষা—বললেন, বুনিয়াদি শিক্ষা সাফাইসে শুরু হতি হ্যায়। কর্মে, ধর্মে, আচারে সর্বত্রে এই সাফাইয়ের কাজই, এই শিক্ষা, মানুষকে জীবনের বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে নিয়ে যায়। আপনারা এই শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণে জীবনকে দান করুন, নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তুলুন। কিছুটা যেন স্বামীজীর কায়দায় কথাগুলো উচ্চারণ করে বসে পড়লেন।

তখন একটা চামচিকে কি করে ঘরের মধ্যে ঢুকে যেতেই বিমলেন্দুদা আর্তস্বরে বললেন, শীগগির সব বাতি নেভাও। আলোতে চামচিকা দেখতে পায় না। নাহলে ঘরেই কেবল ওড়াওড়ি করবে।

কিছুক্ষণ পর আলো জ্বালা হলে দেখা গেল চামচিকেটা চলে গেছে।

তখন সেই কালো বেঢপ মানুষটা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এখন পরিচয় সভাপর্ব শুরু। আপনারা কে কোন স্কুল থেকে এসেছেন, কি নাম, হবি—সব এসে একে একে বললে ভাল হয়। তারপর নিজের নাম বললেন আমার নাম সমরনাথ রায়। খেলাধুলোর বিষয়টা আমি দেখে থাকি। তিনি যে অধ্যাপক, যেন অধ্যাপক বললে ছাত্র শিক্ষকে মানসিক ব্যবধান গড়ে উঠবে—এই ভয়েই অধ্যাপক কথাটি উচ্চারণ করলেন না। কারণ এখানে কেউ অধ্যাপকসুলভ আচরণ করুক, কেউ চায় না। সবার কাছ থেকেই সবার শিক্ষণীয় বিষয় থাকে। সুতরাং এখানে আমরা কেউ ছাত্রও নই, শিক্ষকও নই। সবাই ভাই ভাই।

অনীষের হাসি পেল।

দিলীপ লক্ষ্য করেছে—অনীষ মুচকি হাসছে। দিলীপ কনুই দিয়ে অনীষকে গুঁতো মারল একটা।

অনীষ ফিসফিস করে বলল, ভাই ভাই ঠিক আছে বোনেদের বেলায় কি হবে? উঠে জিজ্ঞেস করব?

এই, কি হচ্ছে। বলে অনীষ দিলীপের হাত ধরে বসিয়ে দিল।

আপনি কিছু বলবেন?

এরে বাবা, এ যে দেখছি সব আপনি আজ্ঞে করছে। অনীষ ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। তখন গোকুলদা উঠে দাঁড়িয়েছেন, দাদা এই আপনিটা কিন্তু আমাদের ভাল লাগছে না।

ক্রীড়া অধ্যাপক অর্থাৎ এইমাত্র সমরনাথ রায় বলে যিনি পরিচয় দিলেন এক টিপ নস্য নাকে ঢুকিয়ে বললেন, থাকতে থাকতে সব ঠিক হয়ে যাবে।

অনীষ এবং সবাই অবশ্য পরে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। কারণ গোকুলদা কলেজ ছাড়ার দিন বলেছিলেন, ভন্ডামির একটা শেষ আছে।

অনীষের যেটা খচ করে লেগেছে সেটা আরও ভারি মজার ব্যাপার। অধ্যক্ষ বিমলেন্দুদার বক্তৃতার অধিকাংশ জায়গা জুড়ে ছিল একটা হামবড়া ভাব। সরকারের পয়সায় বেশ ঘুরেছেন। কোথাকার শিক্ষাব্যবস্থা কি রকম জানার জন্য আজ লন্ডন, কাল ফ্রাংকফুর্ট পরশু প্যারিস। কথাবার্তায় মনে হচ্ছিল এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থার স্বপ্নে তিনি বিভোর। কিন্তু আসলে নিজেকে জাহির করার একটা মোক্ষম সুযোগ মিলে গেছে মানুষটার। তিনি তার সুযোগ নিলেন। সুন্দর কথাবার্তার সঙ্গে অভিনয়েও পটু। গান্ধীবাদী ভেক ধরে আখের গুছিয়ে নেওয়া। সবই আছে মানুষটার। নেই শুধু আন্তরিকতা। থাকলে তিনি নিজের কথা এ-ভাবে বলতেন না।

তারপরই অনীষের মনে হল এটা তার একটা বদ্ স্বভাব। সব কিছুকে ত্যাছড়া করে দেখা। মানুষের গাড়ি বাড়ি থাকলেই তার রাগ হয়। কোনো রন্ধ্রপথে টাকা আসে—নাহলে এত ফুটানি চলে কি করে! এই স্বভাবের জন্য খুব সচ্ছল মানুষের প্রতি তার শ্রদ্ধভক্তি ভাবটা কম। একটা মানুষ যে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আর একটা ধাপে ওঠে, বিশ্বাস করতে তার কষ্ট হয়। এ সব হয়ত হয়েছে বাপ জ্যাঠাদের দেখে। সরল মানুষ, উচ্চকাঙখা কম, সাদাসিধে জীবনযাপন। দু-বেলা দু মুঠো আহারের মধ্যেই সমস্ত বাসনার তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা। বাবাও এমন ধারার মানুষ। ঘরবাড়ি, গরু-বাছুর, যজন-যাজন, সঙ্গে সামান্য চাষ-আবাদ, তার প্রাথমিক স্কুলে চাকরিটা হয়ে যাওয়ায় বাবার পরিতৃপ্ত মুখ—মাস গেলে একটা নিশ্চিন্ত প্রাপ্তি—এর চেয়ে মানুষের আর বেশি কি লাগে। তার ভেতর থেকে কেউ তখন কথা বলে, মনটাকে সাফসোফ করে রাখ।—দেখছ না কি সব মেয়েরা এয়েছে! মনে কূট থাকলে তোমার মুখে তার ছাপ পড়বে।

অনীষ বলল, তাই কি!

তাই। সরল প্রাণ হলে সব মানুষ সবাইকে ভালবাসে জান!

তার এই একটা স্বভাব আছে। নিজের সঙ্গে নিজের কথপোকথন। এটা আছে বলে সে খুব উচ্ছ্বাসপ্রবণ হতে পারে না। দেখলে তাকে একটু বেশি ভাবুক প্রকৃতিরই মনে হয়। দিলীপ এটা কলেজে টের পেয়েই তাকে বলেছিল, কিরে, সবাইকে কেমন এড়িয়ে চলিস, কি ব্যাপার বল তো?

তখন ভেতরের মানুষটা অনীষের সঙ্গে কথা কয়ে উঠেছিল—আসলে তোমার মধ্যে একটা কমপ্লেকস্ কাজ করে অনীষ। তুমি নিজেকে সব সময় ছোট মনে করে থাক। এটা কিন্তু ভাল না। তোমার ভয় ভীতি, মেয়েদের দেখলে গম্ভীর হয়ে যাওয়া, সবটাই কমপ্লেকস্। সহজভাবে মিশতে জান না।

আর ঠিক এ সময়ই দেখল, সেই নারী দাঁড়িয়ে বলছে, আমার নাম শ্রীলা চক্রবর্তী। যোধপুর পার্কে থাকি। হবি আত্মীয়ের বাড়ি বেড়ানো।

বেশ মজার হবি। আত্মীয়ের বাড়ি বেড়ানো হবি—আর কোনো হবি নেই! খেলাধুলো, গান-বাজনা, সিনেমা দেখা, ছবি আঁকা, মানুষের তো কত রকমের হবি থাকে—এর সে-সব একটাও নেই! কি জানি বাবা, এ-কেমন ধারা মেয়ে!

নারীমাত্রেই রহস্যের দরজা। দীর্ঘাঙ্গী শ্যামলা রঙের এই নারী তাকে রাস্তায় সাহস জুগিয়েছিল—সেই থেকে একটা কেমন কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে গেছে—আশা করেছিল বলবে, আমার হবি পর্বতারোহণ। নয়ত সঙ্গীত। খেলাধুলোও হতে পারত। তা না—কেবল আত্মীয়ের বাড়ি ঘুরে বেড়ানো—কোথায় যেন নারী রহস্যে সামান্য ঠেক ধরে।

দিলীপ বলল, এই, কি এত দেখছিস! হাত দিবি না। আগুন!

কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে দিলীপ কথাটা বলল।

সে দিলীপকে বলল আগুন সবাই। শুধু ধরিয়ে দিতে জানতে হয়।

দিলীপ জানে, অনীষই এমন কথা বলতে পারে। হঠাৎ হঠাৎ সে এমন কথা বলে ফেলে। আবার এমন বোকার মতো মাঝে মাঝে আচরণ করে অনীষ যে দিলীপের রাগ হয়ে যায়।—তোর মতো ছেলেকে এটা মানায়!

এই 'তোর মতো', কথা দিয়ে দিলীপই একমাত্র তার বন্ধু, যে তার দোষগুণ ধরিয়ে দেয়। এবং তার ভেতরে আগুন ধরাবার কাজটা বোধ হয় দিলীপই করে যাচ্ছে। কারণ আর কেউ 'তোর মতো' বলে তার সঙ্গে কোনো কথা আরম্ভ করে না। অনীষ দেখল মেয়েদের ব্যাচটা শেষ হলে, ছেলেদের ডাক শুরু হল। মেয়েদের সবাই প্রায় শহরের। অধিকাংশ কলকাতার। মিহিজাম থেকে এসেছে হীরা মুখার্জী। হবি, জানলায় দাঁড়িয়ে দূরের ঘর-বাড়ি দেখা। কৃষ্ণনগর থেকে এসেছে বন্দনা

সেন। হবি, ছবি আঁকা। গোটা ত্রিশেক মেয়ে-প্রজাপতির মতো এতক্ষণ উড়ে যাচ্ছিল একে একে—এখন সবাই মৌমাছির মতো গুচ্ছ হয়ে একটা অতিকায় বাহারি পদ্মের মতো বসে আছে। যেন এক একটা মেয়ে পদ্মটার পাপড়ি, লাল নীল হলুদ সবুজ সব পাপড়িগুলি।

অনীষ ঠিক ভেবে পেল না সে কি বলবে। তার হবি কি! লেখালেখি করে, সে তো বাঙালী মাত্রেই এ-বয়সে করে থাকে। দু-লাইন কবিতা, দু-লাইন পদ্য লেখার চেষ্টা কেউ করেনি, এমন বাঙালীবাবু খুঁজে বার করা কঠিন হবে। তার এমন হবি থাকা দরকার যেটা আর কারো নেই। এইমাত্র যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে কথা বলছে, তার নাম গণেশ হালদার। হবি, কবিতা লেখা।

মেয়েদের মধ্যে গণেশ হালদারকে নিয়ে কি সব তখন ফিসফাস কথা চলছে। মেয়েগুলো গণেশ হালদারের পেছনে লাগল বলে। বোকা বোকা গ্রাম্য চেহারার মানুষ গণেশ ব্যাটা কেন যে বলতে গেল, কবিতা তার হবি!

সভা পরিচালনা করছিলেন দেবানন্দ মার্কা তরুণ অধ্যাপক। নাম, শঙ্কর চ্যাটার্জী। নীলাভ স্যুট পরেছেন। আমেরিকা ফেরতা মানুষ। গায়ে ডক্টরেটের ছাপ। বাংলা বলেন ইংরেজি কায়দায়। যেন সারা অবয়বে এক আশ্চর্য গরিমা লটকে রেখেছেন। হাসিটুকু পর্যন্ত মাপা। প্রচণ্ড আঁতেল আঁতেল গন্ধ শরীর থেকে বের করে দিচ্ছেন কথার ফাঁকে ফাঁকে। এক পায়ে সামান্য ভর দিয়ে কথা বলছিলেন। ব্যক্তিত্ব কিভাবে প্রকাশ পায়, বলতে গেলে যেন মানুষটির সব ভাবভঙ্গী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অনীষ দেখল মেয়েরা বোকার মতো মার্কাটিকে দেখছে। যেন ইহজন্মে এমন পুরুষের সান্নিধ্যে তারা আসেনি। কেবল শ্রীলা মাথা নিচু করে রেখেছে। ওর কথাবার্তা শোনার কোনো আগ্রহ নেই তার।

কিন্তু সে তার হবি কি বলবে! প্রথমে ভাবল বলবে, হবি আমার গাছপালার মধ্যে ঘুরে বেড়ানো। পরে ভাবল, বলবে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। নাকি বলবে, কোনো হবিই নেই তার। কিন্তু মুশকিল হল ব্যাটা দিলীপকে নিয়ে। বাইরে বের হলেই ধরবে। তোর মতো ছেলের পক্ষে এমন কথা শোভা পায়! মানুষের কোনো হবি থাকবে না হয়! হবি না থাকলে মানুষের বাঁচার আনন্দটা কোথায়! লেখা, তোর হবি বলতে পারলি না। নিজেকে কেউ এভাবে ছোট করে!

তাছাড়া কিউমিলেটিভ রেকর্ড বলে আখাম্বা ষাঁড়টিও তাকে তাড়া করছে। তার কোনো হবি নেই—মানে বিষয়টা গোপন করে যাওয়া কিংবা অধ্যাপকেরা যা জানতে চান, তা অগ্রাহ্য করা। এত বড় বেয়াদপের পেছনে যদি একটি আখাম্বা ষাঁড়কে লেলিয়ে দেওয়া হয় তবে খুব দোষের না। যেন আখাম্বা ষাঁড়টির ভয়েই সে বলল, আমার নাম অনীষ চৌধুরী। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। হবি, সমুদ্রে

ঘুরে বেড়ানো।

সে প্রথমে শ্রীলার মুখ দেখল। হবি, সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো! শুনেই শ্রীলা কেমন চমকে দেখল তাকে। সবাই দেখছে। সে দিলীপের দিকে যেতে যেতে বুঝল, দিলীপ ভারি খুশি। হ্যাঁ ঠিকই বলেছে। অনীষের পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। গায়ে খদ্দরের চাদর। ফর্সা রঙ। লম্বা এবং দীর্ঘকায় বলে সবার নজর পড়তেই পারে। পরে আরও কয়েকজন উঠে গেল, নাম এবং হবির কথা বলে চলে এলেও অনীষ বুঝতে পারল, এই শীতল হলঘরে সে যে উষ্ণতার জল দিয়ে এসেছে, তার রেশ এখনও চলছে। মেয়েরা আড়চোখে ওকে দেখছে। অনীষ ভাবল, সে আবার কোনো মজার বিষয় হয়ে যায়নি তো মেয়েদের কাছে! কি জানি, ভাবতে পারে গরিবের ঘোড়া রোগ। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের আবার সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখা কেন!

কার কি হবি জানার পর অধ্যাপকরা নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করলেন। প্রথমেই ডাক পড়ল গণেশ হালদারের। তাকে বলা হল, আপনার নিজের কোনো কবিতা যদি পাঠ করে শোনান!

সে গড়গড় করে একটি কবিতা বলে গেল। কবে কবিতাটি রচনা করেছে, কি তারিখ, তখন সকাল না বিকাল, সব বলে গেল। কবিতাটি সবাই খুব শ্রদ্ধা সহকারে শোনার চেষ্টা করল। কেউ বলল, ভারি সুন্দর কবিতা। একজন উঠে প্রশ্ন করল, কোনো কাগজে লেখেন?

গণেশ হালদার বলল, কোনো কাগজে লিখিনি।

কাগজে কবিতা ছাপেন নি?

ছাপা হয় না। সব কাগজেই গ্রুপবাজি চলছে। আমরা বাইরে থাকি, আমাদের কবিতা কলকাতার কাগজে ছাপাবে কেন? অনেকে সমর্থন করল কথাটা। কেবল অনীষ বোঝে ওটা কবিতা হয়নি। পদ্য হয়েছে। পদ্যটিতে সরল একজন গ্রাম্য মানুষের ভাবনা-চিন্তা আছে। গণেশ হালদারের প্রতি তার আকৃষ্ট হবার কারণ থেকে গেল। মানুষটি বোঝে তার মতো কবি রবি ঠাকুরের পর জন্মায়নি। সেজন্য সে কবিতা লিখে তার নিচে বোধ হয় দিন-কাল এবং সময় ঘন্টা সব উল্লেখ করে রাখে। মানুষ তো এমনই হবার কথা। মানুষ নিজেকে ছাড়া আর কাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ভাবতে পারে!

দিলীপ বলল, বেশ, পড়ল, না! আমি বলব তোর কথা।

মারব থাপ্পড়। যা না, বলে দেখ না।

দিলীপ যেন আর সাহস পেল না। অনীষকে সে জানে। যে কোনো মুহূর্তে সে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে দিতে পারে। বলতে পারে, ধুস খেতাপুড়ি

ট্রেনিংয়ের। চললাম। প্রাইমারি স্কুলে আছি, বেশ আছি। এই যে সবাইকে গর্বের সঙ্গে বলে গেল, সে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক, সেটা নিজের সঙ্গে মস্করা ছাড়া আর কি!

হীরা মুখার্জীর ডাক পড়েছে। গান তার হবি। একজন অধ্যাপক মুখ বাড়িয়ে বললেন, তুমি কি গান গাও? হীরা আস্তে কি বলল বোঝা গেল না। পরিচয় সভা আরম্ভ হবার আগে গানের অধ্যাপক দুতিনজন মেয়েকে পাশে বসিয়ে গান গেয়ে পরিচয় সভাপর্ব শুরু করেছিলেন। হারমোনিয়াম এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র একপাশে আছে। হীরা মুখার্জী গান গাইল, লহ মোর অঞ্জলি তুলে।

সবাই মাথা নিচু করে শুনছে। সঙ্গীতের মাধুর্যে এই শীতের রাত আশ্চর্য সব উষ্ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছিল সবার মধ্যে। অনীষও মাথা নিচু করে শুনছিল।

পাশ থেকে কান্তিভাই মুখ বাড়িয়ে অনীষকে যেন খুব গোপনে বলল, আপনার সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানোর শখ হয় কেন?

সে বলল, তা তো জানি না।

দিলীপ বলল, ও তো অনেকদিন সমুদ্রে ছিল।

বলেন কি! সমুদ্রে ছিলেন? কেন ছিলেন, কি করতেন।

দিলীপের এই এক স্বভাব, বন্ধু-গর্বে গর্বিত হওয়া। কত দেশ ঘুরেছে জানেন। গোটা পৃথিবী ঘুরে এসেছে।

অনীষ ধমক দিল, কি হচ্ছে দিলীপ!

তখন একজন মাউথ অর্গান বাজিয়ে শোনাচ্ছে। আসলে এগুলো এখানকার একস্ট্রা ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটিজ বলে ধরা হয়। অধ্যাপকদের নজর কেড়ে নিতে পারলে ফার্স্ট ক্লাস আটকায় কে? পরিচয় সভাতে যে যে ভাবে পারছে একস্ট্রা ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটিজ কার কি আছে দেখানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

অনীষের বেশ লাগছিল। শীতের রাত। বাইরে জ্যোৎস্না। ভিতরে এত সব যুবতীর সঙ্গে পাশাপাশি বসে থাকা বড় আরামদায়ক। পুরো এক বছর সে এদের সঙ্গে থাকবে, খাবে, বেড়াবে, ক্লাস করবে এবং একস্‌কারশানে যাবে— কত কিছু নাকি হয় এখানে। শিক্ষাব্যবস্থায় বিপ্লব আসছে। গানের, ছবির এবং চাষ-আবাদ অর্থাৎ এগ্রিকালচার পর্যন্ত এখানে শেখানো হয়। তকলি কাটতে হয়। নববর্ষ বরণ, হলকর্ষণ উৎসব, নবান্ন—কত কিছু নাকি হয় এবং সবই শিক্ষার অঙ্গ।

আপনি কিছু বলুন। কান্তিভাই অনীষের দিকে তাকিয়ে বলল।

আমি কি বলব?

কেন আপনার অভিজ্ঞতার কথা!

অনীষ হাসল।

দিলীপ বলল, না না, ওকে কিছু বলতে হবে না।

অনীষ বুঝল, দিলীপ চায় না অনীষ বলতে গিয়ে কোন কারণে ছোট হোক। একেবারে বাঙ্গাল। কথায় বাঙ্গালের টান আছে। বেশি কথা বললেই ধরা পড়ে যাবে। উচ্চারণে এ-কার, উ-কার জ্ঞানগম্যি কম। আগে দিলীপের কানে খুব লাগত। এখন সয়ে গেছে। কিছু বলে না। কেউ যদি শোধরাতে না চায় তবে সে আর কি করতে পারে। তাই বলে প্রথম দিনেই বেটা যে বাঙ্গাল, ধরা পড়ুক, সে চায় না। দিলীপ বলল, না না, ওকে কিছু বলতে হবে না।

অনীষ বলল, হ্যাঁ, আমি বলব।

দিলীপকে রাগিয়ে দিয়ে মজা দেখার জন্য কথাটা বলেছিল, কিন্তু কান্তিভাই সুযোগ ছাড়তে রাজি না, সে তখুনি উঠে বলল, আমাদের অনীষ ভাই সমুদ্রে গেছে। সারা পৃথিবী ঘুরেছে। তার কিছু কথা আমরা শুনতে চাই স্যার।

লোকটা কি আহাম্মক। সে তো সত্যি সুন্দর করে কিছু বলতে পারে না! বলতে গেলেই গুলিয়ে যায়! লোকটার কি বদ মতলব আছে। অনীষ উঠে বলল, না স্যার, আমি, মানে ঘুরেছি, তবে কি জানেন, বলার মতো কিছু না। মানে—

দেবানন্দ মার্কা অধ্যাপকটি শুধরে বললেন, স্যার নয় দাদা বলবেন। আমরা আপনাদের বড় ভাইয়ের মতো। আসুন না। ভয় কি।

না না, ভয় না।

একজন বলল, কোথায় কোথায় গেছিলেন।

অনীষ বলল, ত্যামন কোথাও না। মেয়েরা কেউ মুচকি হাসল।

এই রে! দিলীপ বুঝতে পারল, হড়কে যাচ্ছে। তেমন না বলে ত্যামন বলছে। এত করে বলেছি দ্যাখ অনীষ তোর মতো ছেলের এ-ভাবে কথা বলা শোভা পায় না! কান্তিভাই-এর দিকে তাকিয়ে বলল, কাজটা আপনি ভাল করলেন না। ঘাবড়ে গেলে কিংবা খুব উচ্ছ্বাস দেখা দিলে নিজের মাতৃভাষাটি বের হয়ে পড়ে। খুব সতর্ক না থাকলেই হয়। এত সব মেয়ের মধ্যেও সতর্ক থাকা কঠিন। কারণ একটা লাইন শেষ করেই অনীষের মনে হবে কোন গণ্ডগোল করে ফেলেনি তো!

অনীষ বলল, দেখুন আমি যখন সানফ্রানসিসকোতে ছিলাম....

বল বেটা, বলে মর, আমার কি! মেয়েরা পেছনে লাগল বলে। তোমার চেহারার শালা সব আভিজাত্য একেবারে সাবানের ফেনার মতো উবে যাবে। দিলীপ রাগে গর গর করছিল।

অনীষ দিলীপের মুখের দিকে তাকাল। দিলীপ ক্ষেপে যাচ্ছে। তবু সে যথার্থভাবে বলার চেষ্টা করল—কারণ একেবারে কিছু না বললে ডাহা মিছে কথা ভাববে, গুল ভাববে। এসেই এমন সব সুন্দরীদের দেখে গুল মারতে শুরু করেছে ভাবতে

পারে। সে বলল, দেখুন সানফ্রানসিসকোর গল্পটা অনেক বড়।

আমরা বড়ই শুনব। মেয়েদের মধ্যে কেউ যেন বলল।

অনেক বড়। তবে ম্যালবোর্নে যাবার পথে আমরা বিষাক্ত পাখিদের তাড়া খেয়েছিলাম।

সেই মেয়েটি মুখ তুলছে না। দেখছেও না তাকে। তার কি যে হয়েছে, সে কারো দিকে তাকালেই সব গুলিয়ে ফেলছে। দেয়ালের দিকে বরং তাকিয়ে বলা ভাল। সামনে ব্ল্যাকবোর্ড—মাস তারিখ বছরের উল্লেখ। নিচে লেখা পরিচয় সভা। পরিচয় দিতে এসে সে কেমন গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। তবু সে তার বিষাক্ত পাখিদের আক্রমণের গল্পটি শেষ করল কোনরকমে। তারপর নিজের জায়গায় চলে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, সবার চোখ তার দিকে। মেয়েরা কানাকানি করছে। মনে হল, ওরা তাহলে সবটাই গুল ভেবেছে। যাতে গুল না ভাবে সে-জন্য খুবই করুণ মুখে জানাল, আপনারা বিশ্বাস করবেন না জানি, তবু এটা আমার জীবনে বড় একটা অভিজ্ঞতা। অ্যালবাট্রস পাখি মারার পর আমাদের জাহাজে এক অশুভ আত্মার আর্বিভাব ঘটে। আমি নাবিক নিলাম। নাবিকরা সাধারণত অ্যালবাট্রস পাখি মারে না। দীর্ঘদিনের সংস্কার। কিন্তু বলুন, চড়ুই পাখিটাকে খেয়ে ফেললে আমরা কি করতে পারি! মাসের পর মাস সমুদ্রে থাকলে মানুষ কিছুটা নিষ্ঠুর হয়ে যায়। বিষাক্ত পাখিদের আক্রমণ মনে হয় এক অশুভ আত্মার প্রভাবেই। অন্তত আমরা জাহাজে যারা নাবিক ছিলাম তারা এমনই বিশ্বাস করতাম।

এই শ্রী, শুনছিস?

কি?

ম্যালবোর্নের চোখ দুটো দেখলি?

কি আছে চোখে?

কেমন করে তাকায় রে!

কি জানি! শ্রীলা পাশ ফিরে শুল। মানুষটাকে বন্দনা অনীষ না বলে ম্যালবোর্ন বলছে। ওকে বলে দেওয়া দরকার, এই যে শুনছেন, ম্যালবোর্ন বলছেন কেন। ওটা মেলবোর্ন হবে। আপনার দীপ্ত মুখ, কথায় এমন গন্ধ ছড়ান কেন। ত্যামেন বলেন কেন—ওটা উচ্চারণ হবে তেমন। আপনি যে বাঙ্গাল বুঝতেই পারি। কথাবার্তায় এমন রুচিবোধের অভাব হবে কেন। খুব বিশ্রী লাগে শুনতে।

সামনের জানালা খোলা। পর্দা ঝুলছে। ঠাণ্ডা, খুব ঠাণ্ডা। তবু সে জানলার পাটা বন্ধ করেনি। জানলা বন্ধ করে দিলে কেমন দমবন্ধ ভাব ঘরগুলোতে। বন্দনার

সঙ্গে কমিউনিটি ডাইনিং হলে একসঙ্গে খেতে গেছিল। সবাই তারা দলবেঁধে খেয়ে এসেছে। জ্যোৎস্না রাতে ফেরার সময় দেখেছিল অনীষ আর দিলীপ শীতের রাতেও কোথাও ঘুরতে বের হয়ে গেল। বন্দনা বলেছিল, ঐ যে ম্যালবোর্ন যাচ্ছে।

পরিচয় সভা শেষ করে সবাই বাইরে এসে যখন দল বেঁধে ফিরছিল, তখনই কেমন খারাপ লেগেছিল কথাটা শুনে। হীরা অঞ্জলি বন্দনা ক্যান্টিনের পাশে এসেই হাসিতে ফেটে পড়েছিল।

কেন হাসছিল সে জানে। পেছনে লাগা। কানে তারও যে না বেজেছে তা নয়। খট করে কেমন যেন ভেতরে মানুষটার কথাবার্তায় গ্রাম্যতা ধরা পড়ে গেল। এই নিয়ে পেছনে লাগা। কবিকে নিয়েও কেউ কেউ পড়েছিল। আবার নীরেন মাউথ অর্গান বাজিয়েছে—তার প্রশংসা হচ্ছিল। হীরার গান নিয়েও। ইতিমধ্যেই এদের মধ্যে কয়েকজন সহপাঠী কোনো না কোনোভাবে সমালোচনার ঝড়ে পড়ে গেছে। কারো কোঁচা ধরে দাঁড়ান, কারো চোখ বুজে কথা বলা—শঙ্করদার সুন্দর কথাবার্তা নিয়েও তাদের মধ্যে বেশ আলোড়ন চলেছে। তা এমনই হবার কথা। মেয়েদের মধ্যে এটা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেই থেকে কানের কাছে ম্যালবোর্ন ম্যালবোর্ন করলে কাঁহাতক ভাল লাগে। শ্রী ঘুমাবার চেষ্টা করছে।

বন্দনা ফের বললে, সমুদ্রে বিষাক্ত পাখি আছে, তোর বিশ্বাস হয়! পাখি বিষাক্ত হয়, সে কেমন কথা!

শ্রী দেখল জ্যোৎস্নায় সাদা হয়ে আছে গাছগুলো। লেপটা বুকের উপর টেনে নিল। হাঁটুর উপর কাপড় উঠে এসেছিল—তা সে দু-পায়েই টেনেটুনে ঠিক করে নিল। ঘরে অল্প পাওয়ারের বাল্ব জালান। চারপাশে পাঁচিল। পাঁচিল পার হলে ধানের মাঠ। কোথা থেকে কোন উৎপাত মুখ বাড়াবে, ভয়ে সে উঠে ফের জানলা বন্ধ করে দিল।

কোনো কথা বলছে না দেখে বন্দনা উঠে বসল। ওর বিছানায় এসে বসলে শ্রী বলল, ঘুমোতে দে। সেই কখন সকালে বের হয়েছি। ঘুম পাচ্ছে। খুব সকালে উঠতে হবে, মনে রাখিস। প্রার্থনা সভা আছে।

বন্দনা বলল, তোর বিশ্বাস হয় ও নাবিক ছিল!

থাকতেই পারে।

বয়স তো খুব বেশি মনে হচ্ছে না। সব মিছে কথা।

ঠিক আছে, ঘুমোগে যা। কাল অনীষ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে বলব, বন্দনা সারারাত আমাকে জ্বালিয়েছে। আপনার বিষাক্ত পাখিরা এখন বন্দনার চারপাশে উড়ছে। কি করবেন?

বলে দেখ না!

না। বন্দনাকে বলল, কি যে একটা স্বপ্ন দেখলাম, কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

পাশের ঘর থেকে সুচিস্মিতা গলা বাড়িয়ে বলল, এই বন্দনা, হল। শ্রী উঠেছে! ও কি করছে! এত দেরি কেন!

ও নাকি স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নটা মনে করতে পারছে না।

কাকে স্বপ্ন দেখল?

কি জানি ছাই। মনেই করতে পারছে না। তারপর শ্রীর দিকে চিরুনিটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, চুলটা আঁচড়ে নে।

গেটের মুখে এসে ওরা দাঁড়াল। হীরা, অঞ্জলি আসছে। কমলিকা আজ খুব সেজেছে। সবাই প্রায় তাঁতের শাড়ি পরেছে। কেউ সিল্ক। কারো গায়ে লাল নীল কার্ডিগান। সবাই হি-হি করছিল শীতে। গেটটার পাশে রোদ এসে পড়েছে। গেট খুললেই দু-পাশে দু'জনের কোয়ার্টার। একটায় তারাদি। অন্যটাতে চারু সমাদ্দার। একজন কমিউনিটি ডাইনিং হলের চার্জে, অন্যজন হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট। চারুদি বারান্দায় সাদা একটা ভুটিয়া কুকুর কোলে নিয়ে বসে আছেন। আসলে বারান্দায় বসে লক্ষ্য রাখা কে কে গেল, ক'জন গেল। এই শিক্ষা নিকেতনের নিয়মকানুনের প্রতি কার কতটা শ্রদ্ধা আছে এও বোধহয় বসে লক্ষ্য রাখেন। শ্রী দৌড়ে নেমে এল—সবাই গেট পার হয়ে রাস্তায় পড়লে বন্দনা বললে, মনে করতে পারলি?

স্বপ্নটা শ্রী মনে করতে পেরেছে। কিন্তু সে এড়িয়ে গেল। বলল, কিসের স্বপ্ন!

এই যে বললি, কি যে ছাই স্বপ্ন দেখলাম মনে করতে পারছি না। কি যে খারাপ লাগছে! স্বপ্নটা মনে করতে না পেরে মুখ গোমড়া করেছিলি!

মুখ গোমড়া করলাম! বাজে বকছিস!

সুচিস্মিতা বলল, ছোট রবি ঠাকুর দাঁড়িয়ে।

বন্দনা বলল, কি সেজেছে দ্যাখ।

হীরা বলল, গাঁইয়া! তারপর হীরা দুষ্টুমি ভরা চোখে বলল, যাবার সময় চোখ মেরে যাব।

শ্রী বলল, যা! কেন লাগবি পেছনে! এই লাগাটা শ্রীর পছন্দ নয়। আসলে ছেলেরা অধিকাংশ মফস্বলের এবং পাড়াগাঁয়ের। যেন চাষ-আবাদের গন্ধ নিয়েই পড়তে এসেছে তারা। শহরে থাকলে যে ধরনের মার্জিত রুচি গড়ে ওঠে, শিক্ষার সঙ্গে সেটার যেন অভাব। তবু সব অভাব পুষিয়ে দেয় এদের সারল্য। হীরা বলল, আমি ভাবছি গণেশ হালদারের প্রেমে পড়ব। মিউজিক ভবন পার হয়ে কমিউনিটি ডাইনিং হল। তার পাশে লম্বা দেবদারু গাছ। গণেশ হালদার প্রকৃতির

সৌন্দর্যে মশগুল, এমন উদাসীন মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হীরা বলল, এই যে গণেশ ভাই, চলুন। যাবেন না?

হীরা পারেও। কত সহজে কথা বলতে পারে। চার-পাঁচ দিনও হয়নি, এরই মধ্যে হীরা বেশ মিলেমিশে যেতে পেরেছে।

গণেশ বলল, সকালের শিশির বড় মনোরম। খালি পায়ে ঘাসের উপর হেঁটে গেলে বেঁচে থাকা কত সার্থক বলুন।

হীরা অঞ্জলির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, বোকা বোকা কথা বলে লোকটা বোঝে না। আসলে আমাদের দেখবে বলে দাঁড়িয়েছিল।

এটা ঠিক এই সকালে, যখন সূর্য উঠছে, লাল আভা সরে গেছে পৃথিবীর, তখন এক আশ্চর্য স্নিগ্ধতার মধ্যে এতগুলো নারীকে দেখার মধ্যে জীবনে বেঁচে থাকার সঞ্জীবনী সুধা থাকে। গণেশ হালদার মনে করে, এই দর্শনে পুণ্যলাভ হয়। সে তীর্থযাত্রী। এখানে এসেছে—মহান এক তীর্থক্ষেত্র দর্শন হবে বলে। গণেশ হালদার মেয়েদের বড় ভালবাসে। যতক্ষণ আগে থেকে দেখা যায়। যতক্ষণ কাছে থেকে দেখা যায়, যতক্ষণ দূর থেকে দেখা যায়। একজন নারী কোনো বার্তা বহন করে নিয়ে আসে না। মেঘেরা যত বেশি ঘন হয় তত বেশি জল বহন করে। গণেশ হালদারের প্রাক্‌যৌবনে বিবাহ। তার প্রিয়তমা এখন সজনের ডাঁটা। ফুলের স্নিগ্ধতা কবেই হারিয়েছে। ডাঁটা চিবোতে কত আর ভাল লাগে। স্কুলের শিক্ষকতা, কবিতা লেখা, চাষ-আবাদ দেখা, ধানের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকার পর এমন এক জীবনে এসে গণেশ হালদার কতটা কৃতী মানুষ তা প্রতিপন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তা ছাড়া এখানে আসার পরই কবিতা লেখার জোয়ার এসে গেছে তার। চণ্ডী তার ঘরে থাকে। রাত জেগে দুটো কবিতা লিখে সকালে পড়ে শুনিয়েছে চণ্ডীকে। চণ্ডী যখন দারুণ দারুণ করে উঠেছিল—তখন গণেশ হালদার ভাবল, না—যাই, দেবদারু গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াই। কবিতায় যারা উৎস, তাদের দেখা এখন তার একটি প্রিয় কাজ।

শ্রী কামিনী ফুলগাছটার নিচে এসে দেখল, সবাই প্রার্থনা সভায় যাচ্ছে। রবীন্দ্রভবন গান্ধীভবন অরবিন্দভবনের ছাত্ররা দল বেঁধে আসছে। অনীষকে তাদের মধ্যে দেখা গেল না। ওকে দেখলেই বন্দনারা ফিসফিস করে বলবে ঐ দেখ ম্যালবোর্ন কেমন ধীর পায়ে নেমে আসছে। যেন কাউকে দেখতে পায় না। আসলে সে মনে করতে পেরেছে, স্বপ্নটা ছিল একটা অতিকায় সমুদ্রের ভেতরে ছোট্ট এক জনহীন নির্জন দ্বীপ। একটা সোনালি ক্যাকটাস দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাকটাসটা পরে কখন যেন অনীষ হয়ে যায়। দু-হাত তুলে সেই নির্জন দ্বীপে মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে অনীষ। রবিনসন ক্রুসোর মতো মনে হয় অনীষকে—তারপরই

কোত্থেকে এল এক দঙ্গল মেয়ে—অনীষ ভয়ে পালাচ্ছে। পাহাড় শীর্ষে দাঁড়িয়ে অনীষ। নিচে মেয়েরা সব এক এক করে পোশাক খুলে ফেলতে থাকল—ওরা অনীষকে যে পাচ্ছে—ম্যালবোর্ন, ম্যালবোর্ন, তুমি পালাবে কোথায়? তোমার ছদ্ম বেশ আমরা খুলে দেব। চামড়া টেনে তুলব। তুমি গুল মেরেছ। জান না আমরা কে!

পাহাড় শীর্ষে অনীষ ভয়ে একটা খরগোস হয়ে গেল। তারপর মনে হল খরগোসটা তার পায়ের নিচে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে। তাকে দেখছে। তারপর আর কিছু মনে করতে পারছে না শ্রী।

অনীষ, দিলীপ, জ্যোতির্ময়দারা আসছে। সেই পাজামা পাঞ্জাবি পরনে। গায়ে খদ্দরের মোটা চাদর। শ্রী বারান্দায় উঠে যাবার সময় গোপনে সব লক্ষ্য করল। কালও এই এক জামা পাজামা পরে এসেছে। আজও। যেন এর বেশি তার আর কিছু নেই। নাকি অনীষ নিজের পোশাক-আশাক সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। শ্রী ভাবল, ওকে একবার ডেকে বলা দরকার, আপনি এমন সুন্দর দেখতে, আপনি কেন ম্যালবোর্ন বলবেন! কেমন খারাপ লাগে ভাবতে। আপনি তো জানেন না, আপনি আর আমাদের কাছে অনীষ না। আপনি আমাদের কাছে ম্যালবোর্ন।

হলঘরে একে একে সব দাদারা আসছেন। বিমলেন্দুদা এখন সবার কাছে বড়দা। অধ্যক্ষকে এই ডাকার নিয়ম। বড়দা, সমরদা, সুধীরদা এসে একসঙ্গে বসেছেন। আর একপাশে মেয়েরা। পেছনে ছেলেরা। কারুকাজ করা ছোট্ট চাদরে জলচৌকি ঢাকা। দু-পাশে দুটো পেতলের মিনা করা ফুলের ভাস। তাতে ডালিয়ার গুচ্ছ। শঙ্করদা ঢুকলেন। আর্টের অধ্যাপক একবার হলঘরের চারপাশটা লক্ষ্য করলেন। খুবই ছিমছাম সব। দেয়ালে মহাপুরুষদের ছবি। ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সারা ঘরে চামেলি ফুলের সুবাস।

প্রথমে উপনিষদ থেকে কিছু পাঠ। সঙ্গীতের অধ্যাপক জটিলাদা হীরা এবং অন্য কয়েকজনকে নিয়ে গোল হয়ে বসে। পাঠের পর গান। তারপর শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ থেকে একটি অনুচ্ছেদ পড়ে শোনালেন ঋত্বিক গোকুলদা। গোকুলদা ঋত্বিক হবেন আজ, আগে থেকেই ঠিক ছিল বোধ হয়—তিনি সকালে স্নান করে পাটভাঙা পাঞ্জাবি পরে গম্ভীর মুখে পাঠ করে গেলেন। পাঠ শেষে চোখ বুঝে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন—যাকে বলে আত্মমগ্ন হওয়া।

শ্রী আত্মমগ্ন হতে গিয়ে দেখল, অনীষকে সবাই যেন ক্ষেপাচ্ছে—এই ম্যালবোর্ন, আপনার বিষাক্ত পাখিরা কোথায় শেষে উড়ে গেল বলুন তো!

হোস্টেলে ঢোকার সময় কে যেন বলল, আজ ম্যালবোর্ন জুতু হয়ে গেছে।

শ্রীও শুনেছিল, এই দিলীপ, আমার জুতু কে নিল রে। দেখছি না!

ইস, কি যে করে! শ্রী ক্ষেপেই গিয়েছিল। বাঙ্গাল বলে কি যা খুশি তাই উচ্চারণ করবে! তবু সেই মানুষটার মুখের দিকে তাকালে কেন জানি রাগ করা যায় না। সে বলল, জুতু বলেনি, জুতো বলেছে।

হীরা বলল, মোটেই না। জুতু বলেছে।

শ্রী ঘরে ঢুকে বলল, তোরা শুনতে পাস, কৈ আমি তো শুনতে পাই না।

বন্দনা ব্রেকফাস্ট দেওয়া হবে বলে প্লেট এবং জলের গ্লাস ধুয়ে রাখছিল বেসিনে। মুখ বাড়িয়ে বলল, বাজি ধর।

শ্রী এসেই বিছানায় শুয়ে পড়েছিল, বাজি ধরতে যাব কেন? আমি তো শুনলাম মেলবোর্ন! তোরা শুনলি ম্যালবোর্ন। এখন শুনলি জুতু।

বন্দনা বলল, আরে অনীষ একেবারে কাঠ-বাঙ্গাল। কিছুতেই শোধরাবে না। বেশ মজা করা যাবে।

শ্রীর কেমন খারাপ লাগল ভাবতে অনীষকে নিয়ে মজা করা যাবে কথাটাতে। তারপরই মনে হল, ধুস, কোথাকার কে—তার জন্য এ-সব ভেবে কি হবে। ডাইনিং হল থেকে ব্রেকফাস্ট ছেড়ে আবার সে এল হলঘরটায়। অধীরদার ক্লাস। প্রিন্সিপল্ অফ এডুকেশনের ক্লাস। তারপর মেথডের ক্লাস। তারপর তকলি কাটার ক্লাস। শেষে সাফাই, স্নান এবং আহার। ধরা-বাঁধা রুটিন। বিকালে স্পেশাল ক্রাফটের ক্লাস। কেউ স্পেশাল আর্ট নিয়েছে, কেউ মিউজিক, কেউ উইভিং, কারো ব্ল্যাকস্মিথ। শ্রী নিয়েছে স্পেশাল আর্ট এবং মিউজিক।

স্পেশাল আর্টের ক্লাসটা একটু দূরে। এক্সপেরিমেন্টাল স্কুলের মাঠ পার হয়ে যেতে হয়, দু-পাশে সব বড় বড় পাতাবাহারের গাছ। তার ভেতর দিয়ে গেলে দূর থেকে মনেই হয় না কেউ সেখানে ক্লাস করতে যাচ্ছে। গাছগুলো বড় বলে মানুষকে সহজেই ঢেকে দিতে পারে। শ্রীর এইসব রাস্তায় হাঁটতে খুব ভাল লাগে। আর্টের ঘরটায় সে ঢুকে দেখল, টিনের শেডের নিচে বড় বড় সব ইজেল। আর্টের অধ্যাপক কমলদা তখনও আসেননি। বিশ-বাইশজন ছাত্রছাত্রী কমলদার জন্য অপেক্ষা করছে। সে আর বন্দনা ঢুকেছে সবার শেষে। ঘরটির দেয়ালে জলরঙের সব ছবি। সবই বোধহয় কমলদার আঁকা। নিচে লম্বা শতরঞ্জ পাতা—সে ভেবেছিল, অন্তত স্পেশাল আর্টের ক্লাসে অনীষকে দেখতে পাবে। মানুষটা যখন এত সুন্দর এবং বিনয়ী তখন তার পক্ষে স্পেশাল আর্ট নেওয়াই শোভন। কিন্তু ভিতরে ঢুকে ভারি হতাশ হল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর রাগও হল কম না। এখানে এসেই মানুষটার উপর দরদ একেবারে উপচে পড়ছে। তার হাসি পেল নিজের করুণ অবস্থার কথা ভেবে। নিজেকে ঠাট্টা করতে ইচ্ছে হল। বন্দনাকে বলল, ম্যালবোর্নটা কিরে, আর্ট না মিউজিক না, কাঠখোট্টা একেবারে।

বন্দনা বলল, ঐ দ্যাখ যাচ্ছে।

শ্রী দেখল, অনীষ উইভিংয়ের ক্লাস করতে পাশের বাড়িটায় ঢুকছে। শ্রী কিছুটা হতবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকল।

অনীষ চুপচাপ শুয়ে আছে। মাথার কাছে টেবিল। একেবারে ফাঁকা। শ্রেণীকক্ষের আয়তন নিয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছে দিলীপ আর জ্যোতির্ময়দা। জ্যোতির্ময়দার বোধ হয় চল্লিশের কোঠা পার হয়ে গেছে। সুপুরুষ মানুষ। রোজ দাড়ি কামান। একমাত্র জ্যোতির্ময়দাই এই ঘরে রোজ দাঁড়ি কামান। দিলীপ ধীরেন দু-তিন দিন বাদে বাদে। অনীষের দাড়ি কাটার নামে মাথায় বাজ পড়ে। তার সপ্তাহ হয়ে যায়। এই নিয়ে মাঝে মাঝে জ্যোতির্ময় অনীষের পেছনে লেগেছে।—কিরে শোক সপ্তাহ পালন করিস নাকি। অনীষ মুচকি হেসে এড়িয়ে গেছে।

জ্যোতির্ময় বলছে, দেখ দিলীপ, স্কুল সম্পর্কে তোর কোন ধারণা নেই। কেতাবি কথার দামও নেই। আমাদের দেশে কোন্ স্কুলে ছাত্র পিছু বার বর্গফুট জায়গা আছে? কোন্ স্কুলে একটা ক্লাসে তিনশজন ছাত্র নেওয়া হয়—দেখা!

করতে হবে।

করতে গেলে ম্যাও লাগে। খেতেই পায় না ছেলেরা, তারা আবার পড়বে।

অনীষ উঠে বসল। বলল, জান জুতির্ময়দা, সে এক কাণ্ড।

দিলীপ বলল, আবার জুতির্ময়দা বলছিস! তোর মতো ছেলের পক্ষে...বল জ্যোতির্ময়দা।

রাখতো। কথা বলছি, সবতাতেই বাগড়া।

একশ বার বাগড়া দেব। তাই বলে যা খুশি তাই বলতে পারবে না। আমরা বলতে দেব না।

আমি বলব, দেখি তোরা কি করতে পারিস।

বলবি মানে! তোর না বলে উপায় নেই। উচ্চারণ কর না জ্যোতির্ময়। কিছুতেই হবে না।

যাই বলিস, কড়িকাঠ গুনছি না। বুঝলে জুতির্ময়দা, ছেলেটা শুধু একটা বাংলা বই নিয়ে ক্লাসে আসে।

দিলীপ ক্ষেপে গিয়ে বলল, আমি থাকছি না। আমি শুনছি না। জ্যোতির্ময়দা, তুমি শোন। বাঙ্গালটা মান-সম্মান বোঝে না।

জ্যোতির্ময় বলল, সারাদিন তোরা কেন যে ঝগড়া করিস! এদিকে একজন তো আর একজনকে না দেখলে হেদিয়ে মরিস।

আমি শুনছি না। বাঙ্গালের কথা শুনছি না! আচ্ছা জ্যোতির্ময়দা, তুমি তো

বাঙ্গাল, কই তুমি তো এ-ভাবে কথা বল না। আমাদের বোনেরা ভাবে কি। দিলীপ কেমন করুণ মুখে বের হয়ে গেল।

অনীষ বলল, যাক বের হয়ে, তুমি ডাকবে না।

জ্যোতির্ময়দা বলল, তুই একটু সাবধানে কথা বললেই পারিস।

কি করে করি বল! বাড়িতে দেশের কথা না বললে বাবা-মা রাগ করে। চার পাঁচ বছরও হয়নি দেশ ছেড়ে এসেছি। কলোনিতে বাড়ি। অভ্যাস নেই।

জ্যোতির্ময় বলল, কি বলছিলি বল।

ছেলেটাকে বললাম, কিরে, তর একটা বই কেন? আর বই কই? অংক ইংরেজি কই?

কি বলল?

শুনলে অবাক হবে। বলল, বাপজান বুলেছে, একটা বইর পড়া শেষ হলে আর একটা বই কিনে দেবে।

জ্যোতির্ময় বলল, এই আমার দেশ, বুঝলি। বলে, এই যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, গোটা টাকাটাই অপচয়, এমন প্রমাণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলে দিলীপ এল—কি, তোমাদের কথা শেষ হয়েছে?

অনীষ কথা বলল না। সে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকল। জানলা বন্ধ। আটটা না বাজলে ডাইনিং হলে খেতে দেওয়া হয় না। এক একটা ঘরে এখন এক এক রকম দৃশ্য। ধীরেন দেশ থেকে আসার সময় তবলা ডুগি নিয়ে এসেছে। সে একটু প্র্যাকটিস করবে বলে চৌকির নিচ থেকে টেনে বের করতেই দিলীপ হাত জোড় করে বলল, ধীরেন মনমেজাজ ভাল নেই। এখন ও নিয়ে বসবে না।

ধীরেন মানুষটি ভাল। সরল এবং গ্রাম্য স্বভাব। সে জানে দিলীপের বাবা ডি আই। এ-জন্য ধীরেন দিলীপকে সমীহ করে চলে। সে বলল, একটু বাজিয়ে চাঙ্গা করে দি। কারণ ধীরেন, একবার অনীষ আর দিলীপ তুমুল ঝগড়া তর্ক বাধিয়ে দিলে, তবলা আর ডুগি তুলে এমন তারস্বরে বাজাতে থাকল যে বাধ্য হয়ে দুজন চুপ করে গেছিল।

দিলীপ ঢুকেই একটা সিগারেট ধরাল। খুব গম্ভীর। কিন্তু অনীষ চুপচাপ আছে দেখে সে স্থির থাকতে পারছে না। যেন দুজনের মধ্যে একদম কথা বন্ধ হয়ে যাবে। দিলীপ সিগারেট ঝেড়ে বলল, কত দেশ তুই ঘুরেছিস, তোর আদব-কায়দাই হবে অন্য রকম। তুই যখন লেখালিখি করিস, তখনতো লিখিস না, জুতির্ময়, ত্যামন, জুতু—কখনও লিখিস—বল, বল না? চুপ মেরে আছিস কেন?

অনীষ খুবই হীনমন্যতায় ভুগছে, চোখ মুখ দেখেই বোঝা যায়। তাকে

শোধরানোর স্বভাবটা দিলীপের আগেও ছিল। তবে এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না। মাঝে-সাজে বলত, তুই কিরে—'তর' বলিস কেন? তোর বলতে পারিস না। এবং এই নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঠাট্টা পরিহাস যে না হয়েছে তাও নয়—তবে কখনও কেউ এই নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু এখানে এসে দিলীপ এই নিয়ে এমন ক্ষেপে গেছে যে মাঝে মাঝে, খ্যাতাপুড়ি প্রশিক্ষণের—দরকার নেই হাইস্কুলে চাকরি করার—এমন ভেবেছে অনীষ। কেন যে দিলীপটা এত ক্ষেপে যাচ্ছে অনীষ বুঝছে না। তার উপর আজ আবার লেখালিখির কথাটাও বলে ফেলল। এটা দোষের না গুণের, সে বোঝে না। তার দুটো একটা গল্প প্রবন্ধ মফস্বল কাগজে বের হয়েছে। তার লেখা নিয়ে বন্ধুবান্ধবরা হৈচৈও করেছে—তবে ঐ আর কি। কিছু একটাতো করতে হয়—এই ভেবেই করা। দিলীপ কি আর আগের দিলীপ নেই! সে একজন ডি আই-এর ছেলে, তার বন্ধু যদি এমন হয় তবে সে যায় কোথায়। মান-সম্মান বলে কথা।

অনীষ থম মেরে আছে।

জ্যোতির্ময় বলল, দিলীপ, একটা গান গা। ফুটল অলি কুসুম কলি গা। গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে।

ধীরেন বলল, গাও দিলীপভাই। আমি বাজাই।

অনীষ কিছু বলছে না।

এরা চারজন একই ঘরে থাকে। জ্যোতির্ময়দা আবার না বলে বেড়ায় অনীষ লেখক। তালেই গেছে। কি লেখেন। কোথায় লেখেন! যেন অজস্র প্রশ্ন হবে তাকে ঘিরে। সে ভাবছিল একটাও কথা বলবে না। কিন্তু দিলীপের লেখালিখির কথায় শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকতে পারল না। দিলীপের দিকে না তাকিয়ে বলল, তোকে কে বলেছে আমি লেখালিখি করি?

দিলীপ সামান্য সংকটের মধ্যে পড়ে গেছে। এই প্রশিক্ষণে আসার মুহূর্তে একটা শর্ত ছিল, তুমি যদি এই লেখালিখির কথা সেখানে গিয়ে ফাঁস করে দাও তবে কিন্তু ঝামেলা হবে। সে অনীষের গোমড়া মুখ দেখে ঝড়ের আভাস পেল। কি জানি কাল সকালেই যদি বোঁচকা বুঁচকি নিয়ে রওনা দেয়—এর তো আখের সম্পর্কে কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। জীবন একভাবে চলে গেলেই হল, এমন যে সার বুঝে ফেলেছে তার পক্ষে সব সম্ভব। অগত্যা কেমন কাঁচুমাচু গলায় বলল, লেখালিখি মানে, পরীক্ষার খাতায় যখন লিখিস তখন তো 'তর' 'জুতু' 'ত্যামন' লিখিস না।

জ্যোতির্ময় বলল, এতদিনের স্বভাব এক দু বছরে পাল্টাবে কি করে!

দিলীপ পা তুলে বসেছিল চেয়ারে। পা নামিয়ে বলল, অনেকেই পারে।

অনীষ বলল, কেউ কেউ পারে না।

দিলীপ সিগারেটটা জানলা খুলে বাইরে ফেলে দিল। ঘরে কোনো অ্যাশট্রে রাখা যায় না। মাঝে মাঝেই দাদারা এসে ঢোকেন। কখন কোথায় ধরা পড়ে যাবে ভয়েই ঘরে সে অ্যাশট্রে রাখে না। সমরদা আবার বাবার বন্ধু। তার কানে কথাটা উঠলে, বাবার কাছে লাগানি-ভাঙানি হতে পারে। সে এ-জন্য সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে এই কষ্টটা স্বীকার করে নিয়েছে। ঘরে কোনো সিগারেটের টুকরো পড়ে থাক আর কেউ দেখে ফেলুক, সে সেটা চায় না।

দিলীপ বলল, পারে না নয়, ঠিকই পারে। আসল পাল্লায় পড়লে ঠিক পারে। আমরা তো আর আসল পাল্লা নই। দেখতে তেমন যদি কেউ এসে জুটত....

আর জুটত! অনীষ এমন ভাবল। তার জীবনেও কিছু জুটবে না। তা ছাড়া আশ্চর্য এক সৌন্দর্য তার মধ্যে খেলা করে বেড়ায়—সে সহজে কোন মেয়েকে পছন্দ করতে পারে না। ঘাড়-গলা, চোখ-মুখ এবং শরীরে যতই সৌন্দর্য থাকুক, সে মনে করে নারীর চলাফেরায় আসল সৌন্দর্য ধরা পড়ে। শ্রীর মধ্যে এটা আছে। সে যখনই শ্রীকে দেখেছে, কেমন ধীর পায়ে না তাকিয়ে, অন্য এক গোপন গভীর আলোয় ডুবে গিয়ে পথ হেঁটেছে। তাকে অতিক্রম করে গেছে। সে এখানে আসার পর শ্রীর সঙ্গে কথা বলবে বলে ক্যান্টিনের সামনে যে কৃষ্ণচূড়া গাছটা আছে তার নিচে দাঁড়িয়ে থেকেছে। ক্যান্টিনে শ্রী এলে কোণের একটা চেয়ার টেনে দিলীপের সঙ্গে বসে চা খেয়েছে। কিন্তু বলতে পারেনি, আপনি সাহস দিয়েছিলেন বলে শেষ পর্যন্ত চলে আসতে পেরেছিলাম। নাহলে ক্রসিংয়ে আটকে থাকতে হত। কে জানে দেরি করে ফেলেছি বলে আবার স্টেশনেই ফিরে যেতাম কি না।

এখন তার সে সাহসও নেই। যে-ভাবে দিলীপ তার এ-কার ও-কারের পিছনে লেগেছে তাতে করে মনে হয়েছে, এ-ভাবে কোনো কারণে তার স্বাভাবিক উচ্চারণ বের হয়ে এলে শ্রীর ভাল লাগা দূরে থাক, ক্ষেপে যাবে কিনা কে জানে?

এ-জন্য অনীষ আর গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না।

এ-জন্য অনীষ আর আজকাল শ্রীকে দেখলেও ক্যান্টিনে ঢোকে না।

একবার মনে হল বলে, আমার সঙ্গে তুই ঘোরাঘুরি করিস না দিলীপ। আমাকে নিয়ে যদি তোর এতই জ্বালা থাকে, না মিশলেই ল্যাটা চুকে গেল। তারপরই মনে হল, সে যে এখানে আসতে পেরেছে দিলীপের জন্য। প্রাথমিক স্কুলের কাজটাও দিলীপের জন্য। প্রাইভেটে বি এ পাস করেছে, দিলীপেরই উৎসাহে। সেই ফর্ম আনানো থেকে ফর্ম পূরণ করা সব সে করেছে। এমন কি নোট সংগ্রহ থেকে বইটই সব যোগাড় করার দায়িত্ব নিয়েছিল দিলীপ। কেবল অনীষ দয়া করে পরীক্ষাটা যেন দেয়—দিলেই পাস। তাকে নিয়ে এত যার উৎসাহ—তাকে সে এমন কঠিন কথা বলে কি করে!

অনীষ কেমন কাঁচুমাচু গলায় বলল, আমি ত চেষ্টা করছি। সতর্ক থাকি। হলে কি হবে, সব গণ্ডগোল হয়ে যায়।

জ্যোতির্ময়দা বলল, দিলীপ, এ-সবে ভাই তুমি অযথা গুরুত্ব দিচ্ছ!

দিলীপ বলল, অযথা গুরুত্ব দিচ্ছি বলছেন! সেই পুঁচকে মেয়েটা—ঐ যে মিহিজাম থেকে এসেছে—আমাদের হীরা বোন কি বলল জানেন?

অনীষই বলল, কি বলল

কি আবার বলবে!

বল না কি বলল?

না, বলব না। দুঃখ পাবি।

ধুস, দুঃখ! ও-সব আমি কেয়ার করি না।

দিলীপ নিজের তক্তপোষে উঠে বসল। একবার ঘড়ি দেখল। ডাইনিং হলে ঘন্টা বাজতে এখনও পনের বিশ মিনিট বাকি। ধীরেন তার থালা গ্লাস ধুয়ে বসে আছে। ঘন্টা পড়লেই ছুটে যাবে। জ্যোতির্ময়দা উঠে গোকুল-দার ঘরে চলে গেল। ওরা সমবয়সী—দিলীপ উচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং কিছুটা তরলমতি—সে এমন এক সমস্যায় পড়ে যাবে, জ্যোতির্ময়দা হয়ত ভাবতে পারেনি। কিছুটা চ্যাংড়া ছেলে ছোকরাই ভেবে থাকে অনীষ আর দিলীপকে। গোকুলদা সমবয়সী বলে, জ্যোতির্ময়দার সঙ্গে একটা সখ্যতা জন্মে গেছে। খাবার সময় দুজন একসঙ্গে খায়। একসঙ্গে ফিরে আসে। এ-সব দেখেই বোঝা যায় কে কার জুটি। হীরাও ঠিক টের পেয়েছে দিলীপের জুটি অনীষ। বোধ হয় তার মতো হাল্কা চালের ছেলের এমন গম্ভীর হয়ে যাওয়াটা পছন্দ হয়নি জ্যোতির্ময়দার। তাই উঠে গোকুলদার ঘরে চলে গেল। দিলীপও সবার সামনে কথাটা বলতে ইতস্তত করছিল।

ধীরেন কি বুঝল কে জানে। সেও বের হয়ে গেল থালা গ্লাস নিয়ে। অর্থাৎ ডাইনিং হলের কাছাকাছি এগিয়ে থাকা। সেই বারটায় খাওয়া, তারপর রাত আটটায় এতখানি গ্যাপে সবারই প্রচণ্ড ক্ষিধের উদ্রেক হয়ে থাকে। কে আগে গিয়ে বসে পড়বে তার চেষ্টায় পাঁচ দশ মিনিট আগে থেকেই ঘরে ঘরে প্রায় সাজ সাজ রব পড়ে যায়। অনীষের ঘরেও পড়ে। ধীরেনের মতো তারাও থালা গ্লাস ধুয়ে রেডি। ঘন্টা পড়লতো-ছুট। অনীষের থালাগ্লাস দিলীপ নেয়। কারণ অনীষ আবার হা-ভাতের মতো দৌড়তে পছন্দ করে না। দিলীপ বসেই পাশের আসনে অনীষের থালাগ্লাস রেখে দেয়। জায়গা দখল করে রাখা।

অনীষ বলল, তালে বলবি না!

কি সাহস জানিস! বলে কি না, ম্যালবোর্ন ভাইকে দেখছি না, আপনি একা!

ইচ্ছা হচ্ছিল ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দি। তুই জানিস ওকে!

অনীষ দিলীপের এমন কথাতে ভারি মজা পায়। তুই জানিস ওকে! বলতে সব রাগ অভিমান কেমন জল হয়ে গেল অনীষের। সে উঠে দাঁড়াল। থালা গ্লাস খুঁজল। বলল, বলুক গে।

দিলীপ নিজের থালা গ্লাস তক্তপোষের নিচ থেকে বের করল। জাগের জল দিয়ে ধুল। অনীষেরটা ধুয়ে নিল। বলল, বলে দেখুক না ফের। কেমন লাগি পেছনে দেখবি।

পিছনে কি লাগবি আবার?

হ্যাঁ, পেছনে লাগব। বলব, এই যে হীরা বোন, আপনার লাভার নাকি মারা গেছে!

লাভার!

হ্যাঁ, লাভার। প্রথম মেয়েটাকে দেখে মনের মধ্যে জানিস খুচ-খুচ করছিল—এই একটা ইয়ে হয় না! প্রেম প্রেম ভাব। তুই তো বুঝিস। পরিচয় সভার পর থেকে—কতবার আমি ওকে স্বপ্ন দেখেছি। এই একটা কথায় সব মোহ আমার, কি বলে যেন, এই মানে, ভেঙে গেল। তাই ভাবছি কালই বলব, হীরা বোন, আপনার লাভার মারা গেছে।

অনীষ বলল, ও-সব আর তর বলতে হবে না।

বলতে হবে না মানে! আলবাৎ বলব। তোকে যে ছোট করে তাকে আমি ছোট করবই। তার লাভার যে মরে গেছে তাও তাকে জানিয়ে দিতে হবে। এটা আমার চরম কর্তব্য। দিজ ইজ মাই ডিউটি।

অনীষদের ভবন থেকে ডাইনিং হল সবচেয়ে কাছে। বের হলেই সামনে মাঠ, ডান দিকে বিশ বাইশ গজ এগিয়ে গেলেই ডাইনিং হল। হলের বারান্দায় একশ পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। তার নিচে পাঁচ সাতটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েদের হোস্টেলটাই ডাইনিং হল থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে। ওরা ঘন্টার সঙ্গে যতই পাল্লা দিয়ে ছুটে আসুক, ভাইদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। এসে দেখবে প্রায় প্রথম ব্যাচের জায়গা দখল। অতদূর হেঁটে যেতে হবে বলে কেউ কেউ বসতে না পারলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। প্রথম ব্যাচটা উঠে গেলে ওরা গিয়ে বসে। অনীষ এ ক'দিনেই টের পেয়েছে, শ্রী আসে সবার শেষে। এই আগে খেয়ে নেওয়ার বিষয়ে সে কারো প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চায় না। সব কিছুতেই ওর কেমন একটা যেন রুচির প্রশ্ন আছে। দুপুরে সে একদিন দেখেছে, শ্রী আর বন্দনা সবার শেষে খেয়ে উঠে যাচ্ছে। ওরা কলপাড়ে দাঁড়ায় না পর্যন্ত। এঁটো থালা গ্লাস হাতে নিয়েই চলে যায়। শ্রী কারুকাজ করা একটা চিনেমাটির প্লেটে খায়। সাদা রঙের প্লেট।

সোনালি কাজ করা। সঙ্গে দামি কাচের গ্লাস। সে হয়ত সবার সঙ্গে বসে খেতে লজ্জা পায়। মেয়েদের এমনই স্বভাব সে পছন্দ করে। আজ দেখল শ্রী আগে এসে গেছে। বারান্দায় পায়চারি করছে। ঘন্টা পড়লেই বসে যাবে। শ্রীকে সে এ-ভাবে দেখবে আশা করেনি। দিলীপ ডাইনিং হলে ঢুকে গেছে। ঘন্টা বাজাচ্ছে অমূল্য। সে বারান্দায় উঠে কাউকে লক্ষ্য করছে না, এমন একটা ভাব করে ঢুকে যাবার মুখে কেন জানি গোপনে শ্রীকে দেখার ইচ্ছে হল। চোখ তুলতেই দেখল শ্রীও তাকে গোপনে দেখছে। এক পলক। এই এক পলক দেখা কিংবা জীবনের আরও কত মাধুর্য যে এই এক পলকের মধ্যে থেকে যায়—সে খেতে বসে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সামনের সারিতে শ্রী, বন্দনা, হীরা এবং সব মেয়েরা বসে খাচ্ছে। তার কেন জানি ইচ্ছে হচ্ছিল, চোখ তুলে শ্রীর খাওয়া দেখে। সব কিছুতেই এক সজীব আভিজাত্য আছে মেয়েটার মধ্যে, কিন্তু চোখ তুলে দেখার সাহস হল না! কি জানি যদি আবার চোখ পড়ে যায়—কি না আবার ভাববে। বেহায়া ভাবতে পারে। তার সাহস হল না দেখার।

পরদিন সকালে চণ্ডী এসে খবর দিল। অনীষ, তোকে শ্রী বোন ডাকছে।

আমাকে!

তাইতো বলল।

সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ চৌকি থেকে লাফ দিয়ে নেমে সিঁড়িতে উঁকি দিল। আরে সেই মেয়েটা। শংকরদার কেমন আত্মীয় হয়।

দিলীপ ঘরে ঢুকে বলল, দাঁড়িয়ে আছে। যাও।

আমাকে ডাকবে কেন?

সে আমি কি করে বলব!

চণ্ডী যা ফাজিল ছেলে। আমাকে কেউ ডাকতে পারে না। এটুকু বলার পরই অনীষের অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল। চোখ তুলে সে অপলক দেখেছে! অবশ্য গোপনে। চুরি করে দেখার মধ্যে কোন মহত্ত্ব নেই। চুরি বিষয়টাই খারাপ। সেই অভিযোগ তুলতে আসেনিতো। কাল আমাকে চুরি করে দেখছিলেন কেন? এমন অভিযোগ করলে সে কি উত্তর দেবে? তার ভিতরের শীতটা আরও প্রবল হয়ে উঠল। সে কেমন জবু-থবু হয়ে বসেই আছে।

যা! বসে থাকলি কেন?

অনীষ বলল, আমার পড়া আছে।

সকালে অনীষ প্রিন্সিপল্ অফ এডুকেশন বইটা খুলে উল্টে-পাল্টে দেখছিল—এই সময়েই খবর তার তলব পড়েছে।

জ্যোতির্ময়দা বলল, যাও। ডাকছে যখন যাও। মেয়েরা ডাকলে যেতে হয়।

আপনি বলছ্যান যেতে?

হ্যাঁ, বলছি।

দিলীপ বলল, বলছ্যান না। বলছেন বলবে।

আবার ভিতর থেকে গুড় গুড় করে ভয়টা উঠতে থাকল। অনীষ জোর পাচ্ছে না। কি যে দরকার ছিল লোভে পড়ে তাকাবার। একবার দুবার নয়, কয়েকবারই ঘটনাটা ঘটেছে। ক্লাসরুমে, রাস্তায় দেবদারু গাছের নিচে, ক্যান্টিনে এমন ঘটেছে। আর সব বারই ধরা পড়ে গেছে। শ্রী টের পেয়েছে লোকটা তার দিকে তাকিয়ে থাকে। ইস, কি যে বিপদে পড়ে গেল!

তুই এখনও বসে আছিস?

অনীষ চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে বলল, বলে আয় আমার জ্বর হয়েছে।

এটা তোমার কামজ্বর। বাঙ্গাল আর কাকে বলে! কত ভাগ্য তোর। জানিস শ্রী ভর্তির দিন গাড়ি হাঁকিয়ে এসেছিল কলকাতা থেকে। শঙ্করদা সব করেছে ওর হয়ে। রাজনন্দিনী জানিস! ওর দাদারা কি এক একজন দেখতে! ফিল্মের হিরো সব। বলেই হাত টেনে অনীষকে তুলে দিল দিলীপ। তারপর প্রায় বলতে গেলে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল ঘর থেকে।

অনীষ মাথা গুঁজে ধীর পায়ে হাঁটছে। কেমন জবুথবু অবস্থা। দূর থেকেই দেখল, শ্রী দাঁড়িয়ে আছে। রোববার, ছুটির দিন। একমাত্র সাফাই-এর ক্লাস বাদে আর কোনো ক্লাস নেই। সে ভেবেছিল, দুপুরে খেয়ে দেয়ে কম্বল গায়ে লম্বা ঘুম। কোথা থেকে যে সব জীবনে উৎপাত শুরু হয়ে যায়! এমন অশুভ দিন যেন জীবনে কখনও তার আসেনি। সে আর মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। কোনো মেয়ের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে তার কখনও অভিযোগ শুনতে হয়নি। জাহাজে যখন যায়, তখন তার বড় কম বয়েস। বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজের চাকরিটা নিয়েছিল। কিন্তু জাহাজে তার দিনগুলি ভাল কাটেনি। এক ঘেয়ে—অনন্ত অসীম সমুদ্র, কখনও ঝড় টাইফুন, অথবা বন্দরের কোলাহল। বন্দরে নেমে কেনাকাটা করেছে, সঙ্গে কেউ না কেউ থাকত। বেশি রাত করত না। তার ভিতরে একটা ভীতু স্বভাব আছে। জাহাজে উঠে মনে হয়েছিল—কবে আবার বাড়ি ফেরা যাবে। কিন্তু সফর এত লম্বা হয়ে গেছিল যে বাড়ি ফিরতে দু-আড়াই বছর হয়ে গেল। বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে ঠিক—কিন্তু নারী সংক্রান্ত কোনো অভিজ্ঞতা তার হয়নি। মেয়েদের সে এড়িয়ে চলত। পাছে কোনো সংক্রামক ব্যাধির সে শিকার হয়, সেই ভয়টাই ছিল প্রবল। বয়স কম থাকলে যা হয়—সুন্দর এক স্বপ্নের জগতে তার বিচরণ করার অভ্যাস। সে যে জাহাজের চাকরিটা নিয়ে পালিয়েছিল, সেও

এক লাবণ্যময়ীর অবজ্ঞার ফল। বাড়ির পাশে তখন নতুন সব ঘরবাড়ি উঠছে। ছিন্নমূল মানুষেরা আসছে। সে তখন সবে মাত্র স্কুল ফাইনাল পাস করেছে। আমবাগান পার হয়ে গেলে রাস্তার মেয়েটিকে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। রোজই কলেজ যাবার পথে দেখা। মেয়েটি দাঁড়িয়ে থাকে। অনীষ কলেজে যায়। সে দাঁড়িয়ে থাকে। জীবনে এক নতুন জগতের উন্মেষ হচ্ছে তখন। অনীষ তাকে দেখতে দেখতে কেমন এক প্রগাঢ় ভালবাসায় পড়ে গেল। সে এক বিকেলে তাকে গোপনে পেয়েও গিয়েছিল। কিন্তু বলতে পারেনি মেয়েটিকে, অনীষ তাকে ভালবাসে। সেই লাবণ্যময়ীর বিয়ে হয়ে গেল। তবে সে কষ্ট পেয়েছে কিন্তু অপমানিত বোধ করেনি। কিন্তু পরে মেয়েটি তার সতীত্ব কত খাঁটি স্বামীর কাছে প্রমাণে অনীষের সম্পর্কে কিছু দুর্নাম ছড়িয়েছিল। কানে সে-সব কথা উঠতেই তার ক রাত ঘুম হল না। মেয়েটিকে সে কোনোদিন ছুঁয়েও দেখেনি। পাশাপাশি বাড়ি, মেলামেশা হত, বোনের সহপাঠিনী, জানলার সেই চোখে সত্যি কি কোন রঙ ছিল না। অপমানে তার মাথার ঘিলুতে পর্যন্ত ঘা হয়ে যায় বোধ হয়। না হলে সে পালিয়ে জাহাজে চলে যাবে কেন। জাহাজে থাকতে থাকতে একসময় সব মাথা থেকে সরে গেল। সে নিরাময় হয়ে উঠল। ভেবেছিল জীবনে আর ও-পথ মাড়াবে না। সে তাকালে কি কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পায়—পলকে মাথার মধ্যে সব খেলে গেলে অনীষ নিজের মধ্যে কেমন আরও গুটিয়ে যায়। একেবারেই জোর পায় না। সামনে শ্রী। দেবদারু গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

পরনে তার হলুদ রঙের শাড়ি। লতাপাতা ফুল-ফল আঁকা। মুখে সামান্য প্রসাধন। কেমন কাছে যেতেই সে শ্রীর সুঘ্রাণ পেল। চাঁপা ফুলের গন্ধ উঠছে শরীর থেকে। কিন্তু কি বলবে সে! কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছে ভাবতেই শ্রী কেমন তার কাছে বিশ্রী হয়ে গেল। সব ভেতরের রোমাঞ্চ অনীষের মুহূর্তে নিভে গেল।

কি করছিলেন? শ্রী খুব সরল চোখে তার দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল।

সে সাহস ফিরে পাচ্ছে। কিন্তু কথা বললে ইতস্ততঃ করছিল। বলছ্যান না হয়ে যায়।

কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। চলুন ক্যান্টিনে।

ক্যান্টিনে কেন এমন ভাবল অনীষ। আরও কাউকে কি সাক্ষী রাখতে চায়! সে বলল, অ্যাখানেই বলুন না।

শ্রী মুচকি হাসল।

হাসছ্যান কেন?

শ্রী এবার হাসল না। সে এসেছিল বলতে, আপনি ম্যালবোর্ন বলবেন না

মেলবোর্ন বলবেন। আমার সঙ্গে হীরা, বন্দনার বেট হয়েছে, আপনাকে নিয়ে। মেলবোর্ন বলে আপনি অন্তত আমার ইজ্জত রক্ষা করুন। তারপরই শ্রী ভাবল, ইজ্জত কথাটা আসে কি করে। মানুষটার এমন সুপুরুষ চেহারা এবং আভিজাত্যের মহিমা কি তবে ম্যালবোর্ন বললে নষ্ট হয়ে যায়! আসলে একজন গ্রাম্য মানুষের কথায় নানারকমের বিদঘুটে ধ্বনি বেজেই উঠতে পারে। পরিচয় সভাতে সেটা আরও অনেকের কথায় ধরা পড়েছে। গণেশ হালদার, কিংবা চণ্ডী সরখেল ধীরেন দেবনাথ, ওরা তো আরও সব বিদ্‌ঘুটে উচ্চারণ করে। তবে তাকে নিয়ে সবাই পড়েছে কেন। আসলে মানুষটার দীর্ঘকায় চেহারা, চোখ বড়, উঁচু নাক এবং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের সঙ্গে সমুদ্রের গল্প অন্য এক ডাইমেনসান তৈরি করেছে মেয়েদের মনে। যেন মানুষটা কোন নির্জন দ্বীপের অধিবাসী। সমুদ্রের সঙ্গে নির্জন দ্বীপের কেমন যেন একটা সম্পর্ক। তার কাছেও মানুষটার স্বভাব কোনো নির্জন দ্বীপে বন্দী একাকী মানুষের মতো মনে হয়েছে। সে বলল, আপনি এত সুন্দর দেখতে কিন্তু কথা বলতে গেলে কেমন যেন হয়ে যান।

অনীষ ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, বাড়ি গেলেন না?

না, ভাল লাগল না।

বোনেরা তো অনেকে বাড়ি গেছে। আপনাদের কি সুবিধা? ইচ্ছে করলে শনিবার চলে যেতে পারেন।

এই তো কি সুন্দরভাবে কথা বলছে। একটু সতর্ক থাকলে মানুষটা সব পারে।

তারপরই শ্রী কেমন করুণ মুখে বলল, আপনি আমাকে একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করুন না!

অনীষের সাহস ফিরে এসেছে। তবে কোনো অভিযোগ নয়। বিপদে পড়েছে শ্রী। ভিতরে একজন হারকিউলিস জেগে উঠছে।

সে বলল, বিপদ! বিপদ কেন হবে আপনার?

খুব বিপদ! আপনিই পারেন।

আমি পারি! মানে আমি! নিজের বুকে আঙুল রেখে কথাটা বলল।

হ্যাঁ, আপনি।

আমার উপর আপনার এত বিশ্বাস জন্মাল কি করে?

কি জানি কেন বিশ্বাস জন্মাল। সব কিছুর কি হেতু খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন আপনি জাহাজে চলে গেছিলেন। নাবিক ছিলেন কিছুদিন। আবার ঘুরে-ফিরে সেই বাড়ি। প্রাইমারি স্কুলে চাকরি। কেন আপনিতো কোনো বন্দরে থেকে যেতে পারতেন?

না, পারতাম না।

জাহাজে চলে যেতে পারেন, কোনো বন্দরে আটকে যেতে পারেন না। কিরে বাবা—আপনি কেমন মানুষ। সব কিছুর হেতু হয় না জানেন!

সেটা ঠিক। হেতুটা আবিষ্কার করতে গেলে মানুষকে মূহ্যমান হয়ে পড়তে হয়। যেমন এখানে এসেই শ্রী তার হেতু হয়ে গেল। সে কি জীবনেও ভেবেছিল, এখানে এসে আবার সে একটা হেতুতে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু বিপদটা কি জানা হল না তো!

আপনার কি বিপদ সেতো বললেন না।

চলুন না ক্যান্টিনে।

না না, ঐ দেখুন জটিলাদা আসছ্যান।

গানের অধ্যাপক জটিলাদার মিউজিক ক্লাস ডাইনিং হলের লাগোয়া হলঘরটায় হয়। তার পাশেই লম্বা দেবদারু গাছ। শীতের সকাল। কুয়াশা সরে গেছে কিছুক্ষণ। সকাল থেকেই একজন না একজন অধ্যাপক অফিসে অথবা কোনো অছিলায় ক্যাম্পাসে ঘুরে যায়। এটা আসলে নজর রাখা। কিছু একটা গোলমাল না করে ফেলে তারা। এই চোখে চোখে রাখা আর কি। বেয়াদপি হয়ে না যায় ভেবে অনীষ বলল, আমি যাই।

বারে, চলে যাবেন? কি বিপদ, কেন বিপদ সেটা শুনবেন না?

জটিলাদা আসছ্যান।

শ্রী আর পারল না। বলল, জটিলাদা আসছেন।

হ্যাঁ, জটিলাদা আসছ্যান।

না, জটিলাদা আসছেন।

অনীষ মুহূর্তে এবার বুঝতে পারল সে উচ্চারণের গোলমালে পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, জটিলাদা আসছেন।

এই তো ঠিক বলছেন। আমিও দেখেছি, আসছেন। তবে আসুক না। আমরাতো খারাপ কিছু করছি না।

এতদিন দিলীপ তার পেছনে লেগেছিল। এখন আবার আর একজন! তাকে নিয়ে সবাই এত বেশি ভাবলে সে যায়টা কোথায়। জটিলাদা মাধবীলতার কুঞ্জটার পাশে দাঁড়িয়ে তাদের চোখ বাঁকা করে এক পলক দেখল। মানুষটার মাথায় কাঁচাপাকা কোঁকড়ান চুল। মধ্যবয়সী। রোগা এবং খিটখিটে মেজাজের। শ্রী পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বলে দেখতে পাচ্ছে না। অনীষ সব দেখতে পাচ্ছে। এ-ভাবে একজন সুন্দর নারীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু সে যে কতদিন শ্রীর সঙ্গে কথা বলবে বলে সুযোগ খুঁজছিল, অস্বস্তিতে পড়ে গেলেও অনীষ কেন জানি নড়তে পারছিল না।

শ্রীর গায়ে আজ সুন্দর সবুজ কার্ডিগান। গলা আঁচল দিয়ে ঢাকা। ঠাণ্ডার ধাত থাকতে পারে। খুব সামলেসুমলে চলার স্বভাব বোধ হয়। কথা শুনতে পাবে ভয়ে দুজনেই চুপচাপ। শ্রী একবার শুধু বলল, গেছে?

এই ঢুকে গেল। কিন্তু বিপদটা কি বলবেন তো!

খুব জরুরী কিছু না। আপনাকে নিয়ে বন্দনা, নীলা, হীরারা খুব মজা করে। আমার ভাল লাগে না।

এমন কথায় অনীষ ভেতরে প্রবল ঝড়ের মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু ভয়, মল্লিকার মতো যদি আবার তাকে দুর্নামের ভাগী করে ফেলে! মল্লিকা নিজে দুর্বলতা প্রকাশ না করলে, সে কিছুতেই এতটা এগোতে সাহস পেত না। জানলায় দাঁড়িয়ে থেকে তোর কি দরকার ছিল আমার কলেজ যাওয়া দেখা। একদিন দু-দিন পরে ফুলুর সঙ্গে এটা সেটা উপলক্ষ্য করে বাড়ি চলে আসা!

কি ভাবছেন! কিছু বলবেন তো!

কি বলব!

ওরা মজা করে। আপনার ভাবতে খারাপ লাগে না!

আমার তো ভালই লাগে। যা হোক আমি একটা ওদের কাছে মজার খোরাক হয়ে গেছি।

আপনার না কিচ্ছু হবে না।

কেন কিছু হবে না? হওয়াটা কি! বেঁচে-বর্তে থাকার মতো বড় কি আছে!

কি কথা রে বাবা! শ্রী বলল, তাই বলে মান অপমান বোধ থাকবে না! শ্রীর চোখমুখে এমন কথায় কেমন হতাশা ফুটে উঠছে।

অনীষ বলল, আমাকে কি করতে হবে?

ওদের সামনে কথাবার্তায় প্লিজ সতর্ক থাকবেন। আপনি ইচ্ছে করলেই পারবেন। আমি বলেছি, আসলে আপনিই ওদের সঙ্গে মজা করেন। আপনি বোনেদের সঙ্গে মজা করার জন্যই জুতু, জুতির্ময়, ম্যালবোর্ন বলেন। কি সতর্ক থাকবেন তো! বলুন না!

না থাকলে কি হবে?

আমি বেটে হেরে যাব। আমি বলেছি, ওকে আমি চিনি। পরিচয় আছে। ও কখনও ও-ভাবে কথা বলে না। মজা করার জন্য ও-ভাবে কথা বলে। আপনি সতর্ক না থাকলে, সত্যি আমি খুব ছোট হয়ে যাব।

তারপর শ্রী চোখ তুলে তাকিয়ে অনীষকে দেখল।

অনীষের কেন জানি মনে হল, সে সত্যি অগাধ জলে পড়ে গেছে। সাঁতার জানে না। পাড়ে ওঠার ক্ষমতা তার নেই, শ্রী সেটা বোধ হয় জানে না। তবু

বলল, আমি চেষ্টা করব।

দিলীপ ক'দিন থেকেই লক্ষ্য করল, অনীষ কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। কথাবার্তা কম বলে। শ্রী তাকে কেন ডেকেছিল, কিছুই জানতে পারছে না। বললেই এক জবাব, ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবে না। এতদিন তো কোনো ব্যক্তিগত বিষয় ছিল না অনীষের। হঠাৎ শ্রীর সঙ্গে কথা বলার পর কি এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল যে খুবই গোপনীয় পর্যায়ে পড়ে। মল্লিকা নামে একটি মেয়ের কাছে ল্যাং খেয়ে জাহাজে চলে গেছিল, সে তো তা জানে। অবশ্য অনেক পরে। বাড়ি থেকে ফেরার অনীষ। ওর বাবা ছাতা বগলে তাদের কোয়ার্টারে আসতেন। আর বলতেন, তোমাকে কিছু বলে গেছে? বাড়িতে শুধু একখানা চিঠি রেখে গেছিল অনীষ। বালিশের তলায় পাওয়া গেছে। অনীষ লিখে গেছিল, আমার কিছু ভাল লাগছে না। চলে যাচ্ছি। একটা কিছু আমাকে করতে হবে। কিছু একটা করতে পারলেই চিঠি দেব। আমার জন্য তোমরা অযথা চিন্তা করবে না।

কোয়ার্টারের পাশে তাদের একটা কদম গাছ আছে। মেসোমশাই তার নিচে এসে দাঁড়াতেন। কিছুতেই ভিতরে নিয়ে যাওয়া যেত না। বললেই এক জবাব, না বাবা, গাছের ছায়ায় বেশ আছি। কি যে দুর্মতি হল ছেলেটার। পরীক্ষা না দিয়েই চলে গেলি! তোমাকে কোনো চিঠি দিয়েছে?

এমন নিরুপায় মানুষের মুখ দিলীপ জীবনেও প্রত্যক্ষ করেনি। পরনে খাটো ধুতি। পায়ে টায়ারের স্যান্ডেল। বড় আশা ছিল ছেলেকে নিয়ে। সেই ছেলেই নিরুদ্দেশ। অনীষের মা বাবা তখন খুব ভেঙে পড়েছিল। দিলীপের মনে হত তখন অনীষটা অমানুষ। এত কষ্ট করে বাবা পড়াচ্ছে, তার তুই মর্যাদা দিলি না। পরীক্ষার মুখে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেলি। মেসোমশাইকে সে বলেছিল, আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না। আমি চিঠি পেলেই আপনাকে খবর দেব।

দিও বাবা। তুমি ওর সবচেয়ে কাছের লোক।

অনীষরা বাঙ্গাল। ওর বাবার কথাবার্তা আরও বিদঘুটে। তবু কেন জানি মনে হত অনীষের বাবা এ-ভাবে কথা না বললে, মানুষটার মহত্ব যেন কোথায় ছোট হয়ে যেত। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের যা যা স্বভাব, অনীষের বাবার মধ্যেও তা আছে। তাদের বাড়িতে সে তাঁকে এক গ্লাস জল পর্যন্ত খাওয়াতে পারেনি। আর অনীষ একেবারে যেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। নইলে জাহাজে সে যেতে পারত না। খাওয়া-দাওয়ার আচার নিয়ম নেই। মুসলমান কুক জাহাজে। খাবার মেনুতে বিফ—এসব অনীষ ফিরে এসে তাকে বলেছিল।

তুই বিফ খেতিস?

অনীষ বলত, সমুদ্রে গেলে কিছু মনে থাকে না। সব সংস্কার কেমন ধুয়ে মুছে যায়। তবে খেতাম না। বাবা জানলে কষ্ট পাবেন—এইসব ভেবে আর কি-তারপরই ছিল তার হাহাকার হাসি। বলত, জানিস জীবনটা কত বড়, পৃথিবীটা কত বড়, সমুদ্রে না গেলে টের পাওয়া যায় না। যেন নিরবধিকাল আমি একই জাহাজে আছি। সমুদ্র পার হয়ে যাচ্ছি। জ্যোৎস্না রাতে চিত হয়ে ডেকে শুয়ে থাকতাম। জাহাজটা ফুলছে, আর নীল ধূসর বর্ণের এক পরিমণ্ডলে আমাকে গ্রাস করছে। দূরে কোনো নির্জন দ্বীপে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে টের পেতাম। দ্বীপের মতো আমার মধ্যেও তখন অজস্র ঢেউ এসে আছড়ে পড়ত। ভেতরের সব অন্ধকার ধুয়েমুছে দিত।

সমুদ্র থেকে সত্যি অন্য মানুষ হয়ে ফিরে এসেছিল অনীষ। এমনিতেই অনীষ সুপুরুষ, তার উপর সমুদ্রের হাওয়া লেগে শরীরে তার আশ্চর্য সুষমা। অনীষ সমুদ্রের সব বিস্ময়কর গল্প বলত তাকে। সে কেমন মুগ্ধ হয়ে শুনত। তারপর একদিন বলেছিল, এগুলো লেখ না। দেখবি তোর খুব নাম হবে।

ধুস, তুই যে কি না!

দিলীপ তবু পেছনে লেগে, দুটো একটা লেখা আদায় করে নিয়েছে। দিলীপের এখানেই একটা বড় রকমের গর্ব আছে। কারণ তার ধারণা, সেই প্রথম অনীষকে আবিষ্কার করে। অনীষ শেষ-পর্যন্ত কত দূরে যাবে-কে জানে!

আর সেই হারামজাদা এখন এমন গুম মেরে আছে যে কথা বলতে পর্যন্ত ভয় হয়। এখনই একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। শ্রী যদি কিছু বিরূপ কথাবার্তা বলে থাকে তাকে—শ্রীর সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। কি জানি আবার যদি এখান থেকেই ফেরার হয়, তবে সে তার মা বাবার কাছে মুখ দেখাবে কি করে! সে তো এখানে অনীষকে নিয়ে এসেছে।

দিলীপ দেখলে, অনীষ ঘরে নেই, বারান্দায় নেই। এখন তো কোনো ক্লাসও নেই। গেল কোথায়?

বাইরে সে বের হয়ে গোকুলদার ঘরে গেল। নেই। চণ্ডীদের ঘরে নেই। একই সঙ্গে তো ক্লাস থেকে ফিরে এল। সে আজকাল ক্লাসেও কথা বলছে না। ক্যান্টিনে নিয়ে যাওয়া যায় না। বাইরে বের হতে চায় না। কথা বলতে যেন ভুলে গেছে।

রবীন্দ্র ভবন পার হয়ে মাঠের মধ্যে একটা কামিনী ফুলের গাছ। ঐ তো তার নিচে অনীষ আর শ্রী। সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন পুলক বোধ করল—তবে বেটা পালিয়ে পালিয়ে আবার প্রেম করছিস! তো কি হবে! তুই যে আবার একটা ল্যাং খাবি।

শ্রী তখন গাছের নিচে অনীষকে ধমকাচ্ছিল।—আপনি বোবা না কালা!

বোবা কালা হতে যাব কেন।

তবে কথা বলেন না কেন। সবাই বলছে, অনীষ ভাই-এর সব বন্ধ হয়ে গেছে।

সবাই কারা?

সবাই কারা জানেন না! বন্দনা হীরা অঞ্জলি। আমি ওদের ডেকে আনছি। আপনি ক্যান্টিনে আসুন। কথা বলে প্রমাণ করে দিন—আপনার কথা বন্ধ হয়ে যায়নি। এ কি রে বাবা, কথা বলছে না! আমি কি কিছু খারাপ বলেছি আপনাকে। আপনি একেবারে কথা বন্ধ করে দিলেন! আপনার ভালর জন্য বলেছি। আপনার সম্মানরক্ষার জন্য বলেছি। সে দিন থেকে কি হল আপনার! ডাকলে পর্যন্ত সাড়া দেন না। এড়িয়ে যান আমাকে! কি করেছি আমি! বন্দনা বলল, কেউ ওর মুখ টাইট করে দিয়েছে। আর জুতু জুতির্ময় শোনা যায় না। ওফ্ এমন মজাটা কে মাটি করল! তাকে খুঁজে বের কর।

ঠিক আছে, আমি না বললেই তো হল!

কি না বললেইতো হল!

এই যে আপনিই আমাকে সতর্ক থাকতে বলে গেলেন না, সেই থেকে মনে মনে নিজেকে তৈরি করছি। এখনতো নিজের সঙ্গেই আমার সব কথাবার্তা। নতুন পড়ুয়ার মতো। বলছ্যান, না বলছেন। আসছ্যান, না আসছেন। নিজের ভিতর মশগুল হয়ে আছি আমি। আপনি যে সতর্ক করে দিয়েছেন, কাউকে বলতে যাচ্ছি না। কাউকে বলিও নি। দিলীপ রোজ বলছে, তোর কি হয়েছে। দশটা কথা বললে, একটা কথার সাড়া দিস।

ঠিক আছে-ও-সব শুনছি না। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। ক্যান্টিনে বন্দনা হীরা অঞ্জলী বসে আছে।

অনীষ সত্যি ভারি বিপদে পড়ে গেল। শ্রীর কথাবার্তায় এক ধরনের আন্তরিকতা আছে, যা সহজে অবহেলা করা যায় না। সে শুধু নিজেই বিব্রত হচ্ছে না, আরও কেউ কেউ তার সঙ্গে বিব্রত বোধ করছে। এটা ভাবতেই শ্রীর প্রতি তার ফের অনুরাগ জন্মাল। বলল, যান। যাচ্ছি।

শ্রী গায়ে ভাল করে চাদর জড়িয়ে রেখেছে। খোঁপা-বাঁধা। গলায় সরু হার। হাতে দু-গাছা করে সোনার চুড়ি। সিল্কের শাড়ি পরনে। পায়ে নীল স্ট্র্যাপ দেওয়া স্যান্ডেল। আলতা পরেছে শ্রী, পা-দুখানি সবুজ ঘাসে ডুবে আছে।

বিকেলের মনোরম আলোয় যেন শ্রী তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দু-পাশে সব মৌসুমি ফুলের চাষ হবে বলে বেড তৈরি করছে মালীরা। পাতাবাহারের গাছ সারি সারি। ভিতরে রঙবেরঙের গোলাপ, ডালিয়া ক্রিসেন্থিমাম। একটা প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছিল। কোন ফুলে বসবে ঠিক করতে পারছে না।

সে ভিতরে ঢুকতেই দেখল, বন্দনা হীরা চিরকূটে কি লিখছে। তাকে দেখেই

সেগুলি জড় করে ফেলল হীরা। অঞ্জলী উঠে বলল, আপনি এখানটায় বসুন। আমি আর একটা আনছি। একপাশে দেয়ালে টিনের চেয়ার সাজানো। অঞ্জলি সেখান থেকে একটা নিয়ে এসে বসল।

সবারই কেমন একটা বিহ্বল ভাব লক্ষ্য করল অনীষ। সে যে সত্যি আসবে, তারা হয়ত ভাবতে পারেনি। শ্রী তাকে নিয়ে আসতে পারবে মজা দেখার জন্য, সেটা তারা বিশ্বাস করতে পারেনি। অনীষ বলল, দেখি চিরকূটে কি লিখেছেন? সে খুব স্বাভাবিক কথাবার্তায় প্রমাণ করতে চাইল।

শ্রী কেমন এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে ছিল। কিন্তু উচ্চারণে কোথাও গোলমাল না হওয়ায় সে কিছুটা বোধহয় হাল্কা বোধ করছে। বলল, দেখা না।

বন্দনা বলল, ও কিছু না। লটারি করছি।

কিসের লটারি?

শ্রীর চোখ মুখ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কোথাও গোলমাল নেই।

কে খাওয়াবে-আমরা লটারি করে ঠিক করে নি।

বেশ, ভারি সুন্দর ব্যবস্থা তো। আজ না হয় আমি খাওয়াচ্ছি।

শ্রী হঠাৎ বাধা দিয়ে বলল, সে কি করে হবে আপনি কি ডেকে এনেছেন যে খাওয়াবেন? আমরা আপনাকে ডেকেছি। বন্দনার দিকে তাকিয়ে বলল, আজ না হয় আমাদের লটারি থাক। আমিই সবাইকে খাওয়াচ্ছি।

কার অনারে খাওয়াচ্ছিস? অঞ্জলি অনীষকে আড়চোখে দেখে কথাটা বলল।

কার অনারে আবার। আমার ইচ্ছে হল খাওয়াতে। তাই খাওয়াচ্ছি।

বন্দনা বলল, না ভাই, মিছে কথা বলিস না। তুই অনীষ ভাইয়ের অনারে খাওয়াচ্ছিস।

হীরা বাধা দিয়ে বলল, আপনি রোজ রোজ আসুন না। আমাদের তবে টিফিনের খরচাটা বেঁচে যায়। যা কিপ্টে শ্রী না!

বন্দনা বলল, এটা তুই মিছে কথা বলছিস হীরা। ওই তো রোজ বিল দিত বলে আমরা শেষে লটারি করে নিলাম।

অনীষ বলল, ভাল করে....তারপর সত্যি জিভ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। কোনরকমের সামাল দিয়ে অনীষ শেষে বলল—করেছেন।

শ্রীর দম আটকে যাচ্ছিল। সেটা ফস করে বের হয়ে এল। বাঁচা গেল।

অনীষ দেখছে এরা তিনজনই বেশ তরলমতি। উজ্জ্বল, হাসিখুশি। সবারই পরনে সুন্দর রঙ-বেরঙের শাড়ি। অঞ্জলি হীরার দু বেণী বাঁধা চুল। বন্দনার রঙ চাঁপা ফুলের মতো। ঠোঁটের নিচে বড় একটা তিল আছে। দিলীপ বলেছে ঠোঁটের নিচে তিল থাকলে মেয়েরা কামুক হয়। বন্দনার ববছাঁট চুল। ঘাড় গলা ভারি

মসৃণ। শ্রীর সামনে দাঁড়ালে তার শরীর খুঁটিয়ে দেখার স্পৃহা হয় না। কেমন এক জননীর মতো আশ্চর্য মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শ্রী যখন কাউন্টারে অর্ডার দিতে গেল তখন কেন জানি বন্দনার স্তনের দিকে চোখ গেল তার। তারপরই মনে হল, তিনজনই তিন দিকে তাকিয়ে আছে। সে বন্দনার স্তন চুরি করে দেখেছে, এরা টের পায়নিতো! কি যে মুশকিল—এই একটা প্রলোভনে তার বারবার মরণ হয় কেন। সে ভাবল, আর কারো স্তনের দিকে চোখ দেবে না। শ্রী জানলে কি না আবার ভাবে।

তখনই অঞ্জলির প্রশ্ন সত্যি সমুদ্রে বিষাক্ত পাখি আছে?

অনীষ বলল, জানি না তো!

তখন শ্রী কাউন্টারের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে। বিকেলের রোদ এসে ওর মুখে পড়েছে। স্কাই-লাইটের ভিতর দিয়েও কেমন লাল রশ্মি ঘরটাকে মায়াবি করে রেখেছে। টেবিলে টেবিলে মেয়েরা গোল হয়ে বসে। ছেলেরা গোল হয়ে বসে কেমন অনীষই একমাত্র ছেলে যে মেয়েদের টেবিলে বসে আছে। কেউ কেউ যাবার সময় বলল, অনীষ ভাই বোনেদের ঘাড় মটকাচ্ছ। বেশ আছ ভাই, আসলে যেন এরা বলে গেল সুপুরুষ মানুষেরই এই ভাগ্য। তোমাকে নিয়ে বোনেরা যা করবে না! দিলীপও এমন কথাই বলবে, তোর বেটা লজ্জা হয় না। তোকে নিয়ে রসিকতা করে জেনেও ওদের টেবিলে, ওদের পয়সায় খেলি!

সে এ-জন্য কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে আছে। দিলীপ আসার আগেই কেটে পড়া দরকার। তবে সে না থাকলে দিলীপ একা আসে না। ঠিক ওর জন্য হয়ত বসে আছে।

ওরা তিনজন একে অপরকে দেখছিল।

জানি নাতো মানে! পরিচয় সভায় বললেন, আপনাদের জাহাজে বিষাক্ত পাখি উড়ে এসেছিল। আপনারা কেবিন থেকে কেউ বের হতে পারছেন না। বের হলেই পাখিগুলো আপনাদের মাথায় হেগে মুতে দিচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে ফোসকা শরীরে। দগদগে ঘা।

অনীষ বলল, সব বানান।

তালে জাহাজে যাওয়াটাও বানানো। কেমন হতাশ গলায় বলল হীরা আরও হতাশ, কোন কথার জন্যে জুতো জুতির্ময় নেই। সাফ কথা।

হঠাৎ হীরা ক্ষেপে গিয়ে বলল, আপনি সবাইকে বোকা বানাতে চান। আমরা সব বুঝি!

শ্রী যতটা দ্রুত সম্ভব টেবিলে ফিরে এসেছে। কারণ ভয়, কখন না আবার গাড়ি বে-লাইনে চলে যায়। টেবিলে এসেও স্বস্তি পাচ্ছিল না। কিন্তু হীরা অঞ্জলি

বন্দনার মুখ দেখে টের পেল, না, গাড়ি ঠিক লাইনেই চলছে। শ্রীকে দেখে বন্দনা বলল, জানিস সব নাকি বানিয়ে বলেছে।

কি বানিয়ে বলল হাতের বটুয়াটা টেবিলে রেখে চিবুকে হাত রাখল শ্রী।

সেই বিষাক্ত পাখি টাখি। ধাপ্পা। আপনি মশাই ভীষণ খারাপ মানুষ। এমন করে বললেন যে আমরা সবাই বিশ্বাস করে গেলাম।

অনীষ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। শ্রী তার পাশে বসে আছে। শ্রী সামনে বসলে পারত। মাঝে মাঝে ওর মুখ দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু শ্রী এই ঘরে এসে একবারও তার দিকে তাকায়নি। যেন তাকালেই সে সবার কাছে ধরা পড়ে যাবে।

বন্দনা আবার জেরা শুরু করল, বলল, জাহাজে যাননি, অথচ পরিচয় সভায় মিছে বলে দিলেন। মুখ আটকাল না!

জাহাজে যাইনি বলিনি তো।

জাহাজে গেছেন তবে!

হ্যাঁ, গেছি।

কতদিন ছিলেন?

অনেক দিন। বছর আড়াই।

কোথায় কোথায় গেছেন?

অনেক জায়গায়। সারা পৃথিবী বলতে পারেন।

কি করতেন? সেলর ছিলেন শুনেছি।

ঠিকই শুনেছেন।

শ্রী কোন কথা বলছে না। কারণ শ্রী কথা দিয়ে এসেছে, সে কোন কথা বলবে না। এমন সুন্দর মানুষের মুখে বিদ্ঘুটে উচ্চারণ মানায় না। বাঙাল স্বভাব লটকে রাখলে ইজ্জতও বাড়ে না। ইজ্জত নিয়ে যখন প্রশ্ন, তখন বন্দনারাই কথা বলুক। টের পাক, আসলে মজাই করেছে তাদের নিয়ে।

বন্দনা বুঝল, হবে না। লাইন পাল্টাতে হবে। না হলে খাঁচায় পাখি ধরা দেবে না।

হীরা বলল, সমুদ্রে তিমি মাছ দেখেছেন?

না।

বন্দনা বলল, সমুদ্রে এত ঘুরেছেন, তিমি মাছ দেখেন নি?

ওরা দেখা করতে আসে নি। কি করব বলুন!

শ্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, তোর কেমন আত্মীয় অনীষ ভাই!

আমার মাসিমার ভাসুরপো। শ্রী অনায়াসে মিছে কথা বলে ফেলল। মুখে

আটকাল না।

খাবার এলে দেখল অনীষ, ওমলেট, দু পিস পাঁউরুটি, দুটো সন্দেশ। সে খেতে থাকল। হীরা বন্দনা ভাবল, অনীষ তাহলে সত্যি এতদিন মজা করেছে।

বাইরে বের হয়ে আসার সময় শ্রী বলল, ইস্, কি অন্ধকার!

সত্যি অনেকক্ষণ তারা বসেছিল। রাস্তার আলোগুলো কেন জানি জ্বলছে না। শ্রীর ব্যাগ থেকে আবার রাস্তায় পয়সা পড়ে গেল। অন্ধকারে উবু হয়ে অনীষ বন্দনা খুঁজছে। কিন্তু পাওয়া গেল না।

অনীষ বলল, টর্চ আছে আপনাদের? ফুকাস মেরে দেখতাম।

ফুকাস! ইস্ সব গেল! শ্রী, জিভ কামড় দিয়ে বসে পড়তে গিয়ে ভাবল, এর চেয়ে তার মরণ হল না কেন! তীরে এসে তরী ডোবাল! রাগে তার শরীর থরথর করে কাঁপছে। মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপবার জন্য দৌড়ে পালাচ্ছে বন্দনা হীরা অঞ্জলি।

শ্রী ক্ষেপে গিয়ে বলল, আপনার লজ্জা হয় না ফুকাস বলতে?

শ্রী মুখে ফুকাস শুনে সেও কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেল। কেমন অপরাধীর গলায় বলল, আমি ফুকাস বলেছি!

যেন বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, হ্যাঁ সেলুকাস, এর আগে আমার মরণ হল না কেন! এই আপনার কথা ছিল! রাস্তায় নেমেই ভুলে গেলেন সব। ওরা আমাকে কি ক্ষ্যাপাবে বলুন তো। বলেই কেমন ধরা গলায় কথা বলতে বলতে শ্রীও ছুটে পালাল।

অনীষ অন্ধকারে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকল। তার মাথায় কিছু আসছে না।

পরদিন সকালে হিস্ট্রি অফ এডুকেশনের ক্লাসে দেখল, শ্রী আসেনি। শ্রী সাধারণত ক্লাস কামাই করে না। এই প্রথম দেখল, ক্লাসে সে নেই। অনীষের ভারি খারাপ লাগল। তার সঙ্গে কোনো মেয়েই আজ পর্যন্ত এমন অন্তরঙ্গ কথাবার্তা বলেনি। সে ছোট হয়ে গেলে কোনো মেয়ে কষ্ট পায়, এটা সে জীবনে প্রথম টের পেল। দিলীপকে সে অগ্রাহ্য করে আসছে। দিলীপ কত বার সতর্ক করে দিয়েছে, একটু সামলে কথা বল। ইচ্ছা করলে সব পারিস। সে ছোট হয়ে গেলে দিলীপও ছোট হয়ে যায়।

দেখল হীরা অঞ্জলি বন্দনা সামনে বসে আছে। ওরা আগে শতরঞ্জের উপর বসে আছে। ওদের পেছনটা শুধু দেখা যাচ্ছে। আজ সুজয়দার ক্লাস। প্রৌঢ় মানুষ। মোটা এবং বেঁটে। তিনি দাঁড়িয়ে ক্লাস নিচ্ছেন। মোটা মোটা সব বই টেবিলের উপর। রেফারেন্সের জন্য সঙ্গে নিয়ে আসেন। মাথায় বেশ বড় টাক। মাঝে মাঝে পেটে হাত বোলাবার স্বভাব। তিনিও বাঙ্গাল। তাঁর কথাবার্তায়ও টান আছে।

উচ্চারণে গোলমাল আছে। লক্ষ্য করলে এটা সব গাঁয়ের মানুষদের মধ্যেই পাওয়া যায়। শ্রী যে এল না কেন! দিলীপ নোট নিচ্ছে। সে নোট এমনিতেই নেয় না। কারণ দিলীপ নিলেই তার নেওয়া হয়ে যায়। কিন্তু সে তো একদম ক্লাসে মনোযোগ দিত পারছে না। শ্রী কি করছে! ক্লাস শেষ হলে একবার জিজ্ঞেস করলে হয়, কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। আরও ফাঁদে পড়ে যাওয়া। এতদিন ম্যালবোর্ন ছিল, এখন সে ফুকাস হয়ে গেছে।

না, সারাদিন আর সে শ্রীকে দেখতে পেল না। কিছুই ভাল লাগছে না। খেতে গিয়ে দেখল, শ্রী নেই। সন্ধ্যায় ক্যান্টিনে গিয়ে বসে থাকল, শ্রী যদি আসে। মুখ ফুটে যে বলবে, তারও উপায় নেই। শ্রীকে নিয়ে তো তার কোনো ভাবনা হবার কথা নয়। ভাবনা দেখা দিলে দশ কান হতে কতক্ষণ। এমন কি দিলীপকেও সে কিছু বলেনি। বললেই যেন ভারি দুর্বলতা প্রকাশ পাবে।

সন্ধ্যায় ক্যান্টিনে সে চুপচাপ বসে থাকল। দিলীপ চায়ের অর্ডার দিয়েছে। পেয়ালা পিরিচের শব্দ। নীল রঙের আলো। নীল রঙের ডুম জ্বলছে। সবাই-এর মুখগুলি এই আলোতে কেমন অপরিচিত ঠেকে। দিলীপ বলল, কি কেবল চামচে দিয়ে চা-টা নাড়ছিস। চা তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

চা খেয়ে অনীষ বলল, আমি একটু ঘুরে আসছি।

কোথায় যাবি?

এই আসছি। তুই যা না।

কলেজ ক্যাম্পাসের একেবারে শেষ দিকে মেয়েদের হোস্টেল। সঙ্গীত ভবন পার হয়ে যেতে হয়। কে জি স্কুলের পাশ দিয়ে রাস্তাটা গেছে। সে এদিক ওদিক তাকাল। যদি দাদারা আবার দেখে ফেলে! তুমি কেন বাবা মেয়েদের হোস্টেলের দিকে হাঁটছ। ভাল লক্ষণ না। এতে তোমার কিউমিলেটিভ রেকর্ড বারটা বাজতে পারে। কিন্তু হোস্টেলের কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল। সোজা চারুদি থাকেন। আর একটায় তারাদি। যে কেউ ইচ্ছা করলেই গোপনে হোস্টেলের গেট পর্যন্ত চলে যেতে পারে না। একটা বড় আমগাছ রাস্তায়। তার অন্ধকারে সে দাঁড়িয়ে। প্রায় কপালে তার ঘাম দেখা দিয়েছে। কিন্তু ফিরে যেতেও পারছে না। শুধু খবরটা নেবে। সুচিস্মিতা যাচ্ছিল। তাকে ডেকে বলল, স্মিতা বোন, একবার শ্রী বোনকে খবর দেবেন?

স্মিতা দেখল, সেই ছিমছাম ছেলেটি। এক মাথা চুল। গায়ে খদ্দরের আলোয়ান জড়িয়ে গাছের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রী এল বেশ কিছুক্ষণ পর। আলোতে দেখল, শ্রীর মুখ ভারি, গম্ভীর।

অনীষ কেমন দুর্বল গলায় বলল, ক্লাসে গেলেন না!

শরীরটা ভাল নেই। বেশ রুক্ষ মেজাজ। সে আসায় কি শ্রী আরও ক্ষেপে যাচ্ছে! কোনরকমে বলল, ওটা তো ফোকাস হবে, তাই না?

অনীষ ভুল শোধরাবার জন্য নিজেই চলে এসেছে! তার কেমন খারাপ লাগল ভেবে অনীষকে সেও এক ধরনের টর্চার করছে।

অনীষ বলল, আপনার কি হয়েছে!

ও কিছু না। কাল ঠিক হয়ে যাবে আবার।

আমার যে কি খারাপ লাগছিল—আপনি আমার জন্য ছোট হয়ে গেলেন। কিছুতেই না এসে থাকতে পারলাম না।

এমন কথায় শ্রীর চোখ সহসা জলে ভার হয়ে গেল। তাহলে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনীষও কম কষ্ট পায়নি। শ্রী বলল, ঠিক আছে এখন যান। কে আবার দেখে ফেলবে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছি। কাল ক্লাসে যাচ্ছি।

অনীষের মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। বলল, তাহলে বলুন আমার উপর আপনার আর রাগ নেই?

রাগ নেই রে বাবা। বললাম তো রাগ নেই। কি হল!

আসলে কি জানেন, দেশ ছেড়ে এখনও আমরা ঠিক থিতু হয়ে বসতে পারিনি। ওটা হলেই দেখবেন এক সময় আমাদের সব ঠিক হয়ে যাবে।

থিতু কথাটা শ্রীকে সারারাত ভাবাল। শ্রী সারারাত ঘুমাতে পারল না।

অধ্যাপকদের কোয়ার্টারগুলো কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে। অনেকটা জায়গা জুড়ে এক তলা বাড়ি। সামনে লন। চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া। নতুন রঙ করা। হলুদ-সাদা রঙে বাড়িগুলির কেমন আলাদা চাকচিক্য। লনের পাশে বাগান করার জায়গা। ফুলগাছের পরিচর্যা যে একটু বেশি মাত্রায় হয়ে থাকে এই এলাকায় ঢুকলেই বোঝা যায়। বড়দার কোয়ার্টারটি আলাদা ডিজাইনের। কেমন বিদেশী ঢংয়ের। পরের কোয়ার্টারটি শংকর চ্যাটার্জীর। মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক। রাস্তা থেকে শান বাঁধানো ফুট ছয়েক চওড়া রাস্তা বাগানের ভিতর দিয়ে ঝুল বারান্দায় নিচে গিয়ে থেমেছে। মোজেইক করা ফ্লোর। নীল রঙের বেতের চেয়ার সাজানো। টেবিল এবং বাতিদান রাখার ব্যবস্থা। একা মানুষ। শ্রীকে ইতিমধ্যে কবারই বলেছেন, কৈ এলে না তো! শংকরদা বৌদির দাদার শ্যালক। দাদার বিয়ের সময় সে ফ্রক পরত। শংকরদা বিয়েতে বরযাত্রী এসেছিলেন। তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করেছে। তখন শংকরদার আমেরিকা যাবার কথা। সেই সুবাদে ঠাট্টা তামাসা করার অধিকার একটু বেশি মাত্রাতেই পেয়ে বসেছিল তাকে। উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের শংকরদার দাম অনেক। সে দেখেছিল, বৌদিরও শংকরদাকে নিয়ে একটা গর্ব আছে। তার

সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য বাড়ি থেকেই বেশ একটা আগ্রহ আছে। বাবা শংকরদার কথা উঠলে থামতে জানতেন না। অনর্গল প্রশংসা।

শংকরদার সঙ্গে এমন এক বয়সে আলাপ যখন তার নিজের কোন পছন্দ অপছন্দ গড়ে ওঠেনি। তখন স্বপ্নের ভেতর তার ডুবে আছে সব পছন্দ অপছন্দ। সেই অবস্থায় কেউ তাকে একাকী পেয়ে যদি পেছন থেকে সাপ্টে ধরে তখন সে করে কি! আবদ্ধ পাখির মতো শুধু ডানা ঝাপটেছে। তারপর ছুটে গিয়ে সাপের মতো ফুঁসেছে। কোয়ার্টারটা দূর থেকে দেখেই এ-সব মনে হচ্ছিল তার। সঙ্গে বন্দনা আছে। বন্দনাকে বলল, তুই আগে যা।

বন্দনার খুব উৎসাহ। অধ্যাপকদের তোয়াজ না করলে ভাল রেজাল্ট করা যাবে না। দুদিন বন্দনার সামনেই বলেছে, কৈ এলে না তো! বন্দনা বিকেলে ধরেছে চল। গেলে যদি খুশি হয়, যেতে দোষ কি। বাড়ি থেকে চিঠি এলেও সেই এক কথা, কিছু অসুবিধা হলে শংকরকে বলবে। সে আমাদের নিজেদের লোক। বাইরে আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য দরকার। বাবা কি চান সে বোঝে। বাবা ডাক্তার মানুষ। পসার খুব। এবং কলেজে অধ্যাপনা করেন, না করলেও তার গাড়ি বাড়ির খরচের ব্যাপারে অসুবিধা থাকার কথা না। দাদারা প্রবাসে। ছোড়দা খড়্গপুর আই আই টিতে। একমাত্র ছোট মেয়েটিকে নিয়েই তিনি চিন্তিত। ডাক্তারি পড়ানো গেল না। ভর্তি করে দিয়েছিলেন নীলরতনে। ডিসেকসান রুমে ঢুকে সেই যে ভিরমি খেয়েছিল, সেটা যেন এখনও ভাল করে সারেনি। কেবল ওক্ উঠত। বাবা বলেছিলেন, এত ভীতু তুমি শ্রী। ছিঃ! তুমি আমার মেয়ে হয়ে শেষ পর্যন্ত! শ্রীর তখন কি করুণ মুখ! সে বোঝাবে কি করে, সেই লাশকাটা ঘরে ঢুকতেই তার মনে হয়েছিল—কে যেন তাকে পেছন থেকে সাপ্টে ধরেছে। সে ভয়ে ভিরমি খায়নি। আট দশটা লাশ—এরা যেন প্রত্যেকে সেই নিষ্ঠুরতার প্রতীক। তার ঘৃণা, হয়তো ভয়ও হবে—সে যাই হোক, চোখে মুখে জল দেবার পরও তার ওক ভাবটা যায়নি। পরে কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল।

আরে এস এস। শংকরদা বেল টিপতেই দরজা খুলে দিলেন হাঁ করে। শ্রীর মনে হল সেই এক ত্রাসের মধ্যে না আবার পড়ে যায়—সে খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল। বলল, ভারি সুন্দর আপনার কোয়ার্টারটা। বন্দনা বলল, শ্রী তো আসতেই চায় না। জোর করে ধরে নিয়ে এলাম।

ভাল করেছ। বোস।

শ্রী দেখল, বসার ঘরটা বেশ সাজিয়েছে শংকরদা। কাজের আলমারিতে ঝকঝকে বাঁধানো সব বই। কোণের একটা ছোট্ট সানমাইকার টেবিলে শংকরদার ফটো—কোনো বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে। উদাস চোখমুখ।

ছবিটা আমার মিয়ামি বিচে তোলা।

এই এক স্বভাব মানুষটার। নিজের কৃতিত্বের কথা বার বার না বলতে পারলে আরাম পায় না। অন্যেরও যে কিছু বলার থাকে মানুষটা বোঝে না। এই যে সে এসেছে বন্দনাকে নিয়ে, বন্দনার খবর নেওয়া দরকার, সুবিধা অসুবিধার কথা জানার দরকার—ক্লাসে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, খাওয়া-দাওয়া, কিংবা কি রকম লাগছে জায়গাটা—কত কথাই তো বলা যায়। না, আরম্ভ হয়ে গেল—মিয়ামি বিচ দিয়ে।

মিয়ামি বিচ দিয়ে শুরু করতেই ভিতরে শ্রীর কেমন গা গোলাচ্ছিল। যেন এই মিয়ামি বিচ মানুষটার সব কিছু অধিকারের পাসপোর্ট। অজগরের মতো সাপ্টে একমাত্র মিয়ামি বিচের লোকেরাই ধরতে পারে। কিন্তু বন্দনাকে ফেলে ওঠা যায় না। শংকরদার সঙ্গে বন্দনার দরকারী কাজ আছে। বন্দনাকে শিক্ষা পদ্ধতির উপর দুটো রেফারেন্স বই দেবার কথা। ও দুটোর জন্যই বন্দনা এসেছে। একজন ব্যাচেলর অধ্যাপকের কোয়ার্টারে একা আসে কি করে বন্দনা! তাই সঙ্গে তাকে নিয়ে আসা। কিন্তু শ্রীর শরীর গুলিয়ে উঠতেই বন্দনার দিকে তাকিয়ে বলল, কি বই নিবি বলছিলি? বল শংকরদাকে। আমি উঠব।

বা, উঠবে কি! বলে উঠে গিয়ে শংকর জানলা খুলে দিল। তারপর শ্রীর দিকে তাকাতেই ভেতরটা গুড় গুড় করে উঠছে। নরম কবুতরের মতো উষ্ণতা। সে তার কাজের লোকটাকে বলল, এই বাঁকা, দিদিমণিদের চা দে।

পাট ভাঙা পাজামা পাঞ্জাবি পরনে মানুষটা করিডোর দিয়ে উঠে গেল একবার। বাঁকা কি করছে দেখে এল। শ্রীকে বলল, বাড়ি গেলে না। আজকাল নাকি শনিবার রোববার এখানেই থাকছ। জায়গাটা দেখছি তোমার খুব ভাল লেগে গেছে।

বন্দনা বলল, যাবে কি! যা ঘুম! সকালে ওর তো ঘুমই ভাঙতে চায় না।

শংকরদা বলল, শ্রীর একটাই হবি শুনেছি, ঘুমানো। কিন্তু কেন যে বলল, আত্মীয়ের বাড়ি বেড়ানো তার হবি—আমি তো ওকে বড় একটা আত্মীয়ের বাড়ি ঘুরতে দেখিনি। শ্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আমাদের বাড়ি ক'দিন এসেছ বল!

শ্রীর আবার গা গোলাতে থাকল। আত্মীয়ের বাড়ি বেড়ানোর শখ থেকেই মাঝে মাঝে দাদার শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে যেত। দেশবন্ধু পার্ক পার হয়ে চওড়া রাস্তার উপর দোতলা বাড়ি। এক তলায় বসার ঘর—বিরাট হলঘরের মতো। লোকজন কম। বসার ঘরের পাশে শংকরদার ঘর। শংকরদা দিদির বাড়িতে থেকে রিসার্চ-টিচার্স নিয়ে ব্যস্ত। যেন পড়াশোনা ছাড়া আর কিছু জানে না। তার একটা কেমন আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল। এমন সুন্দর মানুষ—এত নীচ হয় সে জানত না। কি

রে বাবা-কথা নেই বার্তা নেই, পেছন থেকে সাপ্টে ধরা। ভয় হয় না। ফ্রকের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেওয়া! ছিঁচকে চোর। ডাকাত না হলেও বোঝা যেত। মানুষটার জন্য স্বপ্নটা সবে দেখতে শুরু করেছে, তখন এমন আচরণে কার না ক্ষোভ হয়। ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে দিতেই, কি করুণ চোখ! তুমি কিন্তু কাউকে বল না শ্রী। আর তখনই তার ওকটা উঠে এসেছিল। সে ছুটে পালিয়েছিল। সুন্দর সুপুরুষ মানুষকে কখনও সে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেনি। সেদিনই কেন জানি মনে হয়েছিল রাস্তার একটা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। সবার সামনে তার গলা চেটে দিচ্ছে। লাল ঝরছে মুখ থেকে। জিভ লম্বা হয়ে গেছে চাটতে চাটতে। যত দ্রুত বাড়ি ফিরছিল, তত বেগে কুকুরটা তাকে তাড়া করছিল।

শ্রী বলল, আমি কিছু খাব না।

বন্দনার উঠতে ইচ্ছে করছে না, শ্রী বুঝতে পারছে। ঘরে দুর্গন্ধ না ছড়ায় দামী কিছু সুবাস স্প্রে করা। একজন তরুণ অধ্যাপকের সান্নিধ্য কার না ভাল লাগে। তারও ভাল লাগত। সে বসে আড্ডা দিতে পারত অনায়াসে, কিন্তু শংকরদা শেষ পর্যন্ত কেন যে কুকুর হয়ে গেল! সে বন্দনার দিকে তাকিয়ে বলল, কিরে, উঠবি না! ওকে বই দুটো দিন না।

শংকর বলল, চল বাইরে বসি।

শ্রী বলল, না। আমাকে এক্ষুণি হোস্টেলে ফিরতে হবে। তার জন্য লোকটা কেন এত যে হেদিয়ে মরে যে বোঝে না। মানুষের স্বপ্নের ভালবাসা এ-ভাবে নষ্ট করে দিলে কার দায়—সে কি করবে—ইস্, কি পচা গন্ধ।

শংকর অবাক হয়ে বলল, পচা গন্ধ! কোথায়? কি বলছ তুমি?

ওফ্, আমি বসতে পারছি না। শ্রী নাকে আঁচল চাপা দিল।

শংকর বুঝতে পারছে আদরে আদরে মেয়েটির মাথা গেছে। সবার ছোট বলে, বাপ মা দাদারা এমন আস্কারা দিয়েছে যে এখন একজন অধ্যাপকের বাড়ি এলেও পচা গন্ধ পায়। শংকর বন্দনার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি পাচ্ছ?

না তো?

কি জানি, কিছু তো মরে পচে নেই। শংকর উঠে দাঁড়াল। যদি জানলা দিয়ে আসে। সে জানলাটা গিয়ে নাক টানল। আসলে শ্রীর মধ্যে সে কেমন অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করতে থাকল। বলল, তোমার কি শরীর খারাপ!

শ্রী বলল, আমি যাচ্ছি রে। বলেই প্রায় যেন কোনো রকমে শাড়ি সামলে নাকেমুখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটতে থাকল। শংকর আর কি করেন বন্দনাকে একা বসিয়ে রাখা ঠিক না। পাশের কোয়ার্টারগুলোতে জানলা খোলা। প্রিন্সিপাল মানুষটি এ-সব বিষয়ে একটু বেশি কড়া। ফলে বই দুটো বের করে দিয়ে বন্দনাকে

বলল, কি ব্যাপার বল তো! এ-ভাবে ছুটে পালাল!

বন্দনা বলল, সব মিছে কথা। অনীষ ভাইর সঙ্গে শ্রীর এ-সময়টাতে কি নাকি জরুরী কাজ থাকে। আসতেই চাইছিল না। জোর করে ধরে নিয়ে এসেছিলাম। এখন গেলেই দেখতে পাবেন, ওরা দুজনে কামিনী ফুল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

বন্দনার এমন কথায় শংকর কেমন একটা ধাক্কা খেল।

অনীষ ভাই মানে, সেই লম্বা মতো ছেলেটি! সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানোর শখ যার?

ঠিকই ধরেছেন। আমরা ম্যালবোর্ন বলে ক্ষেপাতাম। সিলেট না কোথায় বাড়ি যেন। এখানে এসে এ-কার ও-কার নিয়ে ভারি ঝামেলায় পড়েছে। ফোকাস বলে না।

কি বলে!

ফুকাস।

শ্রীর ওর সঙ্গে ভাব!

ঠিক ভাব না। কেমন একটা জেদ শ্রীর। বিকেলের টিফিনের পরে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দু'জনে কথা বলে। ভুল হলে শুধরে দেয়।

শ্রীর এমন নিম্ন রুচি হবে শংকর ভাবতেই পারেনি। কোথাকার কে, তাকে মেরামত করার দায় তোমাকে কে দিয়েছে! এটা ভাল কথা না। মেসোমশাই বা কি ভাববেন। কেমন ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠল শংকর।

শুনেছি জাহাজে কাজ করলে চরিত্র ভাল থাকে না।

আমরাও তো তাই ওকে বলেছি। তুই কার সঙ্গে মিশছিস!

জানো তো ওয়্যান ইন এভরি পোর্ট, জাহাজীদের নামে বেশ চালু আছে কথাটা। কত ঘাটের জল খাওয়া—শ্রী আর এখানে এসে অন্য কাজ পেল না!

বন্দনা বইয়ের পাতা উল্টে দেখছিল। শ্রীর সঙ্গে অনীষ ভাইর মাখামাখি তাদের পছন্দ হয়নি। শংকরদা ঠিকই বলেছে, সমুদ্র থেকে ফেরা—কে জানে কি•ছোঁয়াচে রোগ শরীরে পুষে রেখেছে! শংকরদার কথায় মনে হল, ওর কাছাকাছি থাকলেও সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা। মরবে আর কি! মর তুমি, আমরা কিছু জানি না। আমরা ভাল চাই বলে, তোমাকে সাবধান করে দিয়েছি। এসব ভাবতে ভাবতেই বন্দনা বই দুটো নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, যাই শংকরদা।

শংকরদা বাইরে এগিয়ে দেবার সময় বলল, কিছু একটা করতে হয়। অনীষের উপর সে কেমন সামান্য প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে উঠল। অনীষকে ক্লাসে কোনো অজুহাতে অপমান করার জন্য সুযোগ খুঁজতে গিয়ে দেখল, মাথাটা কেমন গরম হয়ে গেছে তার। তার ছাত্র হয়ে একজন প্রতিপক্ষ হয়ে উঠবে অনীষ, ভাবতেই

পারেনি ! শ্রী এখানে এলে পচা গন্ধ পায়। আর ওখানে বুঝি সব সুগন্ধ ছড়ানো ! শংকর বাথরুমে ঢুকে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতে থাকল। তারপর মনে হল, সে অধ্যাপক। তার শাসন করার এমনিতেই এক্তিয়ার আছে। জামা কাপড় পাল্টে সে তাড়াতাড়ি বের হবার মুখে আয়নায় মুখ দেখল। ক্রিম বুলাল। হা হা করে হাতের তালু শুঁকে দেখল, মুখে কোন দুর্গন্ধ আছে কি না ! শ্রী যে পচা গন্ধটা কোথায় পেল। তার শরীরে, মুখে—না, মুখে তার কোন পচা গন্ধ নেই। তবু সে ফের বাথরুমে ঢুকে দাঁত মেজে নিল। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল। আতর নিল রুমালে। এবং বাহারি দামি স্যুট পরে দৌড়ে বের হয়ে গেল।

কিছুটা এসেই মনে হল, সে অধ্যাপক—ভিতরে যতই কূটকামড় থাকুক, অধ্যাপকের মুখোস পরে তাকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে হবে। কোনো বেচাল দেখলে, সে শাসন করতেই পারে। তার হাতে মস্ত একখানা বাঁশ আছে। নাম কিউমিলেটিভ রেকর্ড। সে হেঁটে গেলে ক্যাম্পাসে দেখেছে, মেয়েরা মাথা নিচু করে থাকে। ছেলেরা কথা বন্ধ করে দেয়। এটা এক অহংকার তার। আর তুমি আত্মীয় হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা লোফার লম্পটের সঙ্গে মাখামাখি !

তখন অনীষ বলল, এই শ্রী, শংকরদা আসছে।

আসুক না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

হোক না।

কিন্তু......

কিন্তু কি আবার ! এই যেমন আপনি বললেন, আপনাদের 'র' 'ড়' বালাই নেই।

নেই তো। যেমন ধরুন আমরা বাড়িকে বারি বলি। আমরা ঘর কে গর বলি। 'ঘ' এর উচ্চারণও আমাদের নেই। ভাতকে আমরা বাত বলি। আপনি বলবেন ভাত খাব। আমি বলব, বাত খামু। আমি যদি মাকে বলি, ভাত দাও মা। মা ভাববে, আমি ঠাট্টা করছি। মাতো আমার জীবনেও ভাত শব্দটি জানে না। এ-দেশে এসে মার এক কথা, কি যে কয় অরা কিছু বুজি না। যেমন এই বুঝি শব্দটা মা আমার বুজি বলবে। আমিও বুজি বলি। বুঝি বলি না।

বাড়িতে বাঙাল ভাষা বলুন না, কে আপত্তি করেছে ?

এখানেও আপনি বলুন তা। কে আপত্তি করেছে। কিন্তু জগাখিচুড়ি হলে কার না রাগ হয় বলুন।

অনীষ ভাবল, শ্রী ঠিকই বলেছে। সে বলল, আমি চেষ্টা করছি। সবই হয়, শুধু এ-কার ও-কার গণ্ডগোল। বাকি দশ মাসে আপনাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে

ঠিক হয়ে যাবে।

আমার তো মনে হয় না হবে বলে।

কেন হবে না বলছেন ! তারপর ফের কেমন অস্বস্তিতে বলল, আমি যাই শ্রী। শংকরদা এদিকেই আসছেন।

আসুক। আপনি রোজ এ-সময়তে আমার সঙ্গে বেড়াবেন। কথা বলবেন। কি রাজি তো !

রোজই তো বলি। বেড়াই আপনার সঙ্গে।

শংকর কাছে এসে বলল, তোমরা এখানে কি করছ ?

শ্রী বলল, কথা বলছি।

শংকরের চোখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু খুব প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতো সেই রক্তবর্ণ চক্ষু নিমেষে স্বাভাবিক করে ফেলে বলল, চারুদিকে বলে বের হয়েছ ?

চারুদি নেই।

কোথায় গেছে ?

বাড়ি।

শংকর জানে শ্রী জাঁহাবাজ মেয়ে। সামনাসামনি পেরে ওঠা যাবে না। ক্লাসে অপমান করবে অনীষকে—তালেই বুঝতে পারবে তার কত মুরদ। শেষে ভাবল—যদি এই নিয়ে জল আবার অনেক দূর গড়ায়, ছেলেরা ক্লাস বয়কট করে, শ্রী তাতিয়ে দিতে পারে। জল তাহলে অনেক দূর গড়াবে। বরং চারুদিকে দিয়ে নালিশ দিতে পারে—কিংবা সেও পারে। ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলে জ্বলবেই। দুটিই জীবনে বড় বেশি দাহ্য পদার্থ। শ্রীকে দিয়ে হবে না। বরং অনীষকে দিয়েই শুরু করতে হবে। সে মেসোমশাইকেও চিঠি দিতে পারে, শ্রীর মাখামাখি সবার কাছেই দৃষ্টিকটু ঠেকছে। আপনি শ্রীকে সাবধান করে দেবেন। কিন্তু পরে ভাবল, এতটা এগোবার আগে প্রিন্সিপালকে দিয়ে অনীষকে একটু সমঝে দেওয়া দরকার। যদি কমের উপর দিয়ে হয়ে যায় তবে আর কলকাতা পর্যন্ত দৌড়ন কেন !

গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে অনীষ ফিরে এসে সত্যি একটা চিরকুট পেল। প্রিন্সিপাল তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন অফিস ঘরে।

দোতলার বসার ঘরে শ্রী গুম মেরে বসেছিল। কলেজ গতকাল খুলেছে। তাকে যেতে দেওয়া হয়নি। ছোড়দা বাড়িতে। সেই পাহারায় আছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে সে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেছে। বাবা তাকে রাতে শোবার আগে সেদিন ডেকে বললেন, এ-চিঠিগুলি পড়।

তিনটে চিঠি।

প্রথমটা বিমলেন্দুদা অর্থাৎ ট্রেনিং কলেজের বড়দার চিঠি। ইংরাজিতে। চিঠিটা পড়ে বুঝল অনীষকে নিয়ে অভিযোগ। অনীষ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা। হুইমিজিক্যাল, পুয়োর, প্রাইমারী স্কুল টিচার শব্দগুলি বার বার উল্লেখ করেছেন। শ্রী সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই। যেন অনীষ একটা উইচ। শ্রীকে কব্জা করার জন্য ফাঁদ পেতেছে। যেহেতু প্রিন্সিপাল মানুষটি বিবেকবান মানুষ, তাছাড়া তাঁরও শ্রীর বয়সী মেয়ে আছে, সেই চিন্তা থেকে তাঁর চিঠি লিখে বাবাকে সতর্ক করে দেওয়া। চিঠিটা সে পড়েই ছিঁড়ে ফেলল। অন্য দুটি চিঠি আর সে পড়ল না। শংকরদার চিঠিটা তার ধরতেও ঘৃণা হচ্ছিল। যেন পচা ইঁদুর অথবা বেড়াল ছানার মতো সেটা পড়ে আছে। চিঠিটা সে দৈবকে ডেকে আগুনে দিয়ে দিতে বলেছিল। চারুদির চিঠিটা টেবিলেই পড়েছিল, সে ছুঁয়েও ফের দেখেনি।

বাবা পায়চারি করছিলেন। একটা ফোন এসেছিল নার্সিংহোম থেকে। রুগী সম্পর্কে কোনো খবর বোধ হয়। ওষুধ পাল্টে কি আর একটা ট্যাবলেট এবং ইনজেকশানের নাম বলে তারপর কার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন। শেষে ফোন নামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, পড়লে। বাবার স্লিপিং গাউনের নিচটা সে দেখতে পাচ্ছিল। একটা গাছ এবং তার ডালপালায় দুটো কাঠবেড়ালি খেলা করছে। বাবার কথায় তার হুঁশ ফিরে এসেছিল। কিন্তু সে কোনো কথা বলেনি। কথা বলবে কি, অনীষের সঙ্গে সে মেলামেশা করে ঠিক, তাই বলে অনীষকে সে ভালবেসে বিয়ে করবে, মাথায় এমন দুর্বুদ্ধি ছিল না। একজন সহপাঠীর সঙ্গে যে যে ব্যবহার শোভন তাই সে করেছে। সবাই পেছনে লাগলে বেচারী যায় কোথায়! কিন্তু চিঠি তিনটে তাকে যেন কেমন উগ্র করে তুলেছে। সে যা ভাবেনি, চিঠি তিনটে তাও তাকে শেষ পর্যন্ত ভাবিয়ে তুলতে সাহায্য করল। সে দেখতে পেল, রাতের ট্রেনে তারা কোথাও যাচ্ছে। অনীষ ঘুমিয়ে আছে। সে তার শিয়রে বসে অনীষকে পাহারা দিচ্ছে।

তিনি পাশের সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি বড় হয়েছ, ভাল মন্দ বুঝতে শেখ। নাহলে তোমাকে ট্রাবলস ফেস করতে হবে।

শ্রী কথা বলেনি। চুপচাপ মাথা নিচু করে সেদিন বসেছিল। মা পাশের জানলায়। সে জানে। মার চোখে জল। মা কোনো কিছুই প্রতিবাদ করে না। শুধু কান্নাকাটি করে বুঝিয়ে দেয় এতে তার মনোকষ্টের কারণ থাকবে। মার চোখে জল দেখলে বড় বিশ্রী লাগে তার। সেদিন জবাব না দেওয়ায় বাবা ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছিলেন, কোথাকার কোন বাউণ্ডুলে রিফুজি ছেলে, সে শেষ পর্যন্ত তোমার মাথাটি খেল!

শ্রী আর কিছু শুনতে চায়নি। সে উঠে পড়েছিল।

বাবা বলেছিলেন, কোথায় যাচ্ছ! আমার আরও কথা আছে। সবটা তোমার

শোনা হয়নি। ট্রেনিংয়ে আর যেতে হবে না। আষাঢ়ে বিয়ে তোমার। চিঠিগুলি পাবার পরই মনস্থির করে ফেলেছি। তোমার বয়স কম। ভালমন্দ বোঝার সময় হয়নি। তোমার দাদাদেরও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে রেখ আমরা তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী।

শ্রী তবু কোনো কথা বলেনি। তার এই স্বভাব। বোধহয় এটা মার কাছ থেকে পেয়েছে। কথা না বলাটাই তার প্রতিবাদ, তার বাবা প্রিয়তোষ এটা বোঝেন। শ্রী বুঝতে পারছিল, তার এই আচরণে বাবার ক্ষোভ আরও বাড়ছে। কারণ বিয়ে সম্পর্কে সে কোনো প্রশ্নই করেনি। কে সেই মহান ব্যক্তি যিনি তার পাণিগ্রহণে ব্যস্ত! এইটুকু ভেবে সে মুচকি হেসেছিল।

প্রিয়তোষ সব লক্ষ্য করেছিলেন। শ্রীর মুচকি হাসিটা তার চোখ এড়িয়ে যায়নি। তিনি বলেছিলেন, তুমি কি এটা জোক মনে করছ!

না।

তাহলে!

আমার এখন বিয়ের ইচ্ছে নেই। আমি বড় হয়েছি। ট্রেনিং কমপ্লিট করি, তখন তোমাদের যা ইচ্ছে কর।

কিন্তু শংকরের বাবা রাজি না। এমন জুয়েল ছেলে ক'জনের ভাগ্যে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই পচা গন্ধটা তাকে তাড়া করল। ওক উঠে আসছে। সে বমি সামলাতে বাথরুমের দিকে ছুটে গেছিল। কি হল তোমার! ওক উঠছে কেন!

চোখে মুখে জল দিয়ে বের হয়ে বলল, এমনি। শরীরটা ভাল নেই। তারপর সে নিজের ঘরে ঢুকে ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে শুয়ে পড়েছিল। বড় একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুর সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়ায়। সে পর্যন্ত দিদিমণির অস্বস্তি টের পেয়েছিল। চুপচাপ সতর্ক পা ফেলে সেও ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে শ্রীর দিকে তাকিয়ে—শ্রী শুধু বলেছিল, নিচে আমার পায়ের কাছে শুয়ে থাক।

শ্রী এই একমাস কোথাও বের হয়নি। পচা গন্ধটা তাড়া করলেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তাকে দেখলে এখন কিছুটা রুগ্নই দেখা যায়। বাবা তাঁর চিকিৎসা যথা নিয়মে চালিয়ে যাচ্ছেন। আর বিয়ের কথা উঠছে না। বরং বলছেন, তোমার এই শরীর নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

শ্রীর এক কথা, ওখানে গেলেই ভাল হয়ে যাবে।

কাল থেকে এই নিয়ে অশান্তি চলছে। বাবা বলেছেন, বিমলেন্দুকে আমি চিঠি দিয়ে দেব। তুমি অসুস্থ শরীর নিয়ে যাবে কি করে!

ওখানে গেলেই ভাল হয়ে যাব। কাল সকালে আমি যাচ্ছি।

সকালে উঠেই দৈবকে বলেছিল, একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও। সে তার জামা

কাপড় গুছিয়েই রেখেছিল। তার জেদ দেখে বাবা আজ চেম্বার পর্যন্ত যাননি। সারাক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করছেন। ওখানে তার এত টান কিসের, মনে মনে এমন একটা দুর্ভাবনা কাজ করছে।

সে বলেছিল, ঠিক আছে, আর মেলামেশা না করলেই হল। তাহলে তোমরা খুশি তো। এমন একজন নির্ভেজাল ছেলে সবার কাছে তার জন্য ছোট হয়ে যাচ্ছে, ভাবতেও কেমন কষ্ট হচ্ছিল তার। সে না ডাকলে তো সাহসই পেত না কাছে ভিড়তে। সেই তো ওকে ডেকে এনে সব রকমের অপমান থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। এমন একজন নির্ভেজাল মানুষকে নিয়ে বার বার ঠাট্টা তামাসা করলে অপমানের চেয়েও কিছু বেশি এমন তার মনে হয়। বড় খোলামেলা। বাড়িতে কে কে আছে, এমন কি সে তার ভাঙা সাইকেলটারও গল্প করেছে। তার বাড়ির চারপাশের মাঠ, দিগন্ত-ব্যাপ্ত ধানের ক্ষেত, গাছগাছালির ছায়ায় সুদূরে চলে গেছে এক পাকা সড়ক—সেই সড়ক দিয়ে বন্ধুদের নিয়ে সে কোথাও উধাও হয়ে যেতে ভালবাসে। এমন কি ভালবাসতে গিয়ে একটা মেয়ে তার নামে যে দুর্নাম রটিয়ে গেছে, তাও সে কি অনায়াসে বলে ফেলল ! জানেন, সারাদিন পর রাতে লম্ফের আলোতে যখন লিখতে বসি, তখন আমি একজন সম্রাট।

আপনি লেখেন !

লিখি না ঠিক। একআধটু চেষ্টা করি। বলেই কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে গেছিল অনীষ। বলেছিল, যেন দয়া করে কাউকে বলবেন না।

বললে কি হবে ?

এই নিয়ে আবার মজা হতে পারে।

আপনার লেখা দেবেন। আমি পড়ে দেখব।

কিন্তু কেউ যদি জেনে ফেলে !

জানবে না। কথা দিচ্ছি।

এখানে শুধু দিলীপ আর আপনি জানলেন। আর কেউ জানে না কিন্তু। আমাদের শহরে একটা সাহিত্যচক্র আছে, জানেন। আমি দিলীপ তার সদস্য। কাগজ আছে আমাদের। ওতে দুটো একটা গল্প ছাপা হয়েছে। আমাদের সবাই বয়ে যাওয়া ছেলে মনে করে। ভাল চোখে দেখে না। কেউ কেউ আবার অকালপক্ক ভাবে। বলুন তখন খারাপ লাগে না !

দুটো গল্প শ্রী চেয়ে নিয়ে পড়েছে। ভারি সুন্দর লেখা। মানুষটা এমন কথাবার্তা বলে, অথচ গদ্যে কি আশ্চর্য সৌন্দর্য খেলা করে বেড়ায়। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, সে গোপনে অনীষের দুটো লেখাই পড়েছিল। লেখার মধ্যে আশ্চর্য রকমের সজীবতা আছে। কেবল মাঝে মাঝে উচ্চারণ ঘটিত ত্রুটি থেকে গেছে। যেমন এক জায়গায়

লিখেছে সেদিনটা ছিল সমবায়। সে কেটে সোমবার লিখে দিয়েছে। একজায়গায় লিখেছে, টর্চে বেটারি ছিল না, বেটারি কেটে ব্যাটারি করে দিয়েছে। তারপর একদিন শ্রী বলেছিল, কলকাতার কাগজে লেখা পাঠান না কেন !

অদ্ভুত জবাব অনীষের। বলেছিল, সাহস হয় না।

শ্রী লেখা দুটো রেখে দিয়ে বলেছিল, লেখা দুটো আপনি আমাকে দেবেন।

ওরে বাপস্, ও দিয়ে আপনি কি করবেন ?

থাক না আমার কাছে। না হয় আমার জন্য দিলেনই।

অনীষের মুখে তখন ভারি লাজুক হাসি।—ছাইপাশ সব। আপনার কাছে রাখবেন !

সে এই ছুটিতে দুটো লেখাই দুটো বড় কাগজে দিয়ে এসেছে। রোববার এলে ওর নিজের বুকই এখন ধুকপুক করে। তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ায়-যেন লেখা দুটো অনীষের না তার। কেমন ভেতরে এখন অনীষের জন্য সে একটা গর্ববোধ করে।

প্রিয়তোষ দরজায় মুখ বাড়িয়ে বললেন, তাহলে তুমি যাওয়াই ঠিক করলে !

কি মুশকিল, তোমরা বুঝছ না কেন, আর তো পাঁচ ছটা মাস। কেউ এ-ভাবে মাঝখানে পড়া ছেড়ে দেয়। তোমায় বললে তুমি দিতে !

তাহলে গাড়িতেই যাও। ট্রেনে যেতে হবে না। শরীর তোমার এখনও ঠিক হয়নি। তারপরই থেমে বললেন, কলেজ ডিসিপ্লিন মেনে চল। বিমলেন্দু তাই লিখেছে। আর এও মনে রেখ, পরীক্ষায় এদিক ওদিক হলে তোমার কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু গরিব ছেলেটির ক্ষতি হবে। তাতে ফেল করিয়েও দিতে পারে।

আশ্চর্য, এ-কথাটা তার একদিনও মাথায় আসেনি। অনীষের মুরুব্বির জোর কম। তাকে অনায়াসে ফেল করিয়ে দিতে পারে। প্রত্যেক অধ্যাপকের হাতে কিউমিলেটিভ রেকর্ডের নম্বর থাকে। গড় নম্বরে পাস করানো হয়। তিনজন তো তাকে গোল্লা দেবার জন্য রেডি। চারুদি, শংকরদা আর বড়দা। আর বাকি চার পাঁচজনও যে এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হবে না তার ঠিক কি। কেমন একটা দুশ্চিন্তায় পেয়ে বসল শ্রীকে। তাছাড়া কেন জানি, বন্দনা কিংবা হীরাও খুশি নয়। অনীষের সঙ্গে মেলামেশাটা তারাও ভাল চোখে দেখছে না। সে ভেবেছিল, জেলাসি থেকে মেয়েদের এটা হয়। সে একদিন পালিয়ে অনীষকে নিয়ে 'পথের পাঁচালি' দেখে এসেছে। অনীষ বলেছিল, এই ছবিটি তার বার বার দেখতে ইচ্ছে হয়। দুটো ছবি তার কাছে পৃথিবীর সেরা ছবি। যেমন 'বাইসাইকেল থিফ' শ্রী দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল, দেখা হয়নি। অনীষ বলেছিল, করেছেন কি। পৃথিবীতে এলেন, অথচ এমন একটা ট্রেন মিস করলেন। ওটা আপনার মিস করা উচিত

হয়নি। তারপর কি করে জেনেছিল, কলকাতার টকীশো হাউসে বইটা এসেছে। শ্রীকে বলেছিল, শনিবার কলকাতা যাচ্ছি। আপনাকে আমি 'বাইসাইলে থিফ' দেখাব। আমার পিসিমার বাড়ি আছে। আপনি তিনটের শোয়ে চলে আসবেন কিন্তু।

শ্রী বুঝেছিল, পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর সাবলীল, যা কিছু মানুষের আশ্চর্য সুষমার খবর দেয়, অনীষ তাকে তাই দেখাতে ভালবাসে। শ্রীর দেখার মধ্যে সে কি যেন এক আনন্দ খুঁজে পায়। শ্রী অগ্রাহ্য করতে পারেনি। তারা একই ট্রেনে এসেছিল। দু-পাশে ফসলের জমি, টিনের ঘর, মাঠঘাট, নারকেল বাগান পার হয়ে ট্রেনটা ছুটছে। ট্রেন জার্নি কখনও এমন মনোরম হয় শ্রীর আগে জানা ছিল না। সামনাসামনি দুজন বসে। সবকিছুর প্রতি অনীষের কি বালকসুলভ কৌতূহল। জানেন, আমার ট্রেনে উঠলেই কেন জানি মনে হয় কোনো দূরের স্টেশনে কেউ আমার জন্য অপেক্ষায় আছে। আপনার মনে হয় না?

শ্রী বলেছিল, না তো!

সে কি! তবে আর বেঁচে থেকে কি লাভ! কেউ যদি অপেক্ষা করে না থাকে তবে মানুষের বেঁচে থাকার মানে হয় না।

শ্রী সহসা ঠাট্টা না করে পারেনি, যে অপেক্ষা করে আছে তাকে আপনি চেনেন?

কি করে জানব সে কে? চিনব কি করে? তবু বড় হওয়ার সময় কেউ যদি আমার অপেক্ষায় না থাকে তবে বড় হয়ে লাভ কি বলুন। সবাই তো দূরের আকাশ ছুঁতে ভালবাসে।

শ্রী আর কোনো কথা বলতে পারেনি। দু-পাশের শস্যক্ষেত্র পার হয়ে ট্রেনটা যেন নিরবধি কাল ঐ-ভাবে ছোটে এমনই চাইছিল। যেন—ট্রেনটা আর তার কোথাও না থেমে পড়ে।

অনীষ তখনও অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে—আই লাইক টু ক্রিয়েট সামথিং। আমি কেন, সবাই এটা চায়। কোনো কিছু যদি গড়ে তোলা না যায়, যা স্বপ্নের মতো—মানে আমি ঠিক আপনাকে হয়ত বোঝাতে পারছি না—চারপাশের জগৎ এবং প্রকৃতি দেখুন না নিয়ত কেমন ছবি তৈরি করে যাচ্ছে। থেমে নেই। মানুষও থেমে থাকে না। যাদের বাড়ি গাড়ি আছে, নিশ্চিন্ত জীবন, তাদের জন্য আমার কষ্ট হয়। মানুষ যে নিজের মতো কিছু ক্রিয়েট করতে চায় সেটা তারা বোঝে না। জানেন, আমরা যখন এ-দেশে আসি, বাবা কি অথৈ জলে পড়ে গেলেন। জায়গা-জমিন কিছু নেই, আশ্রয় নেই, উপায় নেই কি খাব ঠিক নেই, তার মধ্যে আমাদের বড় হওয়া। বাবা এরই মধ্যে মার সামান্য সোনাদানা বিক্রি করে এক বিশাল বনভূমির একপ্রান্তে ক'বিঘা জমি কিনলেন। ঘর বানালেন। গাছপালা

লাগালেন। অর্থাৎ সেই এক ক্রিয়েশন বলতে পারেন। ছেলেদের দুধ খাওয়াবার জন্য একটা খোঁড়া গরু আনলেন। গোয়ালঘর বানালেন। তারপর এক সন্ধ্যায় আমাকে ডেকে বললেন, দেখতো এটা এখন একটা বামুনের বাড়ি মনে হচ্ছে কি না। থাকার ঘর, রান্নার ঘর, ঠাকুর ঘর, গোয়াল ঘর—সব মিলে বাড়ি বাড়ি মনে হচ্ছে কি না। বুঝলেন শ্রী, আপনি বিশ্বাস করবেন না ঐ টুকু করে বাবার কি অপার আনন্দ! বাবা রাত করে ফিরলে রাস্তায় মা লণ্ঠন হাতে অপেক্ষা করতেন। অনেক দূর থেকে দেখতাম আমাদের বাবা আসছেন। দূর থেকে বাবা যাতে ভাল করে দেখতে পায়, মা আলোটা মাথার উপর তুলে ধরতেন। যেন নীল বাতি জ্বালিয়ে বাবাকে সিগনাল দেওয়া হচ্ছে, আমরা তোমার জন্য এখানটায় অপেক্ষা করে আছি। কি সুন্দর ক্রিয়েশন ভাবুন তো!

অনীষের সে-সব কথা শুনতে শুনতে শ্রী কেমন মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। টগবগ করে ফুটছে অনীষ। এই ট্রেনিং কিংবা হাইস্কুলের কাজ তার কাছে বড় অর্থহীন। তবু দিলীপের পাল্লায় পড়ে এসেছে। দিলীপ তার জন্য অনেক করেছে। দিলীপকে সে কষ্ট দিতে চায় না। শুধু দিলীপ কেন, পৃথিবীতে সে কাউকে কষ্ট দিতে চায় না। কেউ তার জন্য কষ্ট পেয়েছে ভাবলে তার বড় খারাপ লাগে। জাহাজে যাবার পর মাকে সে তার কষ্টের কথা লিখেছে। বলেছে, মা আমার যে কি হয়ে গেছিল, মল্লিকা এ-ভাবে আমাকে ছোট করবে ভাবতে পারিনি। ওখানে থাকলে আমি তোমাদের মুখ দেখাতে পারব না ভয়েই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিলাম। সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে আমার আর ভাল লাগছে না।

পরিচয় সভার দিন যে বললেন, সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো আপনার হবি।

অনীষ হা হা করে হেসে দিয়েছিল—সে সমুদ্র নিজের ভেতরে শ্রী। আপনার আমার সবার মধ্যে এক গোপন সমুদ্র ঢেউ তুলছে। আমি তার মধ্যে ডুবে যেতে ভালবাসি।

যে মানুষ গোপন সমুদ্রে ডুবে থাকতে ভালবাসে তাকে ছোট করলে কার না খারাপ লাগে। ট্রেনে সে সারাক্ষণ অনীষের কথাই ভেবেছে। তার কথা, তার দাঁড়িয়ে থাকা, পাশাপাশি বসে বাইসাইকেল থিফ ছবি দেখা, মাঝে মাঝে চুরি করে দেখা তাকে এবং সে ছবির কোনো দৃশ্যে অভিভূত হয়ে পড়লে অনীষের উচ্ছল হয়ে ওঠার কথা কেবল ভাবছে। তার এই ভাল লাগাকে এমন ভাবে যেন কেউ জীবনে মর্যাদা দেয়নি। এই প্রথম টের পেল, সুখে দুঃখে একজন মানুষ তার সঙ্গী হতে চায়। অথচ সে যে কি করবে! সে তো অনীষের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। অনীষ তার জন্য ক্যান্টিনে কিংবা জনতা কলেজের নিরিবিলি মাঠটায় অপেক্ষা করলে যায় কি-ভাবে।

সারাটা ট্রেন জার্নি কেমন এক বিষণ্ণতার মধ্যে কেটে গেল তার। বাবার দুর্ভাবনা, মার চোখে জল, ছোড়দার তিরস্কার এবং একজন মানুষের করুণ একাকীত্ব তাকে কেমন এক ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে ফেলে দিল। তার কেমন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সে ট্রেনের জানলায় মাথা রেখে কেন যেন আড়ালে কিছুক্ষণ চোখের জলে ভেসে গেল তাও বুঝল না।

দরজায় দামী পর্দা ঝুলছে। পাঠভবনের হলঘরটার পশ্চিম দিকটায় সারি সারি ক্লাসরুম। ওগুলোতে মেথডের ক্লাস হয়। লম্বা টানা সব করিডোর চলে গেছে। যে কোনো করিডোর দিকে হেঁটে গেলেই পাশের করিডোর পাওয়া যায়। দেয়ালে সব মহাপুরুষ সহ জাতীয় নেতাদের ছবি। সকালে থিওরির ক্লাস দুটো, একটা কৃষি সংক্রান্ত ক্লাস করে অনীষ ফিরে এসেছিল নিজের ঘরে। কারণ স্নানের আগে সাফাইর ক্লাস—নর্দমা, বাথরুমের প্যান এবং মাঠে যে-সব খড়কুটো পড়ে থাকে সে-সব সাফ করা হয় এ সময়টাতে। সাফাইর ক্লাসটা রোজ থাকে।

গ্রীষ্মের ছুটির পর সবাই এসে গেছে। অথচ শ্রী আসেনি। কাল সারাটা দিন সে এক দণ্ড ঘরে বসে থাকতে পারেনি। ক্লাসের পর ক্লাস হয়ে গেল, শ্রী হাজির নেই। বিকালে সে স্টেশনের দিকে রাস্তাটায় হেঁটে গেছে। যদি আসার পথে দেখা হয়ে যায়। রাতে ডাইনিং হলের পাশে দাঁড়িয়ে খাবার সময় লক্ষ্য রেখেছে, শ্রী আসে কিনা। সকালে আসতে পারেনি, বিকেলে হয়ত আসবে। এ-সব মনে হয়েছিল তার। সারাক্ষণ ভিতরে ছটফট করেছে। কেমন অধীর হয়ে পড়েছিল। রাতেও যখন দেখতে পেল না তখন কেমন ক্ষেপে গেল নিজের উপর। সে নিজেও রাতে খেল না। বেটা বোঝ কেমন লাগে। শ্রী তোমার কে! পাগলের মতো নিজের ভেতর ছটফট করছ। এবারে মর।

দিলীপ বলেছিল, কিরে, শুয়ে পড়লি যে! খেতে যাবি না?

শরীরটা ভাল না। ক্ষিধে নেই। তুই খেয়ে আয়।

দিলীপ সত্যি ভেবে নিয়েছিল, তার ক্ষিধে নেই। দিলীপ বুঝতেও পারেনি সে তার বোকামির জন্য নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে। বাকি কটা মাস সে শ্রীকে এখানে দেখতে পাবে। পরে যে-যার গ্রামগঞ্জে। জীবনেও হয়ত আর দেখা হবে না। তার ভেতর থেকে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এসেছিল। জানলায় জ্যোৎস্না ছিল। কেমন বিরক্ত বোধ করেছিল জানলায় জ্যোৎস্নার আলো পড়ায়। যেন জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য উপভোগ করার অধিকারও তার নেই।

সে এক সময় দেখল প্রিন্সিপালের ঘরে হাজির। বেয়ারা খবর দিয়েছে। সে ভিতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকল। ছ'সাত মাসে কার কি নাম প্রিন্সিপাল জেনে

ফেলেছেন। ডাকেন খোঁজ করেন নাম ধরেই। অনীষকে দেখে মাথা তুললেন, তারপর আবার নিজের কাজে নিমগ্ন হলেন। অনীষ অস্বস্তিতে আছে। চোখে মুখে উদ্বেগ থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করছে। এবং স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে। পাশে অফিসের বড়বাবু কাগজপত্রে কি সব সই করিয়ে নিচ্ছিলেন। বোধ হয় বড়বাবুর কাজ সারা হয়ে গেলেই তাকে ধরবে।

বড়বাবু চলে গেলে বললেন, বোস।

অনীষ বসল। সে দেয়ালের ছবিগুলি দেখলে থাকল। পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ মানুষদের ছবি এখানে আমদানি করা হয়েছে। এগুলো বোধ হয় জীবনে বড় হবার নিদর্শন। একটা ছবিতে গান্ধীজী চরকা কাটছেন। দেয়ালের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছবিটা। নিচে মেঝেতে দামী কার্পেট পাতা ঘর। সবুজ রঙের। রিভলভিং চেয়ারে বড়দা। অতি সূক্ষ্ম খদ্দরের পাট ভাঙা পাজামা পাঞ্জাবি পরনে। অতিকায় সেক্রেটারিয়েট টেবিল। ঘরের কোণায় কোণায় ফুলের ভাসে সাদা ক্রিসেন্থিমাম।

তিনি কাগজে কি দেখতে দেখতে বললেন, তোমার আচরণে কিছু অধ্যাপক ক্ষুব্ধ। কলেজ ডিসিপ্লিন তুমি মানছ না।

তাহলে শ্রীকে নিয়ে কথা হচ্ছে। শ্রীও বোধ হয় জেনে গেছে এমন একটা ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। সে-জন্যই সে আসেনি।

সে কোন জবাব দিল না।

বড়দা আবার বললেন, ট্রেনিং নিতে এসেছ। পড়াশোনায় মনোযোগ দাও। তুমি নাকি এখনও কোনো প্রজেক্ট সাবমিট করনি। আর দু-এক মাস বাদে প্র্যাকটিস টিচিং শুরু হবে। এত উদাসীন থাকলে চলবে কেন! যতটা জানি তোমার বাড়ির অবস্থা ভাল না। তোমাকে তো বড় হতে হবে। মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবার জন্যই সংগ্রাম করে। এমন একটা বড় সুযোগ পেয়ে নষ্ট করে দিচ্ছ কেন!

অনীষ জানে বড় সুযোগই। কারণ আজকাল এখানকার ট্রেনিং থাকলে শিক্ষা বিভাগে অফিসার পদমর্যাদার চাকরি পাওয়া যায়। সরকারি চাকরি পেতে কে না চায়। তার অফিস থাকবে, একজন বেয়ারা থাকবে। সে এখন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক, ট্রেনিং শেষে সে ইচ্ছে করলে সেই প্রাথমিক স্কুলের ইন্সপেকটর হতে পারবে। এমন কি ডি আই হওয়াটাও অস্বাভাবিক না।

অনীষ কি ভেবে বলল, কি করলে আমার আচরণে কেউ ক্ষুব্ধ হবেন না এটা আমি বড়দা বুঝতে পারছি না। আসলে সে জানতে চায় তার সঙ্গে শ্রীকে যুক্ত করা হয়েছে কি না। প্রাথমিক দুর্বলতা তার কেটে গেছে।

বড়দা কান চুলকাচ্ছিলেন, এবং রিভলভিং চেয়ারে দুলছিলেন। আসলে কত বড় জায়গায় তিনি এসেছেন, চেয়ারটাই যেন তার প্রমাণ। মাথায় কাঁচাপাকা

চুল। মাঝখানে সিঁথি। সাফাই-এর ক্লাসে মাঝে মাঝে তিনি নিজেও আসেন। এ-ছাড়া আরও সব কিংবদন্তী ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এক সময় খাটা পায়খানা ছিল এখানটাতে, ছাত্ররা পরিষ্কার করবে না এমন বিদ্রোহ করলে, নিজে মাথায় করে সব বয়ে নিয়ে গিয়ে উদাহরণ স্থাপন করেছেন। তখন সবে কলেজ সরকার থেকে শুরু করা হয়েছে, বাড়িঘর হয়নি—লম্বা টানা প্ল্যাটফরমের মতো ঘরে ছাত্ররা থাকত। চারপাশে ছিল গভীর বনজঙ্গল। সাপ-খোপ, কীট-পতঙ্গ। সে-সব দিনকার কথা এখন নতুন ছাত্রদের কাছে উপকথার মতো লাগবে। বড়দার দৃঢ়তা না থাকলে এত বড় একটা ইনস্টিটিউশন খাড়া করা যেত না, সুজয়দা প্রায়ই এটা ছাত্রদের ফাঁক পেলেই শোনান।

বড়দা বললেন, তুমি নাকি নীলিমাদির ক্লাস একদিনও করনি!

অনীষ বলল, কোন ইন্টারেস্ট পাই না।

তবু যাবে। বুঝছ না কেন এখানে সবাই মর্যাদা নিয়ে বড় উদ্বেগে কাটায়।

অনীষ তারপর বলল, ঠিক আছে, নীলমাদির ক্লাসে যাব।

আসলে সে যে ভাল ছেলে হয়ে থাকতে চায়, সেও যেন শ্রীর জন্য। তার কোনো অপবাদে শ্রী আবার কষ্ট না পায়। অন্য সময় হলে সোজা কে জানে, তার যা বাউণ্ডুলে স্বভাব, বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে বাড়িই না চলে যেত।

অনীষ এবার উঠতে গেলে বলল, আর শোন, তোমার জন্য কারো ক্ষতি হয়, তুমি নিশ্চয়ই চাও না।

অনীষ চুপ করে থাকল।

শ্রীর বাবা লিখেছেন, ওকে আর এখানে পাঠাবেন না।

অনীষের বুকটা কেমন সহসা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। ঠিক যেন দাঁড়াতেও পারছে না। তার কাছে সব কিছু কেমন অর্থহীন হয়ে গেল। সে ধীরে ধীরে বের হবার মুখে শুনল বড়দা বলছেন, কাজেই তোমার আচরণে অধ্যাপকরা ক্ষুব্ধ হতেই পারেন। আমার জায়গায় তুমি থাকলে সেটা তোমারও হত। আশা করি তুমি কলেজের সুনাম নষ্ট করবে না। আমরা চাই না তোমার অনিষ্ট হোক।

অনীষ বাইরে এসে দাঁড়াল। সামনেই সেই কামিনী ফুলের গাছ। এখানকার এই গাছটা তার কাছে বড় মায়াবী। গাছটায় ফুল ফুটে থাকত। সে আর শ্রী দাঁড়িয়ে কথা বলত। নির্দোষ মেলামেশা। শ্রী তার কথা শুনতে শুনতে কোথায় কি উচ্চারণে ত্রুটি থাকত ধরিয়ে দিত। এই পর্যন্ত। আর কিছু না। তার জন্য শ্রীর এত বড় অনিষ্ট হবে, সে ভাবতেই পারেনি। হতাশ এবং ক্লান্ত সে। কেমন জীবনের সব উৎসাহ এক ফুৎকারে কে নিভিয়ে দিল। শ্রীকে তার জন্য কুৎসিত অপবাদের মুখে পড়তে হয়েছে—এমন কূটকামড়ে সে কেমন অস্থির হয়ে উঠল।

ক্যান্টিনের পাশ দিয়ে যাবার সময় দূরে দেখল, তার আবাসের বারান্দায় সবাই অপেক্ষা করছে। কোনো মর্মান্তিক খবর, কিংবা যা সংশয় ছিল তাদের মনে শ্রী বোনকে নিয়ে অনীষের সঙ্গে কোনো অপবাদ, দিলীপ তো বার বার বলেছে, ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত কি কথা বলিস, বেশি মিশবি না—এসব সতর্ক করে দেবার পরও সে মিশেছে—এখন বোঝ মজা! অনীষ এ-সব ভেবে খুবই সংকুচিত হয়ে পড়ছিল। তার নিজের জন্য আদৌ ভাবে না। শ্রীর জন্য তার চোখে জল এসে গেল। সে নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে, যেন কিছুই হয়নি। এমন এক ভাব দেখিয়ে বারান্দায় উঠতেই সবার এক কথা, কি রে, বড়দা ডেকেছিল কেন?

এমনি। সে সোজা ঘরে ঢুকে গেল।

সঙ্গেসঙ্গে চণ্ডী, রমেন ধীরেন গোকুলদা সবাই ভিতরে। নানা রকমের প্রশ্ন—আসলে এখানে কিছু গোপন থাকে না। মুখে মুখে সব চাউর হয়ে যায়। সে গোপন করলেও, পরে সবাই জানতে পারবে। কারণ দরজার পাশে যে বেয়ারাটি আছে তার কান বড় সজাগ। এমন কি ভিড়ের ভিতর থেকে কে একজন বলল, শ্রী বোন আর আসছে না।

অনীষ জামা খুলে দেয়ালে হুকে তখন ঝুলিয়ে দিচ্ছিল—আর ঠিক এ-সময়ে সেই কথা, শ্রী বোন আসছে না। পাশ ফিরে দেখল চণ্ডী বলছে। দিলীপ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, এটা কি জেলখানা! এ কি রে বাবা, আমরা তো বড় হয়েছি, মেয়েদের সঙ্গে আমরা মেলামেশা করলে দোষের! দাদারা এক একজন কি। ফাঁক পেলেই তো গাছের নিচে বেদিতে বসে আড্ডা জমান। এটা কেন! কৈ আমাদের নিয়ে তো তাঁদের আড্ডা দিতে ভাল লাগে না। সব কটা আলুবাজ। আমরা সব বুঝি।

অনীষ ধমক দিল, কি বিশ্রী কথা বলছিস!

রাখ তোর বিশ্রী কথা। সুচরিতাকে আমি নিজে দেখেছি অনেক রাতে দাদাদের কোয়ার্টার থেকে ফিরছে। সুধীরদার সঙ্গে ওর এত কি মাখামাখি।

জ্যোতির্ময়দা এসে গেছেন। বললেন, সুচরিতাদি বিবাহিতা। সে কিছু করলেও দোষের না। সুধীরদা বিবাহিত, তিনি করলেও দোষের না। তোমরা এখনও কিছু সার বুঝলে না, অর্বাচীন তোমরা, কতটুকু এগোতে পিছুতে হয় জান না।

অনীষ শুধু চণ্ডীকে বলল, শ্রী আসবে না কে বলেছে?

পুষ্প বোন ক্যান্টিনে বলাবলি করছিল। বড়দাকে নাকি ওর বাবা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে।

কেন আসবে না জানিস? যেন অনীষ এ-ব্যাপারে কিছুই জানে না।

সে আমি জানি না।

অনীষ বলল, আমি জানি।

দিলীপ দেখল, অনীষের চোখ জ্বলছে। অনীষকে এত রাগতে সে কখনও দেখেনি। এই প্রথম মনে হল অনীষ কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরই দিলীপ লক্ষ্য করলে অনীষ চুপচাপ করে বের হয়ে যাচ্ছে। আর একটা কথা না বলে সে বের হয়ে গেল স্নান করতে। দিলীপ বুঝল, আসলে অনীষের মাথা গরম হয়ে গেলে এটা করে। কোনো দুর্ব্যবহার সে করে ফেলবে ভয়েই যেন বের হয়ে গেল। এবং স্নান করে ফিরে এলে দিলীপ বলল, তুই কি জানিস বললি না তো!

শ্রী আসবে আমি জানি। তাকে নিয়ে যে অপবাদ রটেছে সেটা অনীষ গোপন করে গেল।

শ্রী এলেও তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে না বলে দিলাম।

বলব না।

ওরা তো জানে না তোকে। তোর মতো ছেলেকে নিয়ে......

রাখ তো—তোর সেই কথা! তুই যে আমার মধ্যে কি খুঁজে পেলি বুঝি না। চল তো খেয়ে আসি। খুব খিদে পেয়েছে। রাতে খাইনি। অনীষ সেই আগেকার অনীষ যেন। দিলীপ বলল, কি করে জানিস শ্রী আসবে।

কেন যে বললাম, নিজেও জানি না। বলে অনীষ জানলার দিকে কেমন উদাস চোখে তাকিয়ে থাকল। তার সত্যি কিছু আর ভাল লাগছে না। শ্রী না এলে সে সবার কাছে যেন আরও ছোট হয়ে যাবে। এমন কি এ-সময়ে তার ডাইনিং হলেও যেতে সংকোচ হচ্ছিল। সবাই ঠিক যেন জেনে গেছে শ্রী তার সঙ্গে মেলামেশা করত বলে তাকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। বিকালের ক্লাসে যে খবরটা পেল সে আরও মর্মান্তিক। শংকরদার সঙ্গে শ্রীর বিয়ে ঠিকই হয়ে আছে। ট্রেনিং শেষ করার পরই ওদের বিয়ে হয়ে যাবে। শ্রীর সঙ্গে মানাবে ভাল। এবং এটা যে রটনা নয়, সেও বিশ্বাস করে। শ্রীর এখানকার লোকাল গার্জেন শংকরদা। সম্পর্কে শ্রীর আত্মীয়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত। সব দিক থেকে তার চেয়ে কত ফারাক তার। কেবল মনে হচ্ছিল, তার জন্য শ্রী ট্রেনিংটাও শেষ করতে পরল না। পরে ক্লাস থেকে বের হয়ে ভাবল, সে কি করেছে! সে তো শ্রীর কাছে আগ বাড়িয়ে যায়নি! তবে! কিংবা তার চোখের চাউনিতে কি ধরা পড়েছিল, ভিতরে ভিতরে সে শ্রীর জন্য দুর্বল। শ্রীকে তার ভাল লাগে। এটা টের পেয়েই কি শ্রী তাকে অবহেলা থেকে উদ্ধার করতে এসেছিল। কি যে হয়েছে মাথার ভেতর—এক দণ্ড এই দুর্ভাবনা থেকে সে মুক্ত থাকতে পারছে না। সব কিছু বিস্বাদ ঠেকছে। এও ঠিক করে ফেলল, শ্রী না এলে, সেও এখান থেকে চলে যাবে। যেন নিজের অপরাধের

প্রতিশোধ নেওয়া হবে তবে।

আর বিকেলেই দেখল একটা রিকশা আসছে স্টেশনের পথ ধরে। সে এক্সপেরিমেণ্টাল স্কুলের পাশে বড় বটগাছটার নিচে দিলীপকে নিয়ে বসেছিল। এখানটায় সে কোনদিন বসে না। কিন্তু সেই কাল থেকে তার কি হয়েছে কে জানে, ফাঁক পেলেই এখানটায় এসে চুপচাপ বসে থাকে। দিলীপ কি টের পেয়েছে কে জানে—এক দণ্ডের জন্য ক্লাসের বাইরে তার সঙ্গ ছাড়ছে না। শ্রীকে দেখেই তার ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল, যেন বলার ইচ্ছে, যাক, আপনি আমাকে মিথ্যা অপবাদ থেকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু ততক্ষণে দেখল শ্রীর রিকশা তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। শ্রী একবার দিলীপ কিংবা অনীষের দিকে চোখ তুলেও দেখল না।

দিলীপ বলল, যা বাব্বা! রাজনন্দিনী মাইরি। তারপর কেমন ক্ষেপে গেল অনীষের উপর। তুমি যদি বেহায়ার মতো ঘুরঘুর কর তবে ঠিক আমি, জেনে রাখবি, চিরদিনের জন্য সম্পর্ক কাট আপ করব।

অনীষ কেমন বোকার মতো বলল, না না। আমার কি কোনো আত্মমর্যাদা নেই মনে করিস!

সেটা যেন মনে থাকে।

কেমন হাল্কা বোধ করল অনীষ। শ্রী এসেছে এটাই তার কাছে এখন বড় খবর। তার জন্য শ্রীর কোনো অনিষ্ট হয়নি, ভাবতেই তার শিস দিয়ে গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

কিন্তু হলে কি হবে, ক্রমে বিষয়টা আবার তার মধ্যে গোলমাল পাকিয়ে তুলল। শ্রী ক্লাসে আসে, তার দিকে চোখ তুলে তাকায় না। শ্রী আবার ঘরে চুপচাপ একা খেয়ে উঠে যায়। শ্রীকে সন্ধ্যায় ক্যান্টিনে পাওয়া যায় না। বন্দনা শ্রীর জন্য ফ্লাস্কে চা এবং খাবার নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে বন্দনা, হীরা কেমন হালকাভাবে তার সঙ্গে কথা বলে, এই যে অনীষ ভাই, দাঁড়িয়ে আছেন কেন! দিলীপ ভাই কোথায়! আসুন চা খাই। এই, আর এক কাপ চা। অনীষ তাদের কেন যে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না! কোনোদিন প্রশ্ন,' প্র্যাকটিস টিচিংয়ে কার গ্রুপে আছেন? সে জবাব দেয়। কিন্তু তাদের কথার মধ্যে আর সেই সতেজ ভাবটা যেন নেই। শ্রী এই কলেজে আছে, এটাই যেন মাঝে মাঝে টের পাওয়া যায় না। তীব্র এক অভিমানে তার ভেতরকার সব কিছু তছনছ করে দেয় কেউ।

রাতে পড়তে বসলে সে টেবিলে আনমনে পেনসিল দিয়ে একটা ছবি আঁকে। কেউ দূরে, অনেক দূরে যেন ছবিটায় হেঁটে চলে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে তার কিছু ঢোকে না। সব আবছা, অথবা কোনো বনভূমির অন্ধকার তাকে গ্রাস করতে আসে। মাঝে মাঝে সেই অন্ধকার থেকে আগুনে পোড়া একটা ঝলসান মুখ—বিকট

দেখতে তাকে তাড়া করে। সে কেমন ভয় পেয়ে যায়। ঠিক মল্লিকার বিয়ের পর তার এমন অবস্থা হয়েছিল। আবার কিছু একটা করে না বসে। সেবারে সমুদ্র তাকে নিষ্কৃতি দিয়েছিল—কিন্তু এবার সে কি করবে! সে কবিতা পড়তে ভালবাসে। সে লিখতে ভালবাসে। শ্রী এবারে আসার পর একটা লাইনও তার লেখা হয়নি। সে বুঝল, এর মধ্যে আবার ডুবে না গেলে, জীবনে ফের কোথাও বড় রকমের বিভ্রাট ঘটবে। সেদিন সে লাইব্রেরি রুমে গিয়ে বই খুঁজতে গিয়ে এলিয়টের একটা কবিতার বই পেয়ে গেল। এর মধ্যে ডুবে যাওয়া অনেক বেশি কাজের, এমনই ভাবল সে। এ-ছাড়া শ্রীর এমন চুপচাপ থাকা থেকে তার আর কোনো যেন আত্মরক্ষার উপায় জানা নেই।

ঘরে এসে বইটা খুলে পাতা উল্টে গেল। এক একটা পাতায় জীবনের কত উষ্ণতা যেন জমা হয়ে আছে। কেমন রোমাঞ্চ জাগে ভেতরে। জীবনের যত দুঃখ সব যেন নিমেষে হরণ করে নিচ্ছে তার। মনে থাকল না, কাল শিক্ষাতত্ত্বের উপর চূড়ান্ত পরীক্ষা আছে। সবাই যে যার দরজা বন্ধ করে পরীক্ষার পড়া করছে। দিলীপও কি সব নোট করা নিয়ে ব্যস্ত। দিলীপ জানেই না, সে কবিতা পড়ছে। পড়তে পড়তে এক জায়গায় এসে সে কেমন থমকে দাঁড়াল। বার বার পড়ল। যেন এই পড়াটা আর কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়। কেবল শ্রীকে শোনাতে পারে—ইয়োর আর্মস ফুল, অ্যান্ড ইয়োর হেয়ার ওয়েট, আই কুড নট স্পিক, অ্যান্ড মাই আইস ফেইল্ড, আই ওয়াজ নাইদার লিভিং নর ডেড, অ্যান্ড আই নিও নাথিং লুকিং ইনটু দ্য হার্ট অফ লাইট, দ্য সাইলেন্স। পড়তে পড়তে সবটা তার মুখস্থ হয়ে গেল। যখনই সে হতাশ হয়ে পড়ে, নিজেকেই কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনায়। সে কেমন তখন এক অতীব নেশার ঘোরে পৃথিবীর তাবৎ সৌন্দর্যের জন্য কেবল অপেক্ষা করে থাকতে পারে। তার আর কোনো কষ্ট হয় না। সে বুঝতে পারে সমুদ্রের মতো কবিতাও তাকে নিরাময় করে তুলতে পারে। এখন কেবল তার কেন জানি এমন এক পৃথিবীর কথা শ্রীকে জানাতে ইচ্ছে হয়। আর কিছু সে চায় না।

পূজার ছুটির আগে একটা চিরকূটে সে কবিতাটি লিখল। সবই ঠিকঠাক রেখেছে, শুধু শেষ দিকে এক জায়গায় 'দ্য হার্ট' না লিখে, লিখেছে 'ইয়োর হার্ট' তারপর সন্ধ্যার কোনো নির্জনতায় সে শ্রীকে আবিষ্কার করার সময় শুধু বলেছে, বাইসাইকেল থিফ আপনাকে দেখিয়েছি। আমার তো আপনাকে দেবার মতো কিছু সম্বল নেই। ছোট্ট এই কবিতাটি আমার সব কষ্ট লাঘব করে দিয়েছে। মনে হয়েছে, খবরটা আপনাকে দেওয়া দরকার। আমি তো জানি, আপনিও কম কষ্ট পাচ্ছেন না। বলে সে চিরকুটটি শ্রীর হাতে দিয়ে গভীর এক নির্জনতার ভিতর নিজের হোস্টেলে

ফিরে এল। কালই পূজার ছুটি। যে যার ঘরে ফিরে যাবে। ছুটির পর আর মাত্র দুটো মাস। তারপর জীবনেও আর কারো সঙ্গে দেখা হবে না। হলেও তখন অন্য এক গন্ডির মধ্যে সবাই আবদ্ধ হয়ে যাবে। চিরকুটের শেষে লিখেছে, মানুষ তো এক জায়গায় কখনও দাঁড়িয়ে থাকে না।

বন্দনা রাতে লক্ষ্য করল, শ্রীর মধ্যে কি এক অস্থিরতা যেন। কাল থিওরির শেষ পরীক্ষা, অথচ বইয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। সারাক্ষণ কি কেবল খুঁজছে, অথবা গোপন কিছু আছে যা সে সবার অলক্ষ্যে আরও গোপনে লুকিয়ে রাখতে চাইছে। শ্রী এমনিতেই ভারি চাপা স্বভাবের। কথা কম বলে। মাঝে মাঝে জানলায় দাঁড়িয়ে দূরের আকাশ দেখছে। শুধু একবার বলেছিল, তোর কি কিছু হারিয়েছে?

শ্রী শুধু বলেছিল, আমি সব হারিয়েছি, আমার ফিরে পাবার আর কিছু নেই। বলে চেয়ারটায় গা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়েছিল। আসলে শ্রী কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। একটি কবিতার কিছু শব্দ ভারি উতলা করে তুলেছে তাকে। মানুষ তো এক জায়গায় কখনও দাঁড়িয়ে থাকে না। শ্রীও দাঁড়িয়ে থাকবে না। অনীষও না। অনীষের পক্ষে এর চেয়ে বেশি বলারও নেই। বলার সাহসও নেই। সে এখন যে কি করে!

পরদিন পরীক্ষা দেবার সময় দেখা গেল শ্রী দারুণ সেজে এসেছে। কারুকাজ করা সাদা সিল্ক পরেছে। হলুদ রঙের ব্লাউজ। কপালে লাল টিপ। খোঁপা উঁচু করে বেঁধেছে। সারা শরীরে যে তার দারুণ আভিজাত্যের প্রকাশ পায় এ-পোশাকে, শ্রী বোধ হয় জানে। অনীষ চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত। সবাই দেখল, শ্রী বোনের মুখে আশ্চর্য সুষমা। কেউ আস্তে বলল, একেবারে দেবী! সকালে পরীক্ষা হয়ে গেলেই পূজার ছুটি। বাড়ি যাবার টান থাকে। শ্রীও বাড়ি ফিরবে বলে উচ্ছল হয়ে আছে। অনীষ একবার শ্রীকে দূর থেকে এমনই ভাবল। তাকে ডেকে যে কথা বলবে না সে জানে। আর তার স্পর্ধাও নেই সামনে গিয়ে কথা বলে। কারণ কবিতাটি লিখে সে তার যা কিছু দুর্বলতা ছিল, জানিয়ে দিয়ে এসেছে, আমি নিরাময় হয়ে গেছি শ্রী। আমার আর কোনো কষ্ট নেই। শ্রীও বোধ হয় মুক্তি পেয়েছে। এই মুক্তির আনন্দ এখন শ্রীকে ঘিরে রেখেছে।

শ্রী পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে কামিনী ফুলগাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। কারও জন্য সে অপেক্ষা করছে। বন্দনা যাবার সময় ডাকল, কিরে কেমন পরীক্ষা হল?

শ্রী বলল, খুব ভাল।

এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন! চল।

তুই যা। আমার একটু যেতে দেরি হবে।

তখনই শ্রী দেখল, দিলীপ আর অনীষ হলঘর থেকে বের হয়ে আসছে। দিলীপ অনীষকে কি যেন বোঝাচ্ছে। অনীষ মন দিয়ে সেটা শুনছে। সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতেই শ্রী ডাকল, দিলীপ ভাই আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

দিলীপ অনীষের মুখের দিকে তাকাল।

শ্রী বলল, না, শুধু আপনি।

অনীষ একা একা হেঁটে হোস্টেলের দিকে চলে গেল।

দিলীপ গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ালে, শ্রী দেখল, এদিক ওদিক কাছে কেউ আছে কি না। তারপর নিচু গলায় বলল, আপনার বাবা ডি আই, না?

দিলীপ বলল, কেন বলুন তো?

শ্রীর চোখে মুখে উত্তেজনা। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সংযত করে বলল, আপনি আমার একটা উপকার করবেন!

দিলীপ সামান্য ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। এ-মেয়ের উপকার করে তার সাধ্য কি! সে বলল, কি উপকার? আমি কারো কোনো উপকার করতে পারি বলে জানি না।

শ্রী বলল, পারেন। একজন বোনের জীবন রক্ষার্থে এটা আপনাকে করতেই হবে।

দিলীপ অন্য সময় হলে এমন ভাবালু কথা শুনে জোরে হা হা করে হেসে উঠত। কিন্তু এই কামিনী ফুল গাছটার নিচে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে, তার শরীরে এবং মুখে আছে দারুণ এক গাম্ভীর্য। তার দিকে ভারি প্রত্যাশার চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। সে কেমন ধীরে ধীরে বলল, বলুন। যদি পারি, সব দিয়ে হলেও করব।

আমার একটা চাকরি চাই। বন্ধুর জন্য এত করেন, আমার জন্য না হয় আর একটু করলেন। আপনি ইচ্ছে করলে পারেন। অল্পের জন্য কেমিস্ট্রির অনার্স ফার্স্টক্লাস মিস করেছি। আপনাদের শহরে কোনো স্কুলে যদি আপনার বাবা ঢুকিয়ে দেন!

দিলীপ বলল, আপনার বাড়ি থেকে আপত্তি করবে না?

আমি তো বড় হয়েছি, দিলীপ ভাই।

'আমি তো বড় হয়েছি', এই কথার পর দিলীপ আর কোন প্রশ্ন করতে পারল না। বলল, চেষ্টা করব।

না, চেষ্টা না। এটা চেষ্টার কথা না। এটা করতে হবে। আপনি আপনার বাবাকে বলে এটা না করলে আমার কোথাও দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না।

দিলীপ বুঝল, বিষয়টা খুবই জটিল। ব্যাটা বাঙ্গালটা বোঝে না, শ্রী বোন তার জন্য কত ভাবে! সে বলল, একটা দরখাস্ত লিখে আজই দিয়ে দিন। উপরে

টু দি সেক্রেটারি লিখতে হবে না। ওটা আমি বসিয়ে দেব।

শ্রী বলল, আপনি যাবেন কখন?

কাল আমরা যাচ্ছি।

একটা কথা, কেউ যেন না জানে। আপনার বন্ধুও না।

আমি এ-সব বলতেই যাব না। আমার কি দরকার।

এটা প্রকাশ হয়ে পড়লে বাড়ি থেকে কিন্তু নিয়ে যাবে।

দিলীপ দেখল, শ্রী কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে এ-সময়। কোনো কথা আর বলছে না।

কি এত ভাবছেন! আমি তো বললাম, কেউ জানবে না।

না, ভাবছি, আচ্ছা দিলীপ ভাই, মানুষ তো কিছু ক্রিয়েট করতে চায়। তাই না!

দিলীপ এত ভারি কথা বোঝে না। সে শুধু ঘাড় নাড়ল।

শ্রী ফের বলল, সৃষ্টির আনন্দ ছাড়া মানুষ বাঁচে কি করে?

এও এক ভারি কথা। অনীষ মাঝে মাঝে এমন ভারি কথা তাকে বলে। তখনও তার ঘাড় নাড়া ছাড়া উপায় থাকে না।

শ্রী অর্নগল ছেলেমানুষের মত তখনও বলে যাচ্ছে—সবকিছু আমার কাছে এখন তুচ্ছ। মা বাবা দাদা, পারিবারিক মর্যাদার কোনো দাম নেই আমার কাছে। আমি তো সব বুঝি কেন আমার এই আকুলতা। আমাকে যে কিছু একটা করতে হবে। এই তৈরি করা, যা নিজে তৈরি করেছি। যা কিছু আমার, সবটাই নিজের করা ভাবতে কি ভাল লাগে বলুন!

দিলীপ কি বুঝল কে জানে, শুধু বলল, ওখানে গিয়ে থাকবেন কোথায়?

সে দেখা যাবে। আমি কিন্তু আপনার আশায় থাকলাম। বলেই শ্রী ত্রস্ত পায়ে গাছের নিচ থেকে প্রায় যেন দ্রুত বের হয়ে গেল

দিলীপ ফিরে এসে দেখল, অনীষ তার বাক্স গোচাচ্ছে। বোধ হয় বিকেলের ট্রেন ধরেই বাড়ি ফিরবে ঠিক করেছে।

দিলীপ অনীষের তক্তপোষে বসে বলল, কিরে, আমরা যাব না! তুই একাই যাবি নাকি! এত ব্যস্ত।

গুছিয়ে রাখছি।

কিছু ফেলে যাস এই ভয়ে!

না, তা না। বিকালে আজ ঘুমাব। রাতে শুধু ঘুমাব। কি টেনশান গেছে এতদিন।

সেয়ানা! দিলীপ এমন ভাবল। শ্রী ডেকে তাকে কি বলল, জানার কোন

আগ্রহ নেই—এই সব ব্যস্ততার মধ্যে অনীষ সেটা প্রকাশ করতে চায়। দিলীপ অনীষের কাণ্ডকারখানা দেখে নিজের মনেই হাসল। বলল, আমাকে শ্রী বোন ডেকে কি বলল জানতে চাইলিনা তো!

শ্রী বোন কে?

মারব এক থাপ্পড়! শ্রী বোন কে উনি জানেন না। সব জায়গায় একটা না একটা স্ক্যান্ডেল করে তবে ছাড়বে। শ্রী বোন কে জানেন না। শ্রী বোন তোমার ইহকাল পরকাল বুঝলে!

আমার ইহকাল পরকাল হতে যাবে কেন!

যা বললাম মনে রাখ। এখন তোমার গোছগাছ রাখ। অনেক ক্ষেপামি দেখেছি। এখন চল স্নান-টান সেরে দুটো খেয়ে একটা শো মেরে আসি। আঃ, কি মজা! বাড়ি বাড়ি! বাড়ি যাচ্ছি আমরা। কাল সকালের ট্রেন ধরব।

সকালের ট্রেনেই প্ল্যাটফরমের এক পাশে অনীষ দেখল, শ্রী দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীকে তুলে দিতে এসেছেন শংকরদা। শ্রী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনের অপেক্ষায়। সর্বত্র ছিমছাম যুবক যুবতীদের ভিড়। কলেজ ছুটি হলে এটা হয়। যে যার বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে ট্রেনে উঠবে বলে অপেক্ষা করে। প্ল্যাটফরমে এত যুবক যুবতীর ভিড় বছরে দু-একবার ছাড়া হয় না। তখন স্টেশনটার ডাইমেনসানই যেন পাল্টে যায়।

এইমাত্র একটা আপ ট্রেন এল। হকার সব কাগজ নিয়ে এদিক ওদিক ছুটছে। তারপর ট্রেনটা চলে গেল। ওরা সবাই ডাউন ট্রেনে শিয়ালদায়। তারপর যে যার ট্রেন পাল্টে নেবে আবার দরকার মতো। ট্রেন এলে ওরা উঠে পড়ল। শ্রী, বন্দনা হীরারা এক কামরায়। শংকরদাই তাদের তুলে দিলেন। ট্রেন ছাড়লে দু-পাশের ঘরবাড়ি ক্রমে চোখের উপর হারিয়ে যেতে থাকল। ক্রমে শস্যক্ষেত্র দেখা গেল। উদার আকাশ এবং পাখিদের উড়ে যাওয়ার মধ্যে অনীষের মন হল, সে যতই দূরে চলে যাক, একটা কামিনী ফুলের গাছ তার স্মৃতি থেকে জীবনেও মুছে যাবে না। শ্রীর সঙ্গে সে গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে প্রথম কথা বলেছিল। একটা গাছ মানুষের জীবনে কখনও এত বড় হয়ে দেখা দেয় সে জানত না। আর তখনই ট্রেনটা একটা স্টেশনে ঢুকছে। ট্রেন থামতেই সে দেখল, শ্রী ট্রেন থেকে নেমে তাদের কামরার দিকে ছুটে আসছে। জানলায় দিলীপ মুখ বাড়িয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছেন!

আপনাকেই খুঁজছি নিন ধরুন এটা। আপনার বন্ধুকে দেবেন। বলেই আবার ছুট। যেখানে হীরা বন্দনারা আছে, তাদের কাছে চলে গেল! দিলীপের মনে হল, অনীষের চেয়ে শ্রীও কম ক্ষ্যাপা নয়। একটা বিখ্যাত দৈনিক তার হাতে দেবার

অর্থ কি, কিংবা অনীষকে দেবারই বা অর্থ কি। অনীষ পাশে বসে—সেও বুঝতে পারছে না, শ্রী কেন এত আগ্রহ নিয়ে কাগজটা দিতে এসেছিল! আর দৌড়ে চলেই বা গেল কেন!

দিলীপ বলল, হয়েছে বেশ। বলে কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখতেই থ। ম্যাগাজিনের পাতায় বড় বড় অক্ষরে নামটা যেন আগুনের মতো জ্বলছে। অনীষ চৌধুরী। সে সহসা আনন্দে দু-হাত ছুঁড়ে বলল, অনীষ, এই তোর মনে ছিল। আমি সব তোর জানি, এটা জানলাম না। কবে পাঠালি! শ্রীই তোর সব!

অনীষ নিজের নামটা বার বার পড়ল। লেখাটা পড়ল। ওর বুকের উপর দিয়ে এক দ্রুতগামী রেলগাড়ি তখন ছুটছে। উত্তেজনায় অধীর। জীবনের সব ব্যর্থতা গ্লানি এক মুহূর্তে উবে গেল। সত্যি সে আজ দিগ্বিজয় করেছে মনে হল। শ্রী তার হয়ে গোপনে কাজটা করেছে। তার সাহস ছিল না। শ্রী যেন লেখাটা ছাপিয়ে দিয়ে প্রমাণ করেছে, এত ভীরু হলে জীবনে চলে না। তার আরও সাহসী হওয়া দরকার। সে কেমন চোখের জল আড়ালে গোপন করার জন্য দরজার দিকে ছুটে গেল।

দরজায় দু হাত বাড়িয়ে প্রকৃতির নিরন্তর সুষমার মধ্যে ডুবে যেতে যেতে ভাবল, শ্রী সত্যি তার জীবনের ইহকাল পরকাল।

এবং একদিন কিংবা রাতই হবে, স্টেশনে দেখল শ্রী তার অপেক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনিং শেষ। সবাই চলে যাবে। সেদিনও শংকরদা শ্রীকে তুলে দিতে এসেছিলেন স্টেশনে। সবাই ফিরছে। আর কবে কার সঙ্গে দেখা হবে কেউ জানে না। দিলীপ তার দেশের বাড়িতে যাবে বলে অন্য ট্রেন ধরবে। শিয়ালদা স্টেশনে দেখল শ্রী দৌড়ে আসছে। ডাকছে, এই যে শুনছ!

সে তাকাল শ্রীর দিকে।

এগুলি কোথায় রাখবে! কখন তোমার ট্রেন?

অনীষ ঠিক বুঝতে না পেরে বোকার মতো তাকিয়ে থাকল।

কোন প্ল্যাটফরমে, এই কুলি, কুলি, বাবুর ওগুলো তুলে নাও। এস। কত নম্বর প্ল্যাটফরম?

অনীষ বলল, পাঁচ নম্বর।

শ্রী বলল, এই কুলি, পাঁচ নম্বর। কটায় তোমার ট্রেন?

সাড়ে আটটায়।

ঘড়ি দেখল শ্রী।—এই, তাড়াতাড়ি কর। কি হল তোমার? এস।

অনীষ এখনও কিছু বুঝতে পারছে না। বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি

না শ্রী তুমি কি করতে চাও। দোহাই, আমাকে নিয়ে আর মজা কর না। আমাকে আর তোমাকে ট্রেনে তুলে দিতে হবে না। ওটা আমি নিজেই পারব।

সারাটা বছর মজাই করেছি। আমি তো খারাপ। খারাপ না হলে এত অপবাদ বইতে হয়। বলেই, ওফ্, কোথায় চলে যাচ্ছে—হারিয়ে না যায়। কুলি—কুলি !

ট্রেনে ওঠার সময় দেখল, শ্রীও তার বাক্স বেডিং সঙ্গে তুলে আনছে।

অনীষ বলল, তুমি বাড়ি যাবে না ?

না।

কোথায় যাচ্ছ ?

লোকজনের ভিড় কম। রাতের ট্রেনে ভিড়টা কমই থাকে। শ্রী খুব আস্তে আস্তে বলল, তোমার সঙ্গে।

তার মানে !

শ্রী ব্যাগ থেকে বের করে নিয়োগপত্রটা দেখাল।

কোথায় উঠবে ?

কেন আমার নিজের বাড়িতে ! নিজের মানুষের কাছে !

(দূরের আকাশ)

প্রেম—দুই

আমার বাবার ভাই বোন ছিলেন অনেক কজন। ছ ভাই দু বোন। বাবা ছিলেন সেজ। সেজ ভাইরা বোধহয় সংসারে বাড়তি মানুষ হয়। কেন জানি না আমার বাবাকে দেখে তাই মনে হত। একান্নবর্তী সংসার। আমরা ছিলাম বাড়িতে দুদুকাকার শাসনে। তিনি ছিলেন সবার ছোট। সংসার তিনিই চালাতেন। কাকা জেঠারা টাকা দিয়ে খালাস। বাবা শুনেছি তাও ঠিকঠাক দিতেন না। সেজন্য মাকে জেঠি কাকিদের কথা শুনতে হত। মার কখনও গম্ভীর মুখ দেখলে এটা টের পেতাম। মাঝেমাঝে রাগারাগি হত। কথা কাটাকাটি চলত। মা তখন আমাদের নিয়ে মামাবাড়ি চলে যেতেন।

শৈশবের দিনগুলি ছিল আমাদের আশ্চর্য রকমের রোমাঞ্চকর। কারণ মামাবাড়ির দেশটা বড় বেশি রূপকথার মতো ছিল। দাদু যে খুব অর্থবান ছিলেন তা নয়। তব সংসারে তার মোটামুটি সচ্ছলতা ছিল। যজনযাজন, শিষ্যবাড়ি—এই ছিল তার পেশা। আর সম্বল ছিল কালীবাড়ি। সেখানকার তিনি সেবাইত। শনি মঙ্গলবারে পাঁঠা পড়ে। মামাবাড়ি গেলে শনি মঙ্গলবার রাতে মাংসের ঝোল ছিল বাঁধা। একান্নবর্তী সংসারে যতই ঢালাও ব্যবস্থা থাক—খেতে বসে মাছ এক টুকরোর বেশি জুটত না। মাসে ছ মাসে মাংস হলে, তাও চেয়ে খাবার সাহস হত না। এতগুলি মুখ— কার পাতে কটা বেশি দেওয়া যায়। তার সঙ্গে আছে বাড়ির দু দুজন গৃহভৃত্য। বেশি চাইলে তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ছিল জেঠি কাকিদের অবশ্য কর্তব্য।

মামাবাড়িতে সে-সব ছিল না। কেন জানি না দিদিমা আমাদের বেশিই দিতেন। চাইলে কোনো অজুহাতে না দেওয়ার পাট ছিল না। দাদু সঙ্গে বসলে তো কথাই নেই, গোলাকে দাও। লাগবে। সরপুঁটির ঝোল। বিলেতি ধনেপাতা দিয়ে—সে যে কী সুস্বাদু। সেই বিলেতি ধনেপাতার গন্ধ এখনও মনে হলে জিভে জল আসে। অঞ্চলের হাট কালীবাড়ির পেছনটাতে। সকালে বাজার। ব্রহ্মপুত্র আর মেঘনা থেকে হাটে আসে রূপোলী চিতল, জ্যান্ত। ঝুড়ি থেকে টেনে নামালেই লাফায়। আসে সোনালী পাবদা আর চাপিলা মাছ এক একটা বিস্ময়কর রূপোর পাত যেন। কাঁচকি মাছ সরু সরু। কালজিরে ফোড়ন সরষে বাটার ঝোল। এমন সব উপাদেয় খাদ্য আর আমার ল্যাংড়া মামার আজগুবি সব গল্প মিলে দিনগুলি অবিশ্বাস্য রকমের ছোট হয়ে যেত।

মার গম্ভীর মুখ দেখলে, ভেতরে পুলক দেখা দিত। বাবা তো আসে না। এলেও

মাসে দু-মাসে এক আধ দিন থেকে চলে যান। আমাদের আবার মামাবাড়ি যাবার সময়। শুধু বাবাকে একটা চিঠি, ওটা ডাকবাক্সে ফেলে দেবার ভার আমার। খামে ভরা চিঠিতে বাবাকে মা কী যে লিখতেন তিনিই জানেন। তবে এটা বুঝতে কষ্ট হত না, চিঠিটার মধ্যে আমরা যে মামাবাড়ি যাচ্ছি তার খবর লেখা আছে।

তখন আমার পথের পাঁচালী পড়া হয়ে গেছে। বুঝতে পারতাম, মামাবাড়ির রাস্তাটা সত্যি রামায়ণ মহাভারতের দেশে চলে গিয়েছে। বাড়ির বাঁশঝাড় পার হলেই—অবশ্য যদি শীতকাল হত, হলুদ মাঠ সামনে। সরষে ফুল ফুটে গোটা মাঠ ছবির মতো হয়ে আছে। সবুজ পাতা, শিশিরের টুপটাপ শব্দ, মা আগে, পেছনে আমরা দু ভাই, ছোট বোনটা মার কোলে, আরও পেছনে আমাদের বাড়ির মনিবও বলা যেতে পারে আবার গৃহভৃত্যও বলা যেতে পারে পণ্টুকাকা। তার মাথায় ট্রাংক একটা। তার উপর শোভা পাচ্ছে কাপড়ের পুঁটুলি। এই বোঝা সত্ত্বেও চোখ আমাদের দিক থেকে তার সরে না। কারণ রাস্তায় নাবলে কার না ইচ্ছে হয় ছুটে এদিক ওদিক করে হেঁটে যেতে। যেমন আমার ছিল বাই রাস্তার আল থেকে নেমে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে যাওয়া। শীতের ঠাণ্ডা, পায়ে জুতো পরার চল নেই, খালি পা, একেবারে বরফ হয়ে আছে পা। কিন্তু এতটুকু তাতে দুরন্তপনা যদি কমে। ক্ষেতের ভিতর থেকে বের হয়ে এলেই দেখতাম, গায়ে হলুদ ফুলের পাপড়ি লেগে বিচিত্র রঙ ধরে গেছে। মাঝেমাঝে একটা দুটো সবুজ পাতার আভা। মনে হত মোজা পরেছি দু-পায়ে, চক্রাবক্রা। অবশ্য ততক্ষণে পণ্টুকাকার সেই কঠিন স্বর, কান ছিঁড়ে দেব। পায়ে মাড়ালে গাছ নষ্ট হয়। মানুষের খাটনি নষ্ট। মজা করার আর জায়গা পেলি না ?

পণ্টুকাকা সঙ্গে গেলে ফাউসার উপর দিয়ে যেতাম। একটা খাল পড়ত। হাঁটুজল। উপরে সাঁকো বাঁশের। সাঁকো পার হতে হয়।

জল কমে গিয়ে জায়গায় জায়গায় আটকা পড়েছে। বানা দেওয়া। খালের পাড়ে পাড়ে এমন সব মাছ নড়ানড়ি করলে কে আর স্থির থাকতে পারে।

পার থেকে নেবে মাছ দেখার বাতিক আমাদের দু-ভাইয়ের প্রচণ্ড। শীতের ঠাণ্ডায় ঝুড়িতে তোলা হচ্ছে সব বিঘৎ লম্বা কই মাছ। বুক লাল। হাত দিতে গেলে কানকো দিয়ে হাত আঁচড়ে দিত। তবু হাত দেওয়া চাই।

পণ্টুকাকার আবার ডাক, সেজ ঠাকরুণ তোমার ছেলেরা কথা শুনছে না। আমি কিন্তু ফেলে চলে যাব।

মা তখন দাঁড়িয়ে যেত। পেছন ফিরে ডাকত, আয়। কত বেলা হবে যেতে। তোদের এখন মাছ দেখার সময় হল !

তখন কি করে বোঝাই, এই ছুটির জগতে কি যে আকর্ষণ থাকে ! মামাবাড়ি

যাওয়া মানেই পড়া নেই, স্কুল নেই— সকাল বিকেল কেবল এ-জঙ্গলে ও-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো, রথতলার মঠের সেই পুরনো বিরিক্ষির নিচে যে বড় একটা গো-সাপের বাসা আছে, সেখানে আছে এক গুপ্তধনের সিন্দুক। কেউ জানে না, কেবল জানে একজন, সে হলাম আমি। স্বপ্নে কতবার যে মঠের নিচ থেকে ওটা তুলে এনে মাকে দেখিয়েছি। মা বলেছে গুপ্তধন ছুঁতে নেই। ওটা যকের ধন হয়ে যায়। যে-পায় তারই সর্বনাশ। স্বপ্নের কথা মিছে হয় না। তবু মামাবাড়ি গেলে ঐ আকর্ষণটাও বেড়ে যায়। আকর্ষণ না নেশা। একটা সোনালী রঙের গো-সাপ আসে স্বপ্নে। সেই আমাকে প্রতিবার গুপ্তধনের কাছে নিয়ে যায়।

আর আছে মরু। মামাবাড়ি যেতে বড় বটগাছটা পার হলেই কিছুটা বিলেন জমি। ধানক্ষেত। পৌষ মাসেও জমিতে জল। পাশ দিয়ে লম্বা সড়ক চলে গেছে ভুঁইঞা বাড়ির পুকুরের পাশ দিয়ে। বটগাছটার কাছে গেলেই দিঘির মতো বিশাল পুকুরের পাড়ে বাড়িটি জলে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে। একবার চুরি করে পুকুরটা থেকে ছোট মামা, এবং আমি বড় চটা চটা সব পুঁটি মাছ ধরেছিলাম। মাছ এত রাক্ষস হয় আগে আমার জানা ছিল না। ভুঁইঞা বাড়ির চৌকিদারকে বড় মামা কালীর থানের মুণ্ডু দেবেন একটা, সেই সুবাদে ধরা। বলেছিল, কর্তা ধরবেন। ওদিকটায় লাটু যাবে না। তবে একটা কথা গোটা বিশেক। তার বেশি নয়। বড় মামা, যিনি ল্যাংড়া এবং যিনি বাবার খান আর ফুটানি করে বেড়ান, দাড়ি গোঁফ উঠেছে, তেনার পক্ষে শর্ত মানা কঠিন। তিনি নিজের বেলায় যেমন জানেন, কি করবেন শেষ পর্যন্ত, মাছ চুরির বেলাতেও তার সেটা জানা ছিল ভাল। শুধু লোটা ভরে গেলে আমার কাজ ছিল যজ্ঞিডুমুরের বনটার মধ্যে দিয়ে সতর্ক পায়ে প্রায় মাটির সমান নিচু হয়ে উঠে আসা, তারপর ধোপাবাড়ির খুশি মাসির কাছে জিম্মা রেখে ফের লোটা খালি করে নিয়ে যাওয়া। সারা বিকাল ধরে লাটু যতবারই ঘুরে গেছে আট দশখানার বেশি চটা পুটি দেখতে পায়নি।

বটগাছটার কাছে গেলেই আমার মামার সেই মাছ সাফাই করার কথা মনে হয়। বঁড়শি ফেলে বসে থাকা যায় না। ফাতনা ভস করে টেনে নিয়ে যায়। আর যখন ছিপের ডগা নুয়ে যায় মাছ তোলার সময় তখন ভারি মজা। মজা থেকেই চিৎকার, ইস কি বড় ! এই ছুটে গেল ! ইস্ ! ছুটে যাওয়া মাছটা নির্ঘাত রুই কাতলা ভাবতাম। আর একবার ইস শব্দ এমন জোরে হেঁকেছিলাম যে মামা ছিপখানা জলে না ফেলে আমার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। পায়ে চটাং করে এসে লাগতেই আমারও সইল না। ভ্যাক করে কেঁদেছিলাম। মামা তখন ছিপ সামলায় না মাছ সামলায় না আমাকে সামলায়। অবশ্য সে যাত্রা বড় মামা বলেছিলেন, পূরিপূজার মেলায় নিয়ে যাবেন। মেলায় সার্কাস আসবে, বাইস্কোপ আসবে, সবই আমাকে

দেখাবেন। এত সব শর্তে কান্না থামলেও ছোট মামা বাড়ি এসে খবরটা দিয়েছিলেন দাদুকে। দাদু বড় একখানা দা হাতে বড় মামাকে খুঁজতে বের হয়েছিলেন।

ধোপা বাড়ির ধারে একখানা বড় পুকুর। ঘাটলা বাঁধানো। আমাদের গাঁয়ে শুধু প্রতাপ মাঝির বাড়িতে দালান কোঠা আছে। ঘাটলা বাঁধানো পুকুর আছে। মামাবাড়িতে মরুদের আছে, ভুঁইঞা বাড়ির আছে। আর আছে কুলদা চক্রবর্তীর বাড়ির ঘাটলা বাঁধনো পুকুর। একখানা আর তিনখানা তফাত বৈকি গাঁয়ের। মামাবাড়িতে মাইনর স্কুল আছে। হাট আছে, পোষ্টাপিস আছে। রথতলা এবং কালীবাড়ি আছে। মামাবাড়ি নিয়ে কথা উঠলে এ-সব গর্ব করার মতো কথা কার না বলতে ইচ্ছে হয়। আমারও ইচ্ছে হত, তাই নিয়ে একবার বাটুর সঙ্গে মারামারি পর্যন্ত করেছি। বাটু বড়দার সঙ্গে পড়ত। তারপর মেজদার সঙ্গে পড়ত। তারপর সেজদার সঙ্গে। গতবারে আমার সঙ্গে ছিল। এবারে ছোট বঁদুর সঙ্গে ক্লাশ এইটে পড়বে বলে বাটু মনস্থ করেছে। হাডুডু খেলায় অবশ্য ওর সঙ্গে আমরা পারতাম না। বাটুর হাড় আর থাই দুই-ই বড় বজবুত। বড় বেশী ক্যারি মারতে পারত। শিল্ড খেলায় বাটুকে একবার আড়াই হাজরের বাবুরা হায়ার করে নেবার পর, ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। তার একটাই স্বপ্ন বড় হলে সে দনদির বাজারে শাড়ি কাপড়ের দোকান দেবে। কেন যে এমন একটা স্বপ্ন দেখত আমার জানা হয়নি। দোকান দেবার আগেই সে যাত্রাগানের পালায় সখী সেজে চলে গেল। মাসখানেক হল স্কুলে আর আসছে না।

বটগাছটা পার হয়ে সড়কে নামলেই দেখতে পেতাম একখানা লম্বা সবুজ চাতাল। সেখানে সব রঙবেরঙের শাড়ি শুকোচ্ছে। এ-সবের মধ্যে দিয়ে প্রতিবারই একটা দৃশ্য চোখে পড়ত—মরু ছুটে আসছে। মরু প্রথমে কাছে এসে বুঝে নিত আমরাই কি না, তারপর আর এক দৌড়। এক দৌড়ে মামাবাড়ির উঠোন। ও ঠাকুমা বড় পিসি আসছে। হাঁপাত আর খবর দিত। আমাদের মামাবাড়ি আসার খবর মরুর আগে কেউ দিয়েছে বলে জানি না। হাফ-শার্ট গায়। হাফ-প্যান্ট পরনে। মাথায় লম্বা জটা। গতবারই অবাক, মরুর মাথা ন্যাড়া। কোথায় মানত ছিল দিয়ে এসেছে। পরনে তেমনি হাফ-শার্ট আর হাফ-প্যান্ট। যেমন লাফায় তেমনি দ্রুত দৌড়ায়। গতবার একখানা কাণ্ড ঘটতেই বুঝেছি মরু মেয়ে। মরু আমার মতো নয়।

এবারে মামাবাড়ি যাচ্ছি দাদুর চিঠি পেয়ে। লোক মারফত জানিয়েছেন, দাদুর শ্যালকের বিয়ে। মা তো শুনে আহ্লাদে আটখানা। হবারই কথা। মার বয়সী তার মামা। দিদিমা সবার বড়। তারপর আরও নটা। গাছের শেষ ফল সবেধন নীলমণি মামা। আমাদের দাদুর বিয়েতে আমরা যাচ্ছি বলে, এবারের লটবহর একটু বেশিই।

কবে ফিরব ঠিক নেই। আমার হাতেও আছে একটা কাপড়ের পুঁটলি। হাল্কা। ওতে আছে ছোট বোনের কাঁথা-বালিশ। ট্রাংকে ধরেনি। দুদুকাকা বললেন, তুই ওটা নে। দুদুকাকা কিছু বললে সেটা মান্য করারই নিয়ম। তা-ছাড়া তাঁর শাসন বড় কড়া। যমের মতো আমরা সবাই তাঁকে ভয় পাই।

গ্রাম থেকে নামার পথে ওটা বঁদুর মাথায় চাপিয়ে দিয়েছি। সে আমার মতো এত বড় হয় নি বলে লাজলজ্জা কম। মাঠে নেমে গেলে কেউ দেখার নেই—সেখানে সেটা বহন করা খুব অস্বস্তির কারণ হবে না। কাজেই মাঠে আছি বলে এখন ছোট্ট গাঁটরিটা আমার হাতে।

সহসা পণ্ডুকাকার কি হল কে জানে। ডাকল, এই গোলা দে আমার হাতে দে। হাঁট তাড়াতাড়ি।

আসলে পিছিয়ে পড়ছিলাম। আমাদের তো যাবার সময় শুধু হেঁটে যাওয়া নয়, দেখেও যাওয়া। পণ্ডুকাকার সেটা নেই। ভার হাতে বয়ে নিচ্ছি, পিছিয়ে পড়তেই পারি। পণ্ডুকাকার এমন মনে হতে পারে। তাই ট্রাংকটা এক হাতে ধরে আর এক হাতে গাঁটরিটা নিল। আমি আরও মুক্ত হয়ে যেতে দেখলাম, ফাউসার যুগীপাড়া পার হলে সেই টিউকলটা।

আমাদের গাঁয়ে টিউকল নেই। পাশের গাঁয়ে মাইনর স্কুল আছে, তবে টিউকল নেই। মামাবাড়িতেও টিউকল নেই। কাজেই মামাবাড়ি যেতে রাস্তায় একটা টিউকল দেখা যায় সেটা খুবই বড় খবর! ক্লাশে কিংবা খেলার মাঠে টিউকলের বর্ণনাও দিয়েছি। যারা দেখেছে তারা উৎসাহ না দেখালেও যারা দেখেনি, তাদের কাছে ছিল এটা একটা রহস্য। হ্যান্ডেল টিপলেই জল পড়ে মুখ দিয়ে। আর কি ঠাণ্ডা জল! আর টিউকলটা দেখা মাত্রই আমার যে কেন এত জলতেষ্টা পায়। যতবারই গেছি, কী শীত কী গ্রীষ্মে টিউকলটা দেখলেই ছুটে যাওয়া। লাফিয়ে লাফিয়ে হ্যান্ডেল মারা। তারপর দু' হাতে পাইপের মুখ চেপে জল খাওয়া। পাতাল থেকে জল উঠে আসে। সে জলের স্বাদই আলাদা। আরও আশ্চর্য, গ্রীষ্মের তরমুজের মতো জল ঠাণ্ডা, শীতে, পায়রার ডিমের মতো জলে ওম। এই রহস্যটার খবরও মনে হত তখন পৃথিবীতে আমি আর বঁদু বাদে কেউ জানত না। তার দাদা জল তুলছে, সে জল না তুলে থাকে কি করে! আমি টিউকলটার কাছে ছুটে গিয়ে যা যা করতাম, অবিকল বঁদু তাই করত। সেই টিউকলের মাথাটা দেখা যাচ্ছে। এবারে কেন জানি টিউকলটার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করলাম না।

রাস্তার ধারে বড় একটা তেঁতুলগাছের নিচে টিউকল। লোকজন নেই কেন! এক, দু'জন ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে। বউ-ঝিরা জল নেয়। তারই ফাঁকে আমাদের জল টেপা জল খাওয়া। এতক্ষণে হয়ত পণ্ডুকাকা আর মা অনেকটা এগিয়ে গেছে,

এমন কি একবার তারা অনেকটা হেঁটে আখ ক্ষেতের আড়ালে অদৃশ্য হয়েও গিয়েছিল—কিন্তু আমরা দু-ভাই নাছোড়বান্দা। এত বড় মহৎ কাজের সুযোগ পেয়ে তা না করে যাই কি করে! লোকজন খালি না হলে লাফাতেও পারি না, জল তুলতেও পারি না। জল না খেয়ে গেলে মরুকে বলব কি! মরু বলেছিল, ওর পিসির যে-বাড়িতে বিয়ে হয়েছে, তার এক পিসশাশুড়ির জামাইয়ের বোনের বাড়িতে টিউকল আছে। কথা আছে মরু আর একটু বড় হলেই সেখানে যাবে। টিউকলে জল টেপার গৌরব অর্জন করা তার নাকি খুবই জরুরী দরকার। অন্তত এ-ব্যাপারে সে আমার থেকে পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়। এবারে সেটা আমার কাছে খুবই ছেলেমানুষী কাজ এমন মনে হল।

আমরা ইন্দারা দেখেছি। বাড়িতে ইন্দারা, প্রতাপ মাঝির বাড়িতে ইন্দারা। বিশ্বাস পাড়াতে ঢাকের কুয়ো। কুয়ো দেখারও অভ্যাস আছে। কিন্তু টিউকল একমাত্র মামাবাড়ি যাবার রাস্তাটায় বছরে দু-বছরে এক-আধবার দেখতে পাই, যেন এটার সঙ্গে আশ্চর্য সব আবিষ্কারের সূত্র জড়িয়ে আছে। সেই টিউকলটা থেকে কেউ জল নিচ্ছে না। আমার চেয়ে বঁদু বেশি অবাক। সে ছুটে গিয়ে দু-বার টিপল জল বের হল না। মরা গাছের মতো কিংবা কাঠের গুঁড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশটা শুকনো খটখটে। জল না থাকলে একটা টিউকল তো মরেই যেতে পারে। বঁদু বলল, ইস্, জল উঠছে না রে।

ইস্ কথাটা আমাদের লব্জ। বঁদু ইস্ বললে বোঝা যায় সে খুবই তাজ্জব হয়ে গেছে। বঁদু কেমন মনমরা হয়ে গেল। মরু গেলেই জিজ্ঞেস করবে, কিরে দাদা টিউকল থেকে জল খেলি! ঠাণ্ডা না গরম! টিউকলের মাহাত্ম্য কত! সেটা বড়রা কিছুতেই বোঝেনা। শীতে হাত-পা কনকন করছে, জল টিপে দেখ উষ্ণ জল, গরমে আইঢাই প্রাণ, জল তুলে দেখ তরমুজের মতো ঠাণ্ডা। গাছের প্রাণ থাকে, টিউকলেরও প্রাণ থাকে। সে বুঝতে পারে মানুষ কখন কি চায়। এই একটা আবিষ্কার আমাকে মাঝে মাঝে একজন বাঙালী বিজ্ঞানীর প্রায় কাছাকাছি নিয়ে যেত। তিনি উদ্ভিদের প্রাণ আছে বলেছেন, আমি বলছি টিউকলেরও প্রাণ আছে। আর প্রাণ আছে বলেই এর শেষ আছে। কত আজগুবি ভাবনা যে মাথায় তখন আসত।

এই রাস্তাটার এত বড় খবর শেষ হয়ে গেল বলে বঁদু প্রায় যখন শোকে মূহ্যমান, তখনই দেখছি পঞ্চুকাকা বাক্স পেঁটরা মাথা থেকে নামিয়ে ছুটে আসছে। বঁদুর কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। কী যে অপরাধ, বঁদু বুঝতে পারছে না। পঞ্চুকাকা বুঝছে না, কত বড় একজন বিজ্ঞানীর কান ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! আগের মতো আর ছোট নেই বঁদু। বড় হয়ে গেছে। ক্লাশ এইটে উঠেছে। হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বঁদু বলল, কান ছাড় বলছি!

কান ছাড়ব তোর। দাঁড়া দেখাচ্ছি। কখন থেকে ডাকছি। কিছুতেই সাড়া নেই বাবুদের! তোরা এখানে কি করছিলি! কখন যাবি মামাবাড়ি। রোদ উঠে গেলে আর হাঁটতে পারবি! কত করে বলছি, পিছিয়ে পড়বি না, কে কার কথা শোনে। বলে পঞ্চুকাকা কান ছেড়ে দিয়ে আবার হনহন করে হেঁটে যেতে থাকল।

কাকা আমার বড় গোঁয়ার মানুষ। একখানা লুঙ্গি আর গেঞ্জি সার। শীত-গ্রীষ্মে এর চেয়ে বেশি তার লাগে না। গাট্টাগোট্টা মানুষ। ঘুমায় কম, খায় বেশি। তারও একটা আবিষ্কার আছে। বেশি ঘুমালে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বাড়ির গোয়ালে, খেজুর গাছের রস নামানো, জমিতে লাঙ্গল দেওয়া থেকে সব কাজ ওই মানুষটা করে। সবাই শুলে বৈঠকখানা ঘরে শোয়। শুতে শুতে রাত বারটা, উঠে পড়ে চারটায়। নিজেই ওঠে না, আমাদেরও উঠিয়ে ছাড়ে। লম্বা ফরাসে আমাদের আট-দশটি খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাইয়ের বিছানা। তার থেকে গজ দুই দূরে পঞ্চুকাকার কাঁথা বালিশ আর নাসিকা-গর্জন। মানুষ অভ্যেসের দাস। আমরা তার নাসিকা গর্জন টের পাই না। তিনি যে গর্জন করেন টের পেয়েছিলাম, ডোকাদির নলিনীকাকা বেড়াতে এলে। ভজন, কীর্তন গায়। ঢাকার রেডিও আর্টিস্ট। ক'দিন থাকার কথা। কিন্তু সকালে উঠেই হাই তুলতে থাকলেন, আর বলতে থাকলেন, পঞ্চু রাতে তো অনেক উপকার করেছ। সকালে আর একটা উপকার করবে?

আমরা জানি পঞ্চুকাকার উপকার করার নেশা আছে। কিন্তু রাতে কি একখানা উপকার করেছে পঞ্চুকাকা বুঝতে না পেরে কেমন ক্যাবলাকান্ত চোখে বলেছিল, আজ্ঞে আর একটা উপকার।

হ্যাঁ রে ভাই। মেহেরবাণী করে লটবহরগুলো বারদী স্টিমারঘাটে দিয়ে আসবে।

আজই চলে যাবেন কর্তা!

হ্যাঁ রে ভাই। আজই চলে যাব।

বাড়িতে বলেছেন।

আগে তোমার সম্মতি পাই।

তা দিয়ে আসব'খন।

কিন্তু পরে নলিনীকাকা চলে যাবার পর বিষয়টা পরিষ্কার হতেই খুব ম্রিয়মান হয়ে গিয়েছিল পঞ্চুকাকা। তার নাসিকা গর্জনে যে বাঁধা গরু ছুটে পালায় সেটা প্রথম আবিষ্কার করে কেমন ক'দিন খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দিয়েছিল! ভাত দিতে গেলেই বলত, মুখে রুচি নেই। আর দেবেন না ঠাকরুন! ঘুমের মধ্যে কখন মরে থাকবো জানি না। নিজের গর্জন নিজে শুনতে পাই না। কেমন বেহুঁশ কন তবে!

ঘুমালে তো নাক ডাকবেই।

ভাল লক্ষণ না।

মা জেঠিমা বলত, তুমি খাও পঞ্চু। আর দুটো ভাত নাও। ওটা কোন অসুখ না।

পঞ্চুকাকার বিশ্বাস এক রকমের, মা জেঠিদের বিশ্বাস এক রকমের। তাদের কথা পঞ্চুকাকা মানবে কেন! বলেছিল না ঠাকরুন তরল ঘুমে রক্ত তরল থাকে। চোর বাটপাড় বাড়ি ঢুকতে সাহস পায় না। যদি এই হয়, আমারে পাহারা দিতে একজন, তার যদি এই হয়, তারে পাহারা দিতে আর একজন—এটা ভাল কথা না, বড় ঠাকরুন। রক্ত জমে গিয়ে দেখবেন সত্যি একদিন শেষে আপনাদের পঞ্চু মরে পড়ে থাকবে।

ফলে কিছুদিন দেখেছিলাম পঞ্চুকাকা বিছানায় যেতেই ভয় পায়। ঘুমের অতলে ডুবে গেলে ফের যদি আর জেগে না ওঠে। ওতে বিড়ম্বনা আমাদের আরও বাড়ে। রাত না পোহাতেই ডেকে তোলা, এই ওঠ। হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বস। ঠেলাঠেলি করে, না উঠলে টেনে হিঁচড়ে বিছানার বার করে, দরকার হলে ঘরের বার করে দাঁড় করিয়ে রাখা। মেজদা গোলক একটু ত্যাঁদড় ধরনের। দাঁড় করিয়ে দিলেই হয় না। ধরে রাখতে হয়। ঘুমের ঘোরে দাঁড়িয়ে আছে। পড়ে যেতে পারে ভয়ে পঞ্চুকাকা ডাকে, এই গোলক, তুই দাঁড়িয়ে আছিস বুঝতে পারছিস না। ওফ্ কতক্ষণ ধরে থাকব। শেষে না পেরে চেচাঁমেচি— ও দুদুকর্তা গোলকও জাগছে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। গোলকের তখন আর জারিজুরি থাকে না। সংসারে পয়লা নম্বরের মনিব বলে কথা! তিনি গোলকের বেয়াদপি সহ্য করবেন কেন। আগাপাশতলা মেরামত করে দিতে তাঁর মতো কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি সংসারে কমই দেখা যায়। সুতরাং গোলকের তখন এমনিতেই ঘুম ভেঙে যায়। হাত সরিয়ে বলে, ছাড় বলছি।

পঞ্চুকাকার ধড়ে তখন প্রাণ আসে। তালে গোলক জেগেছে। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে মরে যায়নি। পঞ্চুকাকার তখন ভারী উজ্জ্বল মুখ। খাটাখাটনিতে উৎসাহ জন্মে। রাত এলেই আবার ব্যামো। ঘুম আসে না। শেষে এক ফকির এসে ওকে বলে গিয়েছিল, পঞ্চু ঘুম হল গে বেহস্তের দরজা। তারে এত ভয় পাও কেন! একটা পাথর গলায় ধারণ করতে বলে গেল। গলায় পাথর ধারণ করে পঞ্চুকাকা ব্যামো থেকে ছাড়া পেল ঠিক, কিন্তু ভবি ভুলল না। ভেবেছিলাম, বেলা করে ওঠা যাবে। কাকস্য পরিবেদনা—কে কারে রক্ষা করে, রাত না পোহাতেই ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে যায়। পঞ্চুকাকার এটা একটা নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ে। তিনি বিছানা সাফ না করে ঘর থেকে বের হন কি করে। বিছানা তুলে, ঘর ঝাঁট দিয়ে তবে তার বের হওয়া।

কাছে যেতেই মা বলল, হ্যাঁ রে গোলা, তোদের এভাবে টেনেটুনে নিয়ে গেলে যাবটা কখন। ধর বুচনকে। বুচন আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বুচনকে কাঁধে

তুলে হাঁটায় বড় অসুবিধা হল, আমি নিজে কিছু আর ভাল করে দেখতে পাই না। আশেপাশে তাকালেই ঘাড় বাঁকাতে হয়। বুচন তো বুকে পা দাপড়াচ্ছে। তার কত মজা। পাখি উড়ে যাচ্ছে। বুচন পাখি দেখতে দেখতে হাতে নাচাচ্ছে। আমার ঘাড় শক্ত হয়ে যাচ্ছে বুচন বুঝতে পারছে না।আমরা বামনদির চকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এখন এখানটায় শুধু দিগন্তব্যাপী আখের জমি। সবুজ হয়ে আছে। কিংবা মনে হয় সবুজ এক সমুদ্র ছেয়ে আছে দিগন্ত। আর দূরে সেই অতিকায় এক নিমগাছ। গাছটা দেখারও আগ্রহ। কেন যে গাছটার নিচ দিয়ে গেলে মনে হয় দ্বাপর যুগে এসে গেছি। গাছটার নিচে কোন এক ব্যাধ দাঁড়িয়ে। উপরে কেউ আছে কি নেই বোঝা যায় না। বাঁশি কেউ বাজায় কি না জানা যায় না। শুধু রক্তাভ পায়ের পাতা দেখা যায়। পাখি ভেবে শর নিক্ষেপ। গাছটার কাছে গেলে আমার এমনই একটা ছবি ভেসে ওঠে। এই কিছুক্ষণ আগে যেন যদুবংশ এখানে শেষবারের মতো ধ্বংস হয়ে গেল। এবারে আমার সে-সবের কিছুই মনে পড়ল না।

বঁদুই বলল, দাদা ঐ যে রে নিম গাছটা!

ঘাড় তুলে দেখতে হবে। বুচনকে নামিয়ে ঘাড় তুলে দেখলাম।

এখন বঁদুই এদিক ওদিক কি আছে দেখার, বলে যাবে। কারণ সে জানে মা দাদার ঘাড়ে বোনকে চাপিয়ে জব্দ রেখেছে। শত হলেও ছোট ভাই, তার সামান্য হলেও ভক্তি থাকা দরকার। বাড়িতে বিকালে বড় জামগাছের নিচে ঠাকুমা তার সখী পরিবৃত হয়ে রামায়ণ পাঠ শোনেন, মহাভারত পাঠ শোনেন—কাজটা আমাদের পালা করা আছে। স্কুল থেকে ফিরে বড়দা, পরের দিন মেজদা, পালা করে সপ্তাহ চলে। বঁদুকেও একদিন পড়তে হয় হপ্তায়। দুদুকাকার অর্ডার, আমার বাবা জেঠারা বড় মাতৃগত প্রাণ না মা অনুগত প্রাণ কি বলে—শিরোধার্য শব্দটিও শোনা যায়, এমন সব কঠিন শব্দ বাবা জেঠারা বলতে অভ্যস্ত। আমরা তাঁদের রক্তবীজের ঝাড়—দোষ থাকবেই। বঁদুরও যতক্ষণ স্বার্থে সংঘাত দেখা না দেয় দাদাকে মান্য করার স্বভাব। আখক্ষেতের বাইরে বের হতেই বলল, ওরে দাদা শ্যাওড়া গাছটা দেখ কারা কেটে ফেলেছে। সুমার মাঠের শ্যাওড়া গাছটিও আমাদের যাবার রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে থাকে। মাথা তার অজস্র স্বর্ণলতায় ঢাকা। মনে হত সেই রামায়ণ মহাভারতের আমল থেকে সে দাঁড়িয়ে আছে বড় একটা সোনার ছাতা মাথায় দিয়ে। যেন বলে, কি রে গোলা ভাইকে সঙ্গে নিয়ে মামাবাড়ি যাচ্ছিস?

বঁদু বলল, এবারে কি যে হবে! টিউকলটা শেষ। মাঠের সৌন্দর্য, গাছটা। তাও কারা কেটে নিয়ে গেছে। এবারে মামাবাড়ি সফরে এত সব অলক্ষুণে ঘটনা শেষ পর্যন্ত আমাকে বঁদুকে না কোথায় টেনে নিয়ে যায়! মনটা তার ভারি দমে গেল।

গাছটা নেই কেমন খাঁ খাঁ করছে মাঠ। একটা গাছ একটা মাঠ মানুষের এত প্রিয় হতে পারে আমার মামাবাড়ির রাস্তায় কেউ না গেলে তা টের পাবে না।

বাড়ি থেকে মামাবাড়ি আড়াই ক্রোশের মতো পথ। পথের দুপাশে কোন ঋতুতে কি ফসল হয় সব আমরা জানি। যেমন ডাঙা জমিগুলোতে এখন, লঙ্কার চাষ হচ্ছে, পটলের চাষ হচ্ছে। আলুর লতা বাড়ছে। মানুষ তো বসে থাকে না। জমিও বসে নেই। কার কত উর্বরা শক্তি চাষবাসে বোঝা যায়। গাঁয়ের মাঝখানে যে রাস্তা, সেখানে থাকে বাঁশের ঝাড়, একটা পিটকিলা গাছে অসংখ্য বাদুড় ঝুলে থাকে। আর আশ্চর্য কিচির কিচির শব্দ। ওরা দিনে দেখতে পায় না। আগে বঁদু গাছটার নিচ দিয়ে যাবার সময় ঢিল কুড়িয়ে নিত। ঢিল ছুঁড়ত। কিন্তু চোখে দেখতে না পেলে সে আনধা। অরে মারতে নেই।

আমার বাবা একবার সঙ্গে ছিলেন। তিনিই বলেছিলেন, মেরো না। দিনের বেলায় ওরা দেখতে পায় না।

আমরা বুঝে ফেললাম, বাদুড় অবলা জীবের মধ্যে পড়ে। সে পাখি নয়। তাও বাবা বুঝিয়ে দিলেন। সেই থেকে বঁদু আর ঢিল মারে না। ঠাকুরদা আমাদের অন্ধ মানুষ। তাঁকে আমরা সকালে গোপাটে নিয়ে যাই, কখনও বটগাছের তলায় বসিয়ে লুকোচুরি খেলি। ঠাকুরদা তখন রাজার রাজা। আসলে ঠাকুরদার অসহায় মুখ তখন আমাদের চোখে ভেসে ওঠে। আমরা আর ওগুলো ঢিল মেরে তাড়াবার চেষ্টা করি না। কিন্তু এবারে দেখলাম, কোথায় তারা উড়ে গেছে। বঁদুর নানা রকম প্রশ্ন করার বাতিক। সে বলল, পঞ্চুকাকা, বাদুড়গুলো গেল কোথায়!

পঞ্চুকাকা বলল, ফকিরের দরগায়। তোদের মত শয়তান ছেলেপুলের তো অভাব নেই, এই দুনিয়ায়। তারাই তাড়িয়েছে।

তুমি জান ঠিক ফকিরের দরগায় গেছে।

জানব না কেন। ফকির দরবেশ বলতে কথা। তার দরগা। কত গাছপালা। সেখানে তারা যাবে না তো কোথায় যাবে!

আমরা বুঝতে পারি ঐ যে বলে গিয়েছিল, ঘুম হলগে বেহেস্তের দরজা, তার প্রতি অগাধ বিশ্বাস হেতু পঞ্চুকাকার এই ধারণা। পঞ্চুকাকার তখন বড় অসহায় অবস্থা। বিপন্ন। ভয়ে বিছানায় যান না, ফকির তাকে পাথর না দিলে কে জানে পাগল বনে যেতেন কি না। ফকির তাঁকে রক্ষা করেছে। বাদুড়ের দলও অসহায় দিনের বেলায়। আস্তানা তাদের কোন ফকিরের দরগায় না হয়ে যায় না। এ-বড় তার অকাট্য যুক্তি। খোদ আল্লা এসে বললেও যেন সে তার বিশ্বাস থেকে এক পা নড়বে না। বৃথা তর্ক জুড়বে। না পারলে শেষ পর্যন্ত কান টেনে বলবে,

সকালে আজ আবার দাঁত মাজিসনি। দাঁতে ছাতা পড়ে আছে দেখছি।

যেহেতু পঞ্চুকাকা বাড়ির দু নম্বর মনিব, তাই তার এ-সব বিষয়ে সতর্ক থাকার কথা। যতই বলি না কেন, দাঁত মেজেছি, দেখ না দাঁত, ততই রেগে কাঁই।—আবার মিছে কথা। দেব এক চড়।

আমাদের তিন নম্বর মনিব হরকুমার দাঁড়িয়ে তখন মজা দেখে। হরকুমার বড়দার বয়সী। তার কাজ শুধু দুদুকাকার কাছে চুকলি কাটা। তারই আসার কথা। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে মার লটবহর একটু বেশি বলে দুদুকাকা পঞ্চুকাকাকে সঙ্গে দিয়েছে। যেমন দরকারে পঞ্চুকাকা বুচনকেও এক হাতে কাঁখে নিয়ে মাথায় বাকস পেঁটরা নিয়ে মাইলখানেক রাস্তা অনায়াসে হেঁটে যেতে পারে। হরকুমার পারে না। গায়ে বল কম। সেই তিন নম্বর মনিব সঙ্গে থাকলে বিপদও ঘটতে পারে এই শঙ্কা দুদুকাকার মনে উদয় হতে পারে। কারণ ক্ষেপে গেলে ওর সঙ্গে আমাদের হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। বিষয়টা জানা আছে বলেই পথিমধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে সেজ বৌঠানকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলতে চায়নি।

পড়ার সময় আমরা পঞ্চপাণ্ডব, (বঁদু এখনও বাদ) সে ষষ্ঠ। তার ষষ্ঠত্বের জন্য তাকে এখন দলভুক্ত করে পঞ্চপাণ্ডবের খ্যাতি খোয়ানো যাচ্ছে না। হরকুমারের নজর পঞ্চপাণ্ডবের উপর। বৈঠকখানায়, পড়ার ঘরে, খেলার মাঠে সর্বত্র সে নজরে রাখে। এমন কি কোনো ট্রফিতে আমাদের হায়ার করে নিয়ে গেলেও সে দর্শক হিসাবে হাজির থাকে। বেথুন ফল চুরি করার সময় আমরা যতই সতর্ক থাকি না কেন, ঠিক তার নজরে চলে আসে। যুদ্ধের বাজারে কেরোসিন তেল পাওয়া যাচ্ছে না, না পাওয়া গেলেও ভাল মাস্টার-মশাই এসে দেখবেন অন্ধকার, পড়ান কী করে। সুতরাং ছুটি। সেই ছুটি মাটি করে দেবার জন্য তার তখন কেরোসিন তেল সংগ্রহে একজন সৈন্যের মতো তড়পানি চলে। হরকুমার জানে আমরা পাঠ্য পুস্তকের ভারে কাবু। তার ভয়ে কাবু। কেন যে এই নির্যাতন তাও বুঝি না। সকাল বেলা, রাতের বেলা, দিনের বেলা সব সময় পড়ার মধ্যে থাকা কাঁহাতক ভাল লাগে। হরকুমার কিছুতেই চায় না তেলের অভাবে রাতের পড়া মাটি হোক। সে একবার দশ ক্রোশ ঠেঙিয়ে নসিন্দির বাজার থেকে পুরো এক টিন কেরোসিন তেল মাথায় করে এনেছিল। সে তার দৈহিক পরিশ্রমের কথা ভুলে গিয়েছিল। খিদে তেষ্টার কথা ভুলে গেছিল। এমন কি বাড়ি এসে কেরোসিন তেলের টিন নামাবার সময় আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ছিল।

এত বড় নির্যাতনের পরও বড় অসহায় আমরা। হরকুমারকে কিছু করতে পারি না। কিছু বলতে পারি না। কারণ সে আমাদের বাড়ির তিন নম্বর মনিব। দুদুকাকার বড় বিশ্বাসভাজন। যা বলবে তাই দুদুকাকা গৃহদেবতার মতো সত্য বলে মেনে নেবে।

এ হেন অবস্থায় থেকে যারা মুক্তি পায় তখনও তারাই জানে মামার বাড়ি যাবার রাস্তায় কত মজা থাকে। এবারে যেন রাস্তার সেই মজাটুকু আমি খুঁজে পাচ্ছি না। সামনের মসজিদ পার হলেই গোরস্থান। মাঠের মধ্যে ছোট ছোট টিবি। কোথাও বৃষ্টির জলে মাটি ধুয়ে গেছে। মাচার মতো ফালি বাঁশ বুকের হাড়ের মতো জেগে আছে। গা ছমছম করে। তখন আর দূরে থাকি না। মার গা ঘেঁষে হাঁটা। এত যে মজা রাস্তাটায় তা যেন নিমেষে কেমন উবে যায়। পণ্টুকাকা বুঝতে পারে, এখন আমরা খুব ভাল ছেলে। তখন তার বুঝি মায়া হয়। আমাদের সাহস দেয়, ডরাস্ না। আমার কেন জানি এবারে তেমন গা ছমছমও করছে না।

বঁদু বলে, দেখ পণ্টুকাকা, কেমন ছোট একটা কবর। ঐ দেখ না, দেখছ না! সে পণ্টুকাকার সংলগ্ন হয়ে হাঁটে। তারপরে সামনে গিয়ে বলে, নতুন মাটিতে ঢাকা। চারপাশে কুলকাঁটার বেড়া। দেখ না!

কুলকাঁটার বেড়া কেন পণ্টুকাকা? আবার প্রশ্ন বঁদুর।

শেয়াল কুকুরে যদি খায়।

বঁদুর মধ্যে কেমন বৈরাগ্য দেখা দেয়। ঐ ছোট্ট কবরে বঁদুর মতো কেউ শুয়ে আছে। যেন মাটি সরালেই তার মুখ দেখা যাবে। মামাবাড়ি যাওয়ার আনন্দটা প্রতিবার এখানটায় এলে কেমন মাটি হয়ে যায় বঁদুর। সেই ছোট মানুষটির মা'র কী না কষ্ট! বঁদু একবার মেলায় হারিয়ে গেলে মার কি হাউ হাউ কান্না। আমারও। দুদুকাকা গাঁ থেকে নিকুঞ্জ ঢুলিকে পাঠিয়ে ঢোল দিতেই মেলায় মিলে গেল তাকে। বঁদুকে নাকি সেবারে সারাদিন কারা মিষ্টি খাইয়েছে। সবাই তাকে আদর করেছে। এটা শোনার পর মেলায় আমারও একবার ইচ্ছে হয়েছিল হারিয়ে যাই। হারিয়ে গেলে কাঁদতে হয় বঁদু জানত না। ফিরে এলে দেখা গেল তার কোন ভয় ভীতি নেই চোখে। সে যেন মামাবাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসেছে।

ছোট কবরটার দিকে বঁদু একবারই তাকিয়েছিল। ভয়ে পরে আর তাকায়নি। কুলকাঁটার মধ্যে মাটির গভীর অন্ধকারে শুয়ে থাকা কী না কষ্টের। ওর বুঝি মনে হয়, যাঃ এ হয় কখনও, ওভাবে শুয়ে থাকা যায়, সকালে সে একদিন ঠিক ওখান থেকে উঠে তার মায়ের কাছে চলে যাবে। মা ছাড়া ও থাকবে কি করে।

আমরা তা পারি না। একবার তো আমার গ্রীষ্মের পরীক্ষাই দেওয়া হল না। পরীক্ষার আগে পণ্টুকাকাই গিয়েছিল আনতে। মা আমাকে কত প্রলোভনে ফেলে রাজি করাল। খাওয়া দাওয়ার পর প্যান্ট শার্ট পরে পণ্টুকাকার সঙ্গে রওনা হলাম। সঙ্গে মরু। ধোপাবাড়ির মাঠটায় এসে আমার কেমন বুকটা খা খা করে উঠল। মাকে ছেড়ে আমি থাকব কি করে! আর সামলাতে পারলাম না। মাটিতে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলাম। মরু মামাবাড়ি খবর পৌঁছে দিল।—গোলা ধোপাবাড়ির

মাঠে বসে কাঁদছে। যাবে না বলছে।

দাদু এসে বলেছিল, পণ্টু তুমি যাও। ডালুকে বল, একবার পরীক্ষা না দিলে জীবনের এমন কিছু চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ হয়ে যায় না। মুহূর্তে সামনের আকাশটা ভারী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল আমার। মরু আমার হাত ধরে টানছিল। এই ওঠ। বসে আছিস কেন।

মরুর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, আমি যাচ্ছি না বলে সেও কম খুশি না। আমার কান্না দেখে সেও চোখের জল সামলাতে পারেনি। মরুর সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্বের কথা সেই প্রথম টের পেলাম। সে আমার বড় কাছের এমন মনে হয়েছিল।

এবার বটগাছ পার হয়ে গেলাম, মরুকে দেখতে পাচ্ছি না।

সামনে সাঁকোটা পার হলাম, মরুর দেখা নেই।

বঁদুর এবং আমার স্বভাব, এই সাঁকোটার অনেক উপরে উঠে পৃথিবীকে দেখা। সাঁকোর নিচে নেমে আবার একবার উঠে দেখা। দৌড়ে যাওয়া, কিংবা বাঁশের রেলিং ধরে দোল খাওয়া। বঁদু সবই করল, আমি কিছুই করতে পারলাম না। আর দু-পা হাঁটলে ভুঁইঞা বাড়ির সেই দিঘি। পাশে পথ। মা পণ্টুকাকা ততক্ষণে জমি ভেঙে ধোপাবাড়ির মাঠে উঠে গেছে। বঁদু দৌড়তে থাকল, আমি হেঁটে যেতে থাকলাম। মরু ঠিক খবর পেয়ে ছুটে আসবে। এই ছুটে আসার প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে অভিমানে কেমন চোখে জল এসে গেল। মনে হল মরু আমাকে বড় বেশি এড়িয়ে চলছে। আমরা কি বড় হয়ে গেছি।

আমি আর মরু সমান লম্বা। সমবয়সী। মরু আমার মামাবাড়ির জীবনে অনেকটা জায়গা জুড়ে। মরু বছর দুই স্কুল গেছে। তার পড়তে ভাল লাগে না। কারই বা লাগে। তবে মরুর মা বাবা পড়া নিয়ে জোরজার করেনি। বেশ আরামে আছে। দু বছরের উপর আমি মরুকে দেখিনি। দু বছরের সব খবর মরু আমার জন্য জমা করে রেখেছে। রাস্তা থেকেই তার গল্প শুরু হয়ে যায়। সেই মরুরই দেখা নেই। কেমন একা হয়ে গেছি মনে হচ্ছে। ভয় তাড়া করছে। কাউকে সামনে দেখতে পাচ্ছি না। আর দেরি করা ঠিক না। দৌড়ে ধোপাবাড়ি উঠে যেতেই খুশি মাসি বলল, কিরে কখন এলি! তোর মা এয়েছে! তুই একা।

খুশি মাসির কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। ঘন চুল। শ্যামলা রঙ—বড় সুন্দর দেখতে খুশি মাসি। বর নেয় না, বাপের বাড়িতেই থাকে। মা এসেছে শুনে এখুনি হয়ত মামার বাড়ি ছুটে যাবে। মরুর মতো খুশি মাসিও আমাকে খুব ভালবাসে। খুশি মাসিকে কতদিন দেখেছি, সবুজ মাঠটায় একা দাঁড়িয়ে আছে। বিকেলের হাওয়া বয়। চুল ওড়ে। কেমন এক নিঃসঙ্গ জীবন। আমাকে দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরে

বলল, কত বড় হয়ে গেছিস ! বলে চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয়। আমার কেমন লজ্জা করে তখন। খুশি মাসিকে ছেড়েছুড়ে দৌড়ে পালাই। খুশি মাসিটা কি ! আমি বড় হয়ে গেছি, খুশি মাসি বোঝে না !

কিন্তু যেতে দেয় না। বলে, এই গোলা শোন।

দাঁড়াই।

তোর ভাই এসেছে ?

মাথা নাড়ি।

ক'দিন থাকবি ?

জানি না।

তোর দাদুর বিয়ে। কবে যাবি সাম গাঁ।

কবে যাব আমি জানি না। খুশি মাসির বাড়িটা পার হলেই মরুদের ঘাটলা বাঁধানো পুকুর। পুকুরের এ-পাড়ে একটা কাঠের তক্তা। সকালে খুশি মাসি ওখানটায় দাঁড়িয়ে কত মানুষের কাপড় কাচে। রোদে শুকোয়। সন্ধ্যা হলে কাঠ কয়লার ইস্তিরি করে জামা প্যান্ট। খুশি মাসি গেলেই মা আমাদের জামা প্যান্ট বের করে খুশি মাসিকে কাচতে দেবে। আমার কেন জানি এবারে মনে হল রামী ধোপানীর কথা। চণ্ডীদাস নেই—কেবল কার আশায় যে রামী ধোপানী কাপড় মেলে যাচ্ছে সবুজ মাঠে। আসার সময় পুকুরের ও-পারে চোখ গেল। মনে হয় ও-পারে কেউ ছিপ ফেলে বসে আছে। কেউ থাকে না। তবু আমার কেন জানি, মাসিকে দেখেই ও-পারে চোখ চলে গেল। পাড়ে বেগুনের ক্ষেত। তারপর মামাদের মেত্রাঘাসের জঙ্গল। কাক শালিখ বাদে চোখে আর কিছু পড়ে না।

মরুদের বাড়ির পাশ দিয়ে এখন হেঁটে যাচ্ছি। মামাবাড়ি এলেই সবাই খবর পেয়ে যায়। গোলাপী ঘাটের শানে বসে গোপনে কি খাচ্ছিল। আমাকে দেখেই ছুটে এল। মরুর জ্যাঠার মেয়ে। ওর বাবার দুপতারার বাজারে পাটের আড়ত আছে। দু বিনুনি বাঁধা মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল। তারপর কোঁচড় থেকে কি তুলে আমার হাতে দিল। বলল, তুই কত বড় হয়ে গেছিস রে গোলা !—ওমা দেখি সিম বিচি ভাজা !

আমি খাচ্ছিলাম না। গোলাপী বলল, খা না খা। কি মুচমুচে খেয়ে দেখ।

গোলাপীকে আমি একবার চড়ুই ফল দিয়েছিলাম খেতে। মরু সঙ্গে ছিল। গোলাপীর সঙ্গে মরু আসত। চড়ুই ফল পাড়তে মরু ওস্তাদ। সে আমার সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে নিনিদের বাগান থেকে চড়ুই ফল সংগ্রহ করত। টক টক মিষ্টি মিষ্টি। মেজেন্টা রঙ পাকলে, পুঁতিদানার মতো গুচ্ছ গুচ্ছ ঝুলে থাকে। মরু গোলাপীকে

একটাও দিত না। বোকার মতো নিচে দাঁড়িয়ে থাকত। আমার কেমন কষ্ট হত গোলাপীর জন্য। যত কষ্ট হত তত মরুর রাগ বাড়ত আমার ওপর। কখনও বলত, আড়ি তোর সঙ্গে। অকারণ রাগে মনে হত আমার মরু বড় হিংসুটে। আমারও রাগ বাড়ত। চড়ুই ফলের খবর মরুই দিত, বলতাম, আমার সঙ্গে তুই আসিস কেন ?

তোর সঙ্গে আমি এসেছি, না তুই আমার সঙ্গে এসেছিস !

আমিই তো বললাম, চল, নিনিদের বাগানে।

মিথ্যুক কোথাকার !

আমি মিথ্যুক না তুই মিথ্যুক !

তুই মিথ্যুক।

এমনিভাবে এক কথায় দু-কথায় ঝগড়া চরমে উঠলে গোলাপীকে বলতাম, চলরে, ওর সঙ্গে আমরা আর আসব না।

যা, চলে যা। এখুনি চলে যা। আমাদের গাঁয়ে তুই মরতে আসিস কেন !

একশ বার আসব। আমার মামাবাড়ি, আমি আসব।

লজ্জা করে না ! মামাবাড়ি না ছাই। আসলে তোর যাবারই জায়গা নেই কোথাও। কথাটা আমার খুব লাগত। গোলাপীকে বলতাম, এই গোলাপী আয়রে।

ওকে নিয়ে হাঁটা দিলে মরু পা ছড়িয়ে বসে থাকত। পকেট থেকে চড়ুই ফল এক এক করে সব ছুঁড়ে ফেলে দিত। তাতেও রাগ পড়ত না। চড়ুই ফলগুলি মাটিতে ফেলে পায়ে চেপ্টে দিত। খা খা। মর মর। তারপর বসে পড়ে হাউ হাউ করে কান্না। ওকে একা ফেলে তখন আমরা ছুটে পালাতাম। সে তবু পেছন ছাড়ত না। বাড়ি এসে মাকে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলত—আমাকে পিসি গোলা হাত কামড়ে দিয়েছে। বলেই হাতটা তুলে দেখিয়েছিল মাকে।

অ্যাঁ কি করেছিস গোলা ! তুই মানুষ নয় ! এ-ভাবে কেউ কামড়ায়। দৌড়ে এসে মা আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে দেখাল—মরুর হাত। তারপর মার চিৎকার এবং সঙ্গে প্রহার।—এ ছেলে দিয়ে আমার কি হবে ! মরে যা। আমার মরণ হয় না কেন ভগবান !

যত বলি আমি করিনি, মা কিছুতেই তা বিশ্বাস করে না। মারলে আমার চোখে জল থাকে না। কেমন বেয়াড়া হয়ে উঠলাম। রাগে দুঃখে ক্ষেপে শেষে বলতাম, কামড়েছি বেশ করেছি। আমার কাছে এলে আবার কামড়ে দেব।

মা তখন মরুকে নিয়ে পড়েছে। হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে বলছে, এত করে বলি, গুণ্ডাটার সঙ্গে তুই যাবি না। ধিঙ্গি মেয়ে কোথাকার ! তুই তো বড় হয়েছিস। তোর লজ্জা করে না, তুই মেয়ে হয়ে ওর সঙ্গে টো টো করে ঘুরে বেড়াস !

মরু সহসা কেমন হয়ে গিয়েছিল। একটা কথাও না বলে দৌড়ে চলে গিয়েছিল। পরদিন সকালে, দেখি মরু কালীবাড়ির পথে মাটি খুঁড়ে কি বের করছে। মামাবাড়ি থেকে কালীবাড়ির পথটার সবটা দেখা যায়। আসলে সে সেখানে বসে আছে কোনো বদ মতলবে। আমি আর মিশছি না। মা যে-ভাবে বলল, তাতে আমারও কেমন সম্মানবোধে লেগেছে। আমি যেন মার খারাপ হয়ে যাওয়া ছেলে!

মরু অনেকক্ষণ একইভাবে বসেছিল। মাথা ন্যাড়া। খালি পা। লম্বা হাফশার্ট গায়ে। দেখলে কিছুতেই মনে হয় না সে মেয়ে। ভাব করার অভিসন্ধি টের পেয়ে ছোটমামার সঙ্গে কাঠবাদাম পাড়তে স্কুলের মাঠে চলে গেলাম।

বিকালে দেখি আবার সেই কালীবাড়ির পথটায় মরু গোলাপী বিনু নিনি এক্কা দোক্কা দেখছে। মরু আসলে চাইছিল, আমি যাই। কিন্তু যখন যাচ্ছি না, বঁদুকে নিয়ে উঠোনে, একটা ছোট লম্বা তক্তা কেটে ব্যাট বানাচ্ছি তখন সে নিজেই এল। যেন আমাকে দেখছে না। বলল, ঠাকুমা জল খাব।

জলের গেলাসটা মুখে নিয়ে দেখলাম মরু আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বড় অসহায় চোখ। যেন ক্ষমা ভিক্ষা চাইছে। জলটা খেয়ে কাছে এল। বলল, গোলা যাবি?

আমি কথা বললাম না। কারণ তখন মরুর সঙ্গে আমার কথা বলার সময় নেই। ছোটমামা গেছে স্কুলে। কাঠ বের করে দিয়ে গেছে। একটা গোল সুপারি। কাঠ দিয়ে ব্যাট বানাবার আমার দায়িত্ব। সুপারির চারপাশে কাপড়ের পাড় পেঁচিয়ে বল বানানোর কাজ সব আমার। বলে গেছে স্কুলের মাঠে ব্যাটবল খেলা হবে। এই কাজগুলি করে না রাখলে ছোটমামা আমাকে বঁদুকে খেলতে দেবে না।

খুব মনোযোগ সহকারে কাজ করলে যা হয়, কথার জবাব না দিলেও চলে। যতই মনোযোগ থাকুক, আমি কিন্তু মরুর সব লক্ষ্য করেছি গোপনে। ধিঙ্গি মেয়ে জানার পরই ওর প্রতি আমার কেমন একটা কৌতূহল জন্মে গিয়েছিল। বড় হতে হতে চারপাশের কত কিছু যে টের পাচ্ছি।

বঁদুকে তাড়া লাগালাম।—এই যা না, অ দিদিমা সূঁচ সোতা দেও। ও ছোটমাসি দেনা রে। ছোটমাসি মুখ ভেংচে চলে গিয়েছে। কিন্তু মরু নড়ছে না।

মরু আমার পাশে দাঁড়িয়ে। বড় নিবিষ্ট মনে কাজ দেখছে। সূঁচসূতোর কথা বলতেই সে দৌড়ে গেল, তারপর আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এল। সুতো পরিয়ে বলছিল, নে।

আর কথা না বলে থাকা যায় না। মরু নিজেও জানে ব্যাট বল কি করে বানাতে হয়। সে নিজেও খেলে। মরু ভারি সুন্দর করে সেবারে সুপারির চারপাশে গোল করে পাড় পেঁচিয়ে ব্যাটবল সেলাই করে এনেছিল।

সে আমার কোন কথার অপেক্ষা না করে ব্যাট বলটা বানাতে বসে গেল। তাড়াতাড়ি বানাতে পারলে, মামা স্কুল থেকে আসার ফাঁকে, কাঠ-বাগানের মাঠে একচোট খেলে নিতে পারব আমরা। বঁদুটা হাঁদা। ওকে দিয়ে কিছু হয় না। বরং সে পাশে বসে দাদার কাজ নিবিষ্ট মনে দেখতে ভালবাসে।

মরুর সঙ্গে আমার যেন কিছুই হয়নি। মরুর ব্যবহারে এমনই মনে হচ্ছিল। সে যে ধিঙ্গি মেয়ে তাও ভুলে গেছে। মাথা-ন্যাড়া বললে সে রাগ করে না। ও ন্যাড়া তুই বেলতলা যাবি না বললে হাসে। অথচ সেই মরুর কি না দুর্জয় জেদ। আমাকে অপদস্থ করার জন্য নিজের হাত কামড়ে রক্ত বের করেছে। কে বলবে সেই মরু আমার পাশে বসে বল সেলাই করছে। একেবারে গোল বল। বেশি বড় না। ছোটও না। তারপর ব্যাটটা নিয়ে বসে গেল। চেঁছে চেঁছে হ্যান্ডেলটা গোল করল। আমি কিছু বলার আগেই মরু বঁদুকে বলল, এই বল কর না, মারি।

তারপর মরু আমার তোয়াক্কা না করেই ব্যাট বল নিয়ে হাঁটা দেবার সময় বলেছিল এই বঁদু আয়।

আমাকে ডাকল না। বারে আচ্ছা মেয়ে! যেন ব্যাট বলটা মরুর। সে আমাদের দয়া করে খেলার জন্যে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে।

আর সহ্য হয়নি। হাত থেকে ব্যাট ছিনিয়ে নিয়ে বললাম, এখন যাব না। ছোটমামা বকবে।

মরুর চোখ আশ্চর্য করুণ। মাথা নিচু করে বলেছিল, তোর ছোটমামাতো আমাকে খেলতে দেবে না। আমি তবে কার সঙ্গে খেলব?

এই হলগে ল্যাঠা মানুষের। মরু সত্যি খেলার সুযোগ পাবে না। অথচ কত সুন্দর করে বলটা সে বানিয়েছে। মরু না খেলতে পারলে, সারা বিকালটাই আমার মাটি। কারণ মরু বড় আশা নিয়ে এটা বানিয়েছে। সে আমাদের নিয়ে একটু খেলবে।

বলেছিলাম, দেখ কড়ার আছে একটা।

কি কড়ার?

মিছে কথা বলতে পারবি না। তুই বড় কানঠা।

কানঠামি আমি একা করি! তোরা করিস না?

সত্যি তো হাতে ব্যাট থাকলে সহজে কে ছাড়তে চায়। মরুর কথাবার্তায় সেদিন বড় আত্মসমর্পণের ভঙ্গী। চেঁচিয়ে কথা বলছে না। কেমন বিনীত স্বভাব তার। আস্তে আস্তে হাঁটছে। বোধ হয় আর খেলবে না। বঁদুর হাতে ব্যাট এবং বলটা দিয়ে বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে। সীতাফলের গাছটার নিচে গিয়ে একবার থামল, কিন্তু আমাদের দিকে তাকাল না। বঁদু বলল, দাদা, মরুকে ডাকব?

ডাক।

বঁদু দৌড়ে গিয়ে বলল, আয় আমাদের সঙ্গে খেলবি।
মরু হাত ছাড়িয়ে চলে যাবার আগে কি যেন বলে গেল। শুনতে পেলাম না।
বঁদু কাছে এলে বললাম, এল না যে!
ওর মা বকবে বলল।
বকবে কেন?
বকবে না, টো টো করে ঘুরে বেড়ালে বকবে না?
এতদিনতো বকেনি! অবশ্য বঁদুকে এ-সব বলার কোন অর্থ হয় না। সে আমার মতো বড়ই হয়নি, বুঝবে কি করে—মরুর আর বুঝি খেলার বয়স নেই। সে বড় হয়ে গেছে।

গোলাপী বলল, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস। বোস না, বোস। ঘাটলায় আয় বসি। তুই সিমভাজা খেতে ভালবাসতিস না!
গোলাপীর কথায় কেমন যেন সম্বিত ফিরে পেলাম। দুটো সিমবিচিভাজা মুখে দিয়ে বললাম, মরুকে বলিস আমি এয়েছি।
এমন কথা কেন বলতে গেলাম ঠিক বুঝতে পারলাম না! আমি নাইনে উঠেছি এটা একটা আমার কাছে বড় খবর। এই খবরটা এবারে মামাবাড়িতে সবাই পেয়ে যাবে। মরু এলে সেও পাবে। গোলা ক্লাস নাইনে উঠেছে জানলে, মরুর বুক গর্বে ভরে যাবে এমন বোধহয় আমার মনে হয়েছিল। তাছাড়া মরুই আমার স্বপ্নের কথাটা জানে। আর মা জানে, দু-জনের দু-রকমের মত। মরু বলেছিল, তুই আবার এলে জঙ্গলের মধ্যে গো-সাপটাকে খুজতে যাব। আমার ঠাকুরদা জানিস যকের ধন্ পেয়েছিল।
মরুর ঠাকুরদাদার খবর আমাদের সবাই রাখে। তেলেভাজার দোকান ছিল হাটে। তেলেভাজার দোকান থেকে কারো এত বড় তিনমহলা বাড়ি হয় না, ঘাটলা বাঁধানো পুকুর হয় না। গুপ্তধন না পেলে এত জাঁকজমক করে দোল-দুর্গোৎসবও হয় না। ঠাকুরদা তার সব করত। অবশ্য মরুদের শরিকি বাড়িতে এখন আর সে রমরমা নেই। মরুর ঠাকুরদাই কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করে দাদুর বাবাকে পুরোহিত করে নিয়ে এনেছিল নরাইল থেকে। দেবোত্তর জমিজমা সব দাদুর বাবার নামে লিখে দিয়েছিল।
এ-সব অবশ্য কবেকার কথা! মরুর বিশ্বাস, সেই পাবে আর একটা যকের ধনের খবর। মরুর বাবা নিজের ভাগে বাড়ির এক পাশে দু কোঠার একটা অংশ পেয়েছে। পলেস্তারা খসা। চুনকাম করা হয় না কতকাল। নোনা লেগে ইট বের হয়ে আছে দেয়ালে। ওর বাবা একটা ঘরে লেড়ো বিসকুট বানায়। বড় একটা মাটির ঢিবি ভেতরে। বড় একটা কাঠের হাতল দেওয়া বৈঠার মত কি একটা দিয়ে

ফুটো করা টিনের পাতে বিসকুটে ছাপ মেরে তাতে ঢুকিয়ে দেয়। অতিকায় উনুনের ভেতরে কাঠ কয়লা জ্বলে। ধোঁয়া আর কালিতে মরুদের ঘর দুটো সব সময় কেমন অন্ধকার থাকে। কাছারি ঘর একপাশে একটা। সেখানে মরুদের রান্নাবান্না। অনেকগুলি ভাইবোন। মরু দু-বেলা পেট পুরে খেতেও পায় না। খাবার লোভেই আমার মামাবাড়িতে পড়ে থাকার স্বভাব গড়ে উঠেছিল তার। সেই মরু আমার স্বপ্নের কথা শুনে চমকে গিয়েছিল। কেবল আমার সম্মতি ছিল না বলে, রথতলার মাঠের জঙ্গলে সে একা গিয়ে বসে থাকতে সাহস পায়নি। সোনালি রঙের গো-সাপ দুটোর আস্তানা খুঁজে পেলে ঠিক আবার একটা যকের ধন মিলে যাবে। গো-সাপ দুটোকে প্রায়ই দেখা যায়। তারা কোথায় থাকে জানা হয়নি শুধু তাকে অনুসরণ করা দরকার আমাদের। কিন্তু এত বড় জঙ্গলের মধ্যে আমিও একা যেতে সাহস পাইনি।
সেই মরুই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এখনও পাত্তা নেই।
আসলে আমার যত না বয়েস তার চেয়ে হাতে পায়ে লম্বা হয়ে গেছি বেশি। মা বলবে বাতাসে বাড়ছে।
আমার মধ্যে কেমন নাকি ভূতে পাওয়া রোগ আছে একটা। যে বয়সে যা, তাই মানায়। আমার বয়সের তুলনায় ছেলেমানুষীটা বেশি। এর দু-রকম প্রতিক্রিয়া ভোগ করতে হয়। যারা সুনজরে দেখে তাদের কাছে আমি একজন চঞ্চল বালক। যারা দেখে না, তাদের কাছে বজ্জাত ছেলে। গোঁ ধরলে নাকি সেটা আমার মাঝে মধ্যে মাথা খারাপ করে দেয়।
মরু আমার স্বভাব জানে, একবার মার উপর রাগ করে সারাদিন রথতলার জঙ্গলে লুকিয়েছিলাম। ক্ষুধায় কষ্ট পেয়েছি, ভ্রুক্ষেপ নেই। অভিমান বশে এটা। বোঝ মজা। আমাকে আর মারবে! খোঁজ এবার। কিন্তু মার জেদ প্রবল। দাদুকে বলেছিল, খবরদার বাবা, খোঁজাখুঁজি করবেন না। দেখি কতক্ষণ থাকতে পারে। সেবারে ডাকপিয়নের কাজটা মরুই করেছিল আমার হয়ে। তার বার বার, যেন খুঁজে না পেয়ে মাকে খবর দেওয়া, পিসি গোলাকে কালীবাড়িতে দেখলাম না। বাদামতলায় নেই। স্কুলের মাঠে নেই। লটকনের জঙ্গলে নেই।
মা একবার বিরক্ত হয়ে নাকি বলেছিল, তোকে খুঁজতে কে বলেছে।
দাদু না পেরে বলেছেন, তাই বলে খোঁজা হবে না! ছেলেমানুষ, কি দুর্মতি হয় শেষ পর্যন্ত.....
মা বলেছে, কিছু হবে না। বাপ যেমন ছেলেও তেমন। আমি সব জানি।
খসখস শব্দে টের পাই মরু আসছে। মা কতটা কাহিল জানা বড় দরকার। মরু জঙ্গলের ভিতর ঢুকে ফিসফিস গলায় ডাকত এই গোলা, তুই কোথায়। 'রা' করার নিয়ম নেই। গাছের ডাল নেড়ে জানালাম, এখানে।

কাছে এলে বলেছিলাম, কি বুঝলি !

কিচ্ছু না। দাদুকে পর্যন্ত শাসিয়েছে। খুঁজতে যাবে না। খিদে পেলে আপনি ঘরে ফিরে আসবে। কতক্ষণ পালিয়ে থাকতে পারে দেখুন না।

হা ভগবান ; আমার মা'টা এত নিষ্ঠুর ! বলেছিলাম, মরু কি করি বলত

মরু বলেছিল, সেই— বর্ষাকাল—থোকা থোকা লটকন ফল কোঁচড়ে মরুর। তাই দিয়ে বলল, এগুলি খা। খবরদার বের হবি না। দেখি পিসির জেদ কতক্ষণ থাকে। ছুতোনাতায় মারধোর করবে !

ইস, পিঠটা কি করেছে ! বলি গোলা তোরও জেদ বড়। কি দরকার ছিল পিসিকে ক্ষেপিয়ে দেবার ! বঁদুকে খামচে রক্ত বের করার কি দরকার ছিল !

কত কথা মনে পড়ে যায়। মরুকে না দেখে আমি সত্যি যেন মামাবাড়িতে একলা হয়ে গেছি। বললাম, বলিস কিন্তু।

গোলাপী বলল, বলব।

ওর কিছু হয়নি তো !

কি হবে আবার ?

না, এই অসুখ বিসুখ।

সিমবিচিভাজা কটা খেলি না ?

খাব। বলে কয়েকটা মুখে ফেললাম। বেশ সুস্বাদু খেতে। কিন্তু আজ কেমন বিস্বাদ লাগছে সব।

গোলাপী এবার কাছে এসে বলল, জানিস মরুর বিয়ে হবে ?

বিয়ে ! বলিস কি !

বারে, মরুর বিয়ে হবে না ?

ন্যাড়া মাথা মরুকে দেখে গেছি। হাফপ্যান্ট হাফ-শার্ট গায়ে দেখে গেছি। সে কবে মেয়ে হয়ে গেল বুঝতে পারিনি। আর এরই মধ্যে মরুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে ?

কোথায় বিয়ে হচ্ছে রে ?

বালিপাড়ার নরেশ কুণ্ডু আছে না, যার চালের আড়ত আছে।

বালিপাড়াতে অষ্টমী স্নানের বান্নিতে মার সঙ্গে কতবার গেছি। একবার মার কি মন হয়েছিল কে জানে—বড় বড় পুতুল কিনেছিল। কুকুর, মহাদেব, লক্ষ্মী, ঘোমটা দেওয়া চাষীবউ, বেড়াল, এমন অনেক পুতুলে গোটা ঝুড়ি ভরে গিয়েছিল। দাদুর অষ্টমী স্নানে তীর্থযাত্রীদের মন্ত্র পাঠ করাবার ফাঁকে মার হাত ধরে স্নানের মেলায় ঘুরে ঘুরে এই পুতুল কেনা।

দাদু মন্ত্র পাঠ করাচ্ছেন, কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ..... আমরা পুতুল কিনছি। মরু ছুটে যাচ্ছে, পিসি এখানে দেখ কি সুন্দর পুতুল। আয়না,

চিরুনি, পাউডারের কৌটা আলতার শিশি সবই মেলায় এলে কেনা দরকার। মরু মাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল। একটা বড় শেডের নিচে বসে আমরা গরম জিলিপি আর মুড়ি খেলাম। ঝুমঝুমি বাজনা, তাও মা বঁদুর জন্য কিনল। মেলার একটা দিকে লম্বা একটা ঘর—কি পেল্লাই, মা বলেছিল চালের আড়ত।

এত বড় আড়ত যার সে না জানি কত বড় মানুষ। বালিপাড়াতে সপ্তাহে দু বার হাট হয়। গঞ্জ মত জায়গা। সাহাদের কুণ্ডুদের প্রাসাদ নদীর পাড়ে পাড়ে। ভাঙা পাঁচিল, আর দুরে নদীর পাড় ধরে হেঁটে গেলে শ্মশান। সাধুবাবার মন্দির। শ্মশান এবং সাধুবাবার মন্দির দেখে আমার মনটা কেমন হয়ে গিয়েছিল। মরু তাহলে সে দেশটায় চলে যাবে। এমন সুন্দর একটা জায়গা, কালীবাড়ির রথতলা, সাঁকো পার হয়ে ধানের মাঠ, বকুল ফুলের গন্ধ এবং লটকন ফলের যে জগতে মরু মানুষ হয়েছে, বড় হয়েছে, বিয়ে হয়ে গেলে তার সেখান থেকে নির্বাসন ঘটবে। ভাবতেই মনটা বড় বিষণ্ন হয়ে গেল। মরুকে নিয়ে আর আমার গুপ্তধন খোঁজা হল না।

ঘাটলা পার হয়ে হেঁটে যাচ্ছি। গোলাপী আমার সঙ্গে হাঁটছে। কত কথা বলছে। পিসি ক'দিন থাকবে, আমি কতদিন থাকব। ওর বাবা নতুন নৌকা বানিয়েছে—ওদের যে লক্ষ্মী বলে চাকরটা ছিল সে নেই, এমন অনেক কথা আর ফেলামামার খবর। এবারেও ফেলামামা ফেল করায়, ফেলামামার মা দেয়ালে কপাল ঠুকে শোক করেছে : ওরে আমার ফেল্লারে তোর কি হবে রে বাবা ! তুই আমার এটা কি করলি ! মড়াকান্নায় সারাটা সকাল ভারী করে রেখেছিল পাল বাড়িটাকে, সে খবরও দিল গোলাপী। প্রতি বছর কলকাতা থেকে ফেলামামার ফেলের খবর এলেই ভয়ে মা মড়াকান্না জুড়ে দেয়। আমি যতবার মামাবাড়ি গেছি—ততবারই এই একটা খবর আমার মধ্যে আশ্চর্য পুলক সঞ্চার করত। কেউ না বললেও, নিজে থেকেই বলতাম, হ্যারে ফেলামামা পাশ করেছে !

মরুর স্বভাব যেমন, সে অবিকল নকল করে কাঁদতে বসত তার ধন ঠাকুমার হয়ে। শরিকি বাড়িতে মরুর ধন ঠাকুমার অবস্থাই এখন স্বচ্ছল। দুপতারার বাজারে ক্ষেত্র পালের তেজারতি কারবার। বড় সন্তান ফেলুচন্দ্র ম্যাট্রিক পাশ করার পরই কলকাতায় চলে গেল কলেজে পড়বে বলে। পড়ছিল ভাল। কি একটা পাশ দিয়ে ডাক্তারি পড়ছে। এই ডাক্তারি পড়া ফেলামামার জীবনে আর শেষ হবে না বোধহয়। আগে মড়াকান্না শুনলে লোকজন ছুটে যেত। এখন আর কেউ যায় না। কারণ জানে ফেলামামা পরীক্ষায় নির্ঘাত আবার ফেল করেছে। গিয়ে লাভ নেই। আর কতকাল কাঁহাতক সান্ত্বনা দেওয়া যায়।

খবরটা অন্যান্যবার মরুই আমাকে দিত। এবারে দিল গোলাপী। গোলাপী কি

বুঝেছে, আমার সহচরী মরু আর আমার সঙ্গে ঘুরবে না, আমি একা হয়ে গেছি মামবাড়ি এসে। গোলাপী মরুর জায়গাটা দখল করতে চায় হয়তো। গোলাপীকে যে এতদিন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছি, ঠিক খেলার সঙ্গী বলে মেনে নিতে পারিনি, এবারে বোধহয় সে তার বদলা নেবে। কারণ গোলাপী এবং তার ভাই নন্দ ইচ্ছে করলে মামাবাড়ির দেশটাকে একটা নতুন পৃথিবী তৈরি করে দিতে পারে—যেমন আমার কাছে বঁদু কিংবা ছোট মাসি, রাঙ্গা মাসি, তার তেমনি আছে একদল অপোগণ্ড—তারা সবাই মিলে না এলে বাদামতলার মাঠে ছোঁ-পলান্তি খেলার সঙ্গী পাওয়া যাবে না। অবশ্য আর একজন যে না আছে তা নয়, সে হলগে প্রাণকুমার মামার মেয়ে বিনু। বিনু আমাদের সঙ্গে অবশ্য কোনদিন খেলে না। আভিজাত্য ওদের একটু বেশি। প্রাণকুমার মামা নারায়ণগঞ্জের কোন একটা বড় স্কুলের হেড মাস্টার। নিজের হাতে বই লিখেছেন, বই বিক্রির টাকায় চারভিটিতে টিন কাঠের পাকা মেঝে দেওয়া ঘর। ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে আমাদের হাটে যেতে হয়। বিনুকে তখন দেখি, টেবিলে ঝুঁকে কি পড়ছে। ওর পড়াশোনায় মন বেশি, বিনুর ঠাকুমা আমাকে মাঝে মাঝে ভয় দেখায় ঠাকুর দেখাবে বলে। বিনুর ঠাকুমাকে দেখলেই আমি আগে দৌড়াতাম। মা ভয় দেখাত, জেঠি দাওতো ওকে ঠাকুর দেখিয়ে। ভুতের ভয় মানুষের থাকে, কিন্তু ঠাকুরের ভয় আমার কেন হত, সে-কথা বুঝিয়ে বলতে পারি না। কেবল একবার সাপ্টে ধরে আমাকে শুইয়ে দিয়ে আমার পেটের দু-পাশে সামান্য কাপড় তুলে বলেছিল, কি আর বাঁদরামি করবি, মাকে জ্বালাবি। বল, না হলে এক্ষুণি তোকে ঠাকুর দর্শন করাব। যত পা ফাঁক করে সাদা চুলের বুড়িটা সামান্য কাপড় তুলে আমার দিকে আসছিল, তত কি যেন এক আতঙ্কে আমি পাগলের মতো বলে উঠেছিলাম, না, না আর করব না। আর দেখব না। আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে ঠাকুর দেখিও না।

ঠিক করবি না?

সত্যি বলছি মাকে আর জ্বালাব না।

সেই ভয়টা কবে মনের ভেতর ধরিয়ে দিয়েছিল আমার মনে নেই, বোধহয় তখন আমি বঁদুর চেয়েও ছোট ছিলাম। সময় মানুষকে বড় করে দেয়—কিন্তু ভয় যায় না। যতই বিনুকে খেলতে ডাকবো ভাবি, কিন্তু ঠাকুর দেখার ভয়ে বিনুদের বাড়ি যেতে আর সাহস পেতাম না তখন।

বিনুকে না ডাকলে সে খেলতে আসবে কেন। বিনুর চোখ ভারি সুন্দর। কতটুকুন মেয়ে অথচ কি ছিমছাম থাকে। তাকে বাড়ির বাইরে বড় কম দেখা যায়। যখনই দেখা যায়, পায়ে সুন্দর প্রজাপতি আঁকা স্যান্ডেল। গায়ে হলুদ ফ্রক। লতা-পাতা, ফুল-ফল তাতে আঁকা। ছোট্ট দুটো বিনুনি মাথায়। ক্লিপ আঁটা প্রজাপতি। কখনও

লাল রিবন বাঁধা চুলে। ওর মা, মানে আমার মাসীমা, সব সময় এক হাত ঘোমটা। বাড়িতে আর কোন পুরুষ মানুষ নেই। বিনুর বাবা ছুটিছাটায় আসে। বিনুর জন্যে অনেক কত রকমের বই। একবারই মাত্র বিনুর পড়ার ঘরে আমি ঢুকতে পেরেছিলাম। বিনুর ঠাকুমা সেবারে কার সঙ্গে চন্দ্রনাথের মেলা দেখতে ক'দিন কোথায় চলে গিয়েছিল।

বিনু আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ডেকে। ওর এত সুন্দর সুন্দর বই আছে দেখিয়েছিল। ক্ষীরের পুতুল, ছড়ার বই, পশুপক্ষীর কথা এমনি সব বইয়ের নাম। ক্ষীরের পুতুল থেকে বিনু আমাকে পড়ে শুনিয়েছিল সুন্দর এক কাহিনী। তারপর সে আর একটা বই দেখালে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। জলছবির মতো চকচকে। মলাটে একটা সুন্দর মেয়ে দাঁড়িয়ে। তার পায়ের নিচে অদ্ভুত সব জীবজন্তু দাঁড়িয়ে আছে। বইটার নাম মনে করতে পারছি না। ওটা দেখে আমার মনে হয়েছিল, একদিন আমার কথাও সব পশুপাখি শুনবে। একটা কাঠবেড়ালের বাচ্চা ধরে এনে প্রথম তার উপর পরীক্ষা চালিয়েছিলাম। কিন্তু মুসকিল দেখা দিল, ছেড়ে দিলেই পালিয়ে যায়। গাছপালা দেখলে হারিয়ে যায়। হম্বিতম্বি চলল, আমার কথা শুনবে, না শুনলে তোমাকে খেতে দেব না, এ-সব ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও সে আমার পোষ মানল না। একবার সেই যে গাছ থেকে অন্য গাছের ডালে লাফিয়ে চলে গেল, আর খুঁজে পেলাম না। এ-সব মনে হলে ভাবি তখন আমি কত না ছেলেমানুষ ছিলাম!

মামাবাড়ির দেশটাতে আমার কেন জানি সব কিছুই আশ্চর্য লাগত! কেউ কারো চেয়ে কম নয়। বিনুকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরা যাবে না। ঘুরলে আবার সেই ঠাকুর দর্শনের ভয়ে পড়ে যেতে হতে পারে। চন্দ্রনাথের মেলা সেরে সেবারে বিনুর ঠাকুমা নিয়ে এসেছিল হলুদ রঙের সব বেতের লাঠি। লাঠিগুলির কোনোটার মাথা বাঁকা, কোনোটার মাথা ডালিমের মতো লাল। দাদুকে একটা লাঠি দিয়েছিল। দাদু আমাদের তা নিয়ে মাঝে মাঝে তাড়া করত। দাদু সেই লাঠির মুণ্ডুটা আবার রুপো নিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছে। বিনুর ঠাকুমাও লাঠি নিয়ে তাড়া করতে পারে। যেন আমরা তার কোনো বড় অনিষ্ট করার মতলবে আছি। শুধু আমার কেন, যারা বিনুদের চাষবাস দেখে তারাও বড় সতর্ক থাকে। বিনা অনুমতিতে বাড়ির ভিতর ঢুকলে বাপের গুষ্টির তুষ্টি করে ছাড়বে। এত চোপা যে কার সাহস আছে, না বলে না কয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে যায়।

এ-সব কারণেই আমরাও বিনুকে ডাকতে সাহস পাই না। মরু বলত, বিনুর ঠাকুমাটা পাজি। কি চোপা বুড়ির!

আমি বলতাম, দেখি না ডেকে।

না, ডাকবি না।

কেন ?

ডাকলে আমি তোর সঙ্গে খেলব না।

বিনু যে মেয়ে আমরা তখন টের পেলাম। বলতাম, একা একা থাকে। জানালায় বসে আমাদের ছোটাছুটি দেখে। খারাপ লাগে।

লাগুক। তবু ডাকবি না। পণ্ডিতি ফলাতে আসবে। কত কথা ! ওর বাবা ইস্কুলের মাস্টার বলে দিগগজ হয়ে গেছে। আমাদের মানুষ বলেই ভাবে না।

এটা অবশ্য ঠিক, মামাবাড়ির দেশে, বিনুদের বাড়ি আর কুলদা চক্রবর্তীর বাড়ি ঢুকতে আমাদের কেমন ভয় লাগত। কুলদা চক্রবর্তী আমার দাদুর কি সম্পর্কে আত্মীয়—মা মামাবাড়ি এলেই একবার তার কাকার বাড়িতে যাওয়া চাই। আমরাও যাই। কারণ গেলেই মুড়ি নাড়ু সন্দেশ আর নারকোল কোরা দিয়ে কাঁসার থালাভর্তি খাবার। শুধু এই লোভে যাওয়া। লাল রঙের ইটের কোঠাবাড়ি। সামনে একটা লম্বা দেবদারু গাছ। তার নিচে সবুজ লন। বিকেলে কুলদা চক্রবর্তী একটা গদির ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে থাকেন। মুখে গড়গড়ার লম্বা নল। পাটভাঙা ধুতি পরনে। সামনে ঘাটলা বাঁধানো পুকুর। নারকেল গাছ পাড়ে পাড়ে। আমলকি গাছের ছায়া পাওয়া যায় বাড়িটায় গেলে। আমলকি গাছের ছায়া নাকি মানুষকে সর্ব রোগ থেকে মুক্তি দেয়। আমার মা গাছটার নিচে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমলকি টুপ করে পড়ে কিনা দেখত ! পড়লে ভাল, না পড়লেও ভাল ! আমলকি চিবিয়ে এক গ্লাস জল খেতাম আমরা। মাও খেত। মামাবাড়ির দেশটায় এলে মাও কেমন মাঝে মাঝে বালিকা হয়ে যায়। প্রথমে কুলদা চক্রবর্তীকে প্রণাম, এবং কুশল বিনিময়ের পর মাধবীলতার কুঞ্জ পার হয়ে বাড়ির অন্দরে ঢুকে যাওয়া। সব কিছু এত সাজানো গোছানো যে মনে হত, এখানে দেব-দেবীরাই থাকতে পারে। মাসিদের মনে হত এক একজন দেবী। সবাই সবসময় পাটভাঙা শাড়ি সেমিজ পরে থাকলে আমাদের আর ভাবনার দোষ কি !

মামাবাড়ি এলেই আমার কত কথা মনে হয়। গাছের ছায়ায় হাঁটছি। বড় নির্জন। পাশে লম্বা ডোবা, তার চার পাশে মেত্রাঘাসের জঙ্গল। শীতের বেলা। রোদে তেমন তেজ নেই। পণ্ডুকাকা সারা রাস্তায় তড়পে এনেছে। এখন সে মামাবাড়ির বারঘরে বসে ঠিক গামছায় মুখ মুছে খাবার জন্য রেডি হচ্ছে। মোয়া মুড়কি আর প্রায় এক ধামা মুড়ি। পণ্ডুকাকার জল খাবার। আমার জন্য ভাবনা নেই। গাঁয়ে উঠে গেছি, পালবাড়ির পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে গোলাপীর সঙ্গে কথা বলেছি। সময় হলেই বাড়ি চলে যাব। মরুর বিয়ের খবর পাবার পর মনটা দমে গেছে, মরুকে খুব দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে এ-খবরটা কেউ রাখে না।

তখনই দেখলাম ছোট মাসি, বঁদু কুলগাছটার নিচ দিয়ে ফুলবাগান পার হয়ে হাটে যাবার রাস্তায় নেমে এসেছে। আমাকে দেখেই বলল, ও মা ! গোলা কত বড় হয়ে গেছে ! একী রে, তোর দেখছি দাড়ি গোঁফ গজাচ্ছে। ও মা ! এ ছেলের কী হবে ! আমি কোনো কথা না বলায় ফের বলল, কি রে তোর কি হয়েছে ! বাড়ি আসছিস না। কখন সবাই এসে গেছে, তুই রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি করছিস।

গোলাপী বলল, পিসি গোলাকে আমি সিম বিচি ভাজা দিয়েছি। ও খাচ্ছে না।

গোলাপীর ধারণা বিয়ের কথা শুনে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। আসলে, আমি দাঁড়িয়েছিলাম যদি মরু খবর পেয়ে ছুটে আসে। রাস্তায় এ-জন্য কখনও হাঁটছিলাম, এ-কথা সে-কথা বলছিলাম—এবং এটা আমার হয়, মনের মধ্যে কোন স্মৃতি উঁকি মারলে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে ভালবাসি। গোলাপীও অবাক হয়ে আমার উদাস ভাবটা লক্ষ্য করছে। মরুর সঙ্গে আমার খুব ভাব, মরুর সঙ্গে মাঠে গোল্লাছুট খেলেছি, হাত ধরে দৌড়েছি, ওদের পুকুরে সাঁতার কেটেছি, ডুব দিয়ে কে-কত জলের গভীরে চলে যেতে পারে তার পাল্লা দিয়েছি—গোলাপী সব জানে।

গোলাপী বোধহয় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে পারল না। কারণ আমি এক দৌড়ে মামাবাড়ি উঠে আসতেই দাদু বলল, কি শালার ভাই, রাস্তায় কি করছিলে।

বাড়ি উঠে এ-সময়ে আমার বড় কাজ সবাইকে প্রণাম করা। দিদিমা, দাদু, সেজমাসি, ছোটমাসি, রাঙামাসি, বড়মামা সবাইকে। বড়মামা বাড়ি নেই। এখন স্নান আহার। আমরা আসায় দিদিমার কাজ বেড়ে গেছে। দিদিমা রান্নাঘরে ঢুকে ডেকচিতে ভাত বসিয়ে দিল। পণ্ডুকাকা খাইয়ে মানুষ। আমাদের নিয়ে দাদু দিদিমার ভাবনা কম। পণ্ডুকাকা খেয়ে খুশি হলে দাদু যে আর একবারের মতো নিষ্কৃতি পাবেন। পণ্ডুকাকা দিদিমার হাতের রান্না খুব পছন্দ করে। দিদিমাও পণ্ডুকাকাকে খাইয়ে তৃপ্তি পায়।

স্নান সেরে এসে দেখলাম, পণ্ডুকাকা হাতে একটা দা নিয়ে ভাল কলাপাতা খুঁজছে। ছেঁড়া হবে না। বড় হবে, লম্বা হবে। এক সঙ্গে অনেকটা গরম ভাত ঢেলে দিলেও যেন পাতা ভাপে লেপ্টে না যায়। কি পরিপাটি করে খাওয়া কুলতলায় একটা কাঠের পিঁড়িতে বসে। মাথায় ভাঁজ করা ভেজা গামছা। তার বসাটুকুই দেখার। খাওয়া বিষয়টা পৃথিবীতে কত পূণ্যের, পণ্ডুকাকাকে না দেখলে বোঝা যাবে না। এক থালা ভাত মাসি দিয়ে গেল। আমি নুন দিলাম। কাগজিলেবু দিলাম। শুকতো ডাল হয়েছে। ভাত সবটাই মঠের মতো করে রাখা। দিদিমা ডাল দিতে গেলে হাত ঢুকিয়ে ভাতের মধ্যে একটা বড় মতো গর্ত নিমেষে করে হাতখানা

তুলে আলগা করে রাখাটাও তার দেখার মত। কারণ ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয়। পঞ্চুকাকা আমাদের নিয়ম-কানুনের খুব মর্যাদা দেয়। ডাল এক বাটি ঢেলে দিতে পঞ্চুকাকা সন্তর্পণে ভাতের চারপাশটা চেপে দিল। যেন ডাল কলাপাতা বেয়ে বাইরে গিয়ে না পড়ে। তারপর যখন দেখল, দিদিমা উঠে দাঁড়িয়েছে, তখন হাতখানা সবটা ঢুকিয়ে কোন এক অন্তর্যামীর কথা ভেবে মাথা নোয়াল। এবং সপাসপ খেতে থাকল।

আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। দাদু কালীবাড়ি গেছে পূজা দিতে। পূজা দিয়ে এলে তিনি খাবেন। তারপর দিদিমা। মা দেখছি, মামাবাড়ি এলে আমাদের চেয়েও ছোট হয়ে যায়। কত রকমের আবদার দাদুর কাছে। দিদিমা মাকেও আমাদের সঙ্গে খেতে দিয়েছিল। যেন খাবার সময় আমরা সমবয়সী ক'জন একসঙ্গে খাচ্ছি।

পঞ্চুকাকা এখন বসে আছে বাড়ি রওনা হবে বলে। দাদু না আসায় রওনা হতে পারছে না। যাবার আগে, বার বার এক কথা, দুষ্টুমি করিস না গোলা। দাদুর কথা শুনিস। বঁদুকে মারধোর করিস না। এই বঁদু, তোকে মারলে বাড়ি গিয়ে বলবি। মামাদের কথা শুনবি। তোর তো আবার ঠাণ্ডার ধাত আছে। গরম জামা গায়ে দেগা। সকালে উঠে দাঁত মাজতে ভুলে যাস না।

আমি বললাম, পঞ্চুকাকা, তুমি আজ থেকে যাও না।

মাও বলল, পঞ্চু থেকে যাও। বিকালে বাবা হাট থেকে ভাল মাছ-টাছ আনবে বলেছে। কিছুই তো তুমি খেতে পেলে না।

দাদু ফিরে এসেছে। খালি গা। উত্তুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমাদের শীত করছিল। দাদুর শীত করছে না। পূজাআচ্চায় ব্যস্ত থাকলে শীত বোধহয় গায়ে বসতে পারে না। পঞ্চুকাকা দাদুকে দেখেই বলল, কর্তা চলি।

দাদুর হাতে একটা রেকাবি। তাতে ফল প্রসাদ। পায়ে খড়ম। আমরা হাত পেতে প্রসাদ নিচ্ছি। পঞ্চুকাকা বারান্দায় বসে প্রসাদ নিয়ে আমাদের মাতামাতি দেখছে। কর্তা বোধহয় তার কথা শুনতে পায়নি। নাতিদের জ্বালায় ব্যস্ত। এই টুকরো ফল-প্রসাদ দিলে বঁদু আর এক টুকরো নেবার জন্য লাফ দিচ্ছে। আমায় আর একটা দাও। মা বকছে, তোরা সব খাচ্ছিস, আর কেউ খাবে না! না বাবা, দেবেন না। রাক্ষস এয়েছে সব। আমার বাবা খাবে না, বলে রেকাবিটা মা দাদুর হাত থেকে তুলে ঘরে ঢুকে গেল। রেকাবিটা হাত ছাড়া হওয়ায় দাদু যেন কিছুটা সংসার থেকে আলগা হতে পারলেন। এবং এতক্ষণে পঞ্চুকাকার কথা যেন তাঁর কানে গেল। বললেন আরে না, আজ যাবে কি! আজকের দিনটা থেকে যাও।

পঞ্চুকাকা উঠে বলল, আর একবার এসে থাকব কর্তা। না গেলে ডালু কর্তা মহাফাঁপরে পড়ে যাবে।

একদিনে কিছু হবে না। এসেছ, আবার কবে আসবে!

আমিও বললাম, পঞ্চুকাকা থেকে যাও না!

বঁদুও লাফাতে থাকল, পঞ্চুকাকা থেকে যাও। দুদুকাকা কিছু বলবে না।

কিছু বলবে না, সে পঞ্চুকাকাও জানে। কিন্তু সে না গেলে তার গরু-বাছুর এবং পাহারার কাজটা কে করবে! সে না থাকলে বড়দা, মেজদারা সকালে উঠবে না। পড়তে বসবে না। সবাই চায় পঞ্চুকাকা কোথাও গিয়ে কিছুদিন থাকুক। থাকলে কি হবে, আমাদের তৃতীয় মনিব হরকুমার আছে না। সেই পঞ্চুকাকার হয়ে তখন হাঁক-ডাক শুরু করবে। তবে ঘুমের ব্যাপারে হরকুমারের কিছুটা দুর্বলতা আছে। সেও সকালে উঠতে চায় না। পঞ্চুকাকার ওটাই হল গে বড় ভাবনা। বৈঠকখানা ঘরটায় বাবুদের সঙ্গে হারামজাদা হরকুমারও অনেক বেলা পর্যন্ত টেনে ঘুমাবে। ডালু কর্তার অন্য কত কাজ। তার কি খেয়াল থাকবে সবাইকে ঠেলে তুলে দেওয়ার কথা—নালে বাবুরা যে সব কুম্ভনিদ্রা দেবে। এটাই বড় সমস্যা পঞ্চুকাকার। থাকতে রাজি হচ্ছে না তাই।

দাদু বললেন এইতো খেয়ে উঠলে। এখন একটু শুয়ে বিশ্রাম করোতো। তারপর দেখা যাবে।

পঞ্চুকাকার এও এক সমস্যা, কর্তা অনুমতি না দিলে রওনা হতে পারছে না। আর এক সমস্যা, শুয়ে একটু বিশ্রাম নিতে বলছেন। কিন্তু যা ধকল গেছে রাস্তায়, তাতে শুয়ে পড়লে আর উঠতে ইচ্ছে করবে না। শরীরটা তো কেবল আরাম চায়। পঞ্চুকাকা তা হতে দেবে কেন! আরামের জায়গা হল গে তার ভব নদীর পারে। সেই পারে যখন যেতেই হবে এবং অনন্তকাল আরাম সেখানে অপেক্ষা করে আছে, তখন দু-দিনের এই দুনিয়ায় শরীরটাকে আরাম দেওয়া ঠিক না। যত পার তাকে খাটিয়ে নাও। এই এক সার কথা যে মানুষের, তার পক্ষে অবেলায় শুয়ে গড়াগড়ি দেওয়া কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর।

পঞ্চুকাকা না পেরে আমাকে বলল, কর্তার খাওয়া হলে বলিস। আমি একটু ঘুরে দেখছি।

পঞ্চুকাকা পাছে শুলে ঘুমিয়ে পড়ে সেই ভয়ে, হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিল। মামাবাড়ি এসে, বুঝতে পারি পঞ্চুকাকা আমাদের কত নিজের মানুষ! সে চলে যাবে, ভাবতেই কেমন কষ্ট আমাদের। কাছাকাছি থাকার এই একটা জ্বালা। মামাবাড়িতে মরুকে আবার এলে দেখতে পাব না সেই জ্বালাটা আমার কম না। মরু নেই, পঞ্চুকাকা নেই—কেমন নেই নেই মনে হচ্ছে সব। পঞ্চুকাকাকে যে-করেই হোক ধরে রাখতে হবে।

পঞ্চুকাকা এখন দাদুর বাগানবাড়ি দেখে বেড়াচ্ছে। গাছপালা সব যেন তার আত্মীয়! কোন গাছের আম কত সুস্বাদু, পঞ্চুকাকা অবশ্য ভালই জানে। আমের

দিনে পঞ্চুকাকা মামাবাড়ি এলে অবশ্য এক-দু দিন থেকে যেতে পছন্দ করে। তার কথাই অদ্ভুত! কর্তা কত গাছের আম খেলাম, আপনার বড় সিঁদুরে আমের মত আম হয় না। এর ঘেরানাই আলাদা। মাখনের মত মুখে দিলে গলে যায়। পঞ্চুকাকা বাগানের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বলল, হ্যাঁ রে গোলা, এখানে একটা গোলাপজাম গাছ ছিল না?

কেটে ফেলেছে।

কেটে ফেলেছে কেন?

দুটো বড় গুখখোর গাছটার নিচে গর্ত করে আস্তানা গেড়েছিল।

বলিস কি!

আচ্ছা পঞ্চুকাকা, সাপের বাসায় গুপ্তধন থাকে না?

থাকে। ওনারাই তো যখের ধন পাহারা দেয়। সুলতানসাদির চৌধুরীরা অত বড় লোক হল কি করে জানিস? এই যক্ষের ধনে।

পঞ্চুকাকা তুমি মরুকে দেখেছ?

মরু?

আরে ঐ যে গতবারে ন্যাড়া মাথা দেখে গেছিলে না!

পঞ্চুকাকা থম মেরে কিছুক্ষণ কি ভাবল, কিন্তু কিছুতেই মনে না আসায় বলল, মরু তোদের কে হয়?

কেউ হয় না। ঐ যে দেখছ, দেখ না, রথতলার মাঠে যাবার রাস্তাটা দেখছ না, দেখ কচু গাছগুলো পার হলে পাঁচিলটা, টিনের ঘরটা দেখছ.....

ওটা তো ক্ষেত্র পালের বাড়ি। দুপতারার বাজারে রাখি মালের কারবার করে।

ওদের বাড়ির মেয়ের বিয়ে হবে।

মেয়ে হলে ত বিয়ে হবেই। নতুন কথা কি!

বারে, এই বয়সে বিয়ে হয়। আমার বয়স, পঞ্চুকাকা।

তোর বয়সে মেয়েদের বিয়ে হবে না, তোর বিয়ে হবে?

যাঃ তুমি যে কি না! ওরা খুব গরীব জান?

গরীবের ভয় কি, ভগমান ভরসা গরীবের। গরীব হওয়ার কি মজা তোরা বুঝবি না।

পঞ্চুকাকাটা যে কি! মরুর বিয়ে হলে স্বামীর বাড়ি চলে যাবে—এমন সুন্দর রথতলার মাঠ, কালীবাড়ি, নিনিদের বাগান পার হলে এক বনভূমি, তারপর সেই নদী, সাঁকো সব তার হারিয়ে যাবে না! পঞ্চুকাকাটা না কিছু বোঝে না। এই যে এসেছে, যে ক'দিন থাকবে, সেই সব জায়গায় মরুকে নিয়ে তার বেড়াবার কথা। সেই মরুটা কিনা এখনও একবার দৌড়ে এসে দেখে গেল না—কখন গোলা

এসে হাজির!

পঞ্চুকাকা হাঁটছিল। ঘুম পেতে পারে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে। শরীরের আড়ষ্টতা ভাঙছিল ঘুরে ঘুরে। একদণ্ড এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে না—পিছু পিছু আমি গোলা, কখনও ছোটমামা হাজির—পঞ্চু কি দেখছ?

দেখছি কর্তার ঘরবাড়ি। লটকন গাছগুলোর গোড়ায় কি জঙ্গল। সাফ করে দিতে হবে। এই গোলা, যা তো কোদালটা নিয়ে আয়। গাছ বাড়বে কি করে! আগাছায় ভরে আছে দেখছি।

সব বড় বড় মালঞ্চলতা বড় আমগাছটা থেকে নেমে গাছগুলিকে কাঁকড়ার মতো জড়িয়ে ধরেছে। আমি ছুটে গেলাম কোদাল আনতে। পঞ্চুকাকা দু-লাফে গাছের ডালে উঠে বসে মালঞ্চলতা ছিঁড়তে থাকল। লটকন গাছের ডালপালায় জড়িয়ে আছে লতাগুলো। বর্ষাকালে পঞ্চুকাকা একবার লটকন ফল খেয়ে তার স্বাদ ভুলতে পারেনি। এলেই একবার তার ছোট ছোট ঝুপড়ি মতো গাছগুলোর কি অবস্থা দেখে যাওয়া কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

কোদাল আনলে, পঞ্চুকাকা আগাছার ঝাড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে থাকলো। দাদু খেয়ে উঠে এদিকটায় এসে অবাক। পঞ্চু জঙ্গল সাফ করতে লেগে গেছে। অনেকটা জমি নিয়ে তাঁর বাড়িঘর। সামনে বার-বাড়ির উঠোন, পরে বৈঠকখানা—সব চৌচালা টিনের ঘর। বড় ঘরের মেঝে শানবাঁধানো—পেছনে আমের বাগান। বাতাবি লেবুর গাছ, ডালিম ফলের গাছ একপাশে। চার-পাঁচটা লটকন গাছ এক সারিতে। বড় উর্বরা জমি। দু-এক মাসও যায় না, আগাছায় ছেয়ে যায়। এবারে বর্ষার পর বাগানটায় হাত দেওয়া হয়নি—পঞ্চুর ঠিক নজরে পড়েছে। তবু খেয়ে কোথায় বিশ্রাম করবে, তা না, কর্তার বাগানের আগাছা সাফ করতে লেগে গেছে। দাদু হুঁকা খেতে খেতে কাছে গেলেন। বললেন, পঞ্চু এটা ভাল কাজ হল!

পঞ্চুকাকা অবাক। গাছের ভাল মন্দ সে বুঝবে নাতো কে বুঝবে! আগাছা থাকলে গাছ বাড়ে না। আগাছা হল এঁটোলি পোকার মত—সব রস চুষে নেয়। আসল গাছটাকে সজীব হতে দেয় না। দুবলা করে দেয়। সে সেই কাজটাই করেছে। কর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে কোদালে ভর দিয়ে আমতা আমতা করতে থাকলে, দাদু বললেন, একটু তুমি ঘুমালে না। শরীর খারাপ হলে ডালু আমাকে কি বলবে!

পঞ্চুকাকার মুখ সহসা উদ্ভাসিত হয়ে গেল হাসিতে। বলল, এই কথা! ও কিছু না। ঘুমালেই বরং ডালু কর্তার রাগের কারণ থাকত। বুঝত, পঞ্চুর শরীর খারাপ হয়েছে। কে চায় ঘুমিয়ে কর্তা শরীর খারাপ করতে। তারপর পঞ্চুকাকা বলল, থাকলে কিছু হলুদ পুঁতে দিয়ে যেতাম। আমগাছের ছায়ায় হলুদের চাষ বড় জবর হয়। তারপর হিসাব করে পঞ্চুকাকা জমিটার একবার এ-পাশ ও-পাশ দেখে বলল,

কর্তা কিছু না সের দশেক হলুদের মুখি লাগিয়ে দিলে ফেলে ছড়ে বিশ মন—বলেন তো আজ তবে এই কাজটা সেরে ফেলি।

দাদু পঞ্চুকে জানেন। মার রাগারাগি নিয়েও পঞ্চুকাকার মন্তব্যে দাদুর সায় থাকে। তা ঠাকরুন রাগ করলে চলে? অত রাগ করলে বেম্মতালুতে জ্বালা হয়। কথায় কথায় বাপের বাড়ি এলে দশজনেই বা কি বলে। কর্তার বড় কন্যে, বড় সাধ আহ্লাদের, তাই বলে স্বামীর ঘর থেকে ঝগড়াঝাটি করে পুত্র-কন্যা নিয়ে চলে আসা ঠিক না, ডালু কর্তারা বড় ভাল মানুষ। আমাদের জাতের মধ্যে হলে, থাক তুই বাপের বাড়ি দেখি কত গোসা তর। আর একখান তালাক, বিবি নতুন, এই চারা গাছটাই লাগানোর মত কর্তা।

আমার দাদু এ-সব কথা আড়ালে শুনে হাসত। মাকে কিছু বলত না। পঞ্চুকেও না। মার কল্যাণে বছরে একবার দু-বার পঞ্চুকে এ-বাড়িতে পাত পাততেই হত একসময়। দাদু বললেন, তুমি যে বললে আজই রওনা হবে!

পঞ্চুকাকা বলল, জায়গাটা সাফসোফ করে দিয়ে যাই। পারেন তো মুখি কচু লাগিয়ে দেবেন। কুপিয়ে জমি সরস করে না রাখলে মুখি কচু হয় না। হলুদ না লাগান, মুখি কচু লাগিয়ে দিতে পারবেন।

দাদু বললেন, এতটা যখন করছ দয়া করে রাতটা কাটিয়ে দিয়ে যাও। যা একখান কাম হাতে নিয়েছ, ও তো সাবাড় করতে সাঁঝ লেগে যাবে।

আসলে পঞ্চুকাকার কাছে রাত দিন সমান। বরং সাঁঝবেলায় রওনা হতে তার সুবিধা। তখন নাকি প্রকৃতি ঘুমিয়ে থাকে। কীট-পতঙ্গের আওয়াজ বড় মধুর তার কাছে। বিশেষ করে নিশীথে মাঠ ভেঙে যাবার মধ্যে কি যেন তার এক রোমাঞ্চ বোধ হয়। জ্যোৎস্না রাত হলে তো কথাই নেই।

পঞ্চুকাকা আগাছা সাফ করতে করতে কথা বলছিল। এক দণ্ড বসে থাকার পাত্র না। বলল, হাটে গেলে বড় চাপিলা মাছ আনবেন কর্তা।

এখানকার চাপিলা মাছের বড় খ্যাতি আছে। রুপোর পাত যেন, ঝকঝক করে। আর খেতে তেমনি সুস্বাদু। আমার দিদিমার হাতের রান্না পঞ্চুকাকার খুব পছন্দ। কালোজিরা সম্বারে বেগুন ধনে পাতায় যে এক সুস্বাদু ঝোল। খেলে মুখে লেগে থাকে।

দাদু হাঁটুর কাপড় তুলে আমগাছটার নিচে বসলেন। বললেন, খেতে খেতে তোমার রাত হবে অনেক পঞ্চু। এত রাতে রওনা হওয়া ঠিক না।

পঞ্চুকাকা হাসল। শীতের বেলা এমনিতেই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। শীতের ঠাণ্ডায় আমরা চাদর গায়ে দিয়ে আছি। পঞ্চুকাকার এখন গরম লাগছে। গেঞ্জি খুলে গামছাখানা মাথায় ফেটি বেঁধে মাটি উল্টে দিচ্ছে। কোন কথা বলছে না।

কথা বলছে না অর্থে, নিশীথে তার ভয় কম। যত রাতই হোক, সে ঠিক রাত বারটার আগে গিয়ে আমাদের বাড়ি পৌঁছতে পারবে। তার ঘুমের সময়ের আগে যেতে পারলেই হল। নিজের জায়গায় না শুতে পেলে তার ঘুম আসে না। তাছাড়া আছে আমার দাদারা। পঞ্চুকাকা না গেলে, ঘুম থেকে সকাল সকাল তাদের ওঠায় কে! এত বড় একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে তার পক্ষে রাত কাটান খুবই অসুবিধে।

পঞ্চুকাকা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, যা গোলা, এক ঘটি জল আন। আমি দৌড়ে জল এনে দিলে সব জলটা এই ঠাণ্ডায়ও শেষ করে দিল। আসলে পঞ্চুকাকা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তার কাছ-ছাড়া হতে কেমন কষ্ট হয়। পঞ্চুকাকা কতটা আমাদের আত্মীয়, দূরে এলে টের পাই। এই নিজের মানুষটা বাপ কাকার চেয়েও আপন। বাবা জ্যাঠারা বাইরে কাজ করে। কেবল দুদুকাকা বাড়ি থাকেন। ঠাকুরদার যজন-যাজন আর এই বড় একান্নবর্তী সংসার জমিজমা সহ সব সামলানোর দায় তার। আমাদের সামলানোর দায় পঞ্চুকাকার। মাইনর স্কুলের পণ্ডিত যখন আমাদের বাড়িতে থাকেন, তখন পঞ্চুকাকার মুখ খুব ভার থাকে। কারণ আমাদের তখন তাঁর তাঁবে চলে যেতে হয়। সকালে ওঠা থেকে, পড়াশোনা, চান, খাওয়া তখন তাঁর অধীনে। বছরখানেক ধরে অসুস্থ থাকায়, পঞ্চুকাকা তার নিজের জায়গায় আবার ফিরে আসতে পেরেছে। পঞ্চুকাকা চায়, বুড়ো পণ্ডিতের এবারে ইন্তেকাল হোক। আর কত ছেলেগুলোকে মারধোর করবে!

আমি বসে দেখছি, পঞ্চুকাকার কি শক্ত পেশী! হাড়গুলি মুগুরের মতো। পালোয়ানি চেহারা। অথচ কোনোদিন তার শরীরের এই সৌভাগ্যের জন্য অহঙ্কার নেই। মহাভারতের ভীমের যদি কোন দোসর থাকে তবে আমার এই কাকাটি। মহাভারত না পড়লে পঞ্চুকাকার তুল্য মানুষ আমি ভূ-ভারতে খুঁজে পেতাম না।

দাদুর কাজ অনেক। আমারও যে কাজ নেই তা নয়। ছোটমামা ডেকে গেছে দু-বার। বাদামতলাতে ফুটবল নেমেছে। গোরা, কানু, স্বরাজও এসে একবার করে আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেছে। দাদু ডেকেছে, চল বাজার করে আসি হাট থেকে। হাটের লোকজন বাড়ির দক্ষিণের রাস্তা ধরে যাচ্ছে। শনি মঙ্গলবারে হাট। রথতলায় বসে বুধবার। দুই হাটেই লোকজন আসে দূর দূর গ্রাম থেকে। মামাবাড়ি এলে হাট ঘুরে সব দেখার মধ্যে আমার কেমন একটা সব সময় কৌতূহল থাকে। বিশেষ করে হাটে দাদুর সঙ্গে গেলে এক পয়সার লিলি বিস্কুট কিনে দেবে। এক পয়সার এক ঠোঙা বিস্কুট, আমাকে বঁদুকে ছোট মাসিকে। আমি এত সব লোভ সত্ত্বেও বাড়িতেই বসে আছি। মরু যদি এসে ফিরে যায়! আমি এসেছি শুনলে সে কিছুতেই না এসে থাকতে পারবে না। পঞ্চুকাকা যেখানে কাজ করছে, সেখান থেকে মরুদের বাড়ি থেকে নেমে আসার রাস্তাটা স্পষ্ট দেখা যায়।

অনেকটা জায়গা কোপানো হয়ে গেছে। পঞ্চুকাকা বলল, যাতো গোলা, একটু আগুন নিয়ে আয়।

বাড়ির ভিতর আগুন নিতে ঢুকে দেখি খুশি মাসি, ক্ষেত্রদাদুর ছোট মেয়ে শৈল মাসি, মা দিদিমা বারান্দায় কড়ি খেলছে। এখানে এলে কড়ি খেলার সবচেয়ে বড় সঙ্গী মা'র মরু। আমরাও খেলি। কিন্তু মার পক্ষে খেলতে বসে সুখ নেই। কিছুতেই গুটি পাকতে দেবে না। হেরে গেলে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। মরু আমার পক্ষে খেলে। কিংবা মেজ মাসি। পাশা খেলার মতো খোপ কাটা ঘর। দান ফেলে দেখতে হয় কটা কড়ি উপুড় হয়ে পড়েছে। যতটা পড়বে ততটার দান পাব। ছক্কা পাঞ্জা বা এমন আরও কত কথা তখন। মরু নেই, আমিও যাইনি খেলতে। মার বালিকা হয়ে যাওয়া এখানে না এলে টের পাওয়া যায় না। আমাকে দেখেই মা বলল, যা তো বাবা, মরুকে ডেকে আন গে। বলবি পিসি কড়ি খেলতে ডাকছে।

শৈল মাসি বলল, পাঠিও না দিদি। আসবে না। মন ভাল নেই। ক'দিন থেকে কেবল কান্নাকাটি করছে। দু-বার তো বঁদুকে দিয়ে ডেকে পাঠালে! কৈ, এল?

অন্য সময় হলে আমি যেতাম না। মরু কাঁদছে কেন। মনটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। বিয়ে হবে বলে কাঁদছে। পঞ্চুকাকা ত বলল, সবারই বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ে না হলে কি হবে। মরুর যদি বিয়ের ইচ্ছা না থাকে বিয়ে হবে কেন! ওর কষ্টটা আর কেউ বুঝতে না পারুক আমি বুঝি। এমন একটা মজার শৈশব কে হারাতে চায়।

মা তবু বলল, দেখুক না আর একবার গিয়ে। আমি চলে যাচ্ছিলাম। গন্ধকের শলা আমার হাতে। পাতিলে আগুন জিয়ানো থাকে। পঞ্চুকাকাকে গন্ধকের শলা দিয়ে আগুনের পাতিলটা দিয়ে মরুদের বাড়ি ছুটে যাব ভাবলাম। আসলে মরুকে দেখার জন্য সেই কখন থেকে মনটা আমার উসখুস করছে। দু বছরে কত বড় হয়ে গেলে মরুর বিয়ের বয়স হয় তা জানার কেমন আগ্রহ ভিতরে বড় বেশি বোধ করছি। মা আবার ডেকে বলল, মরুর মাকে বলবি আমি মরুকে ডেকেছি। তালেই ছাড়বে।

মরুকে কি তবে বাড়িতে আটকে রেখে দেওয়া হয়েছে। মনটা বড় মরুর জন্য মুশড়ে পড়ল। না পেরে বললাম, মা, মরুকে আসতে দেবে না কেন!

শৈল মাসি বলল, বিয়ে হবে, জানিস না! ছেড়ে দিলেই বাড়ি ঢুকতে চায় না। যা টো টো করার স্বভাব—একবার বের হলেই হয়েছে। খুঁজে আনতে হয়।

কী যে মনে হল জানি না, বললাম, শৈল মাসি মরু কাঁদছে কেন।

মাসি বলল, বিয়ের আগে সবাই কাঁদে। তোর মাও কেঁদেছে।

তা ঠিক, আমার মনে আছে, আমি তখন ক্লাশ টুতে পড়ি। আমাদের বাড়ি

থেকে দুদুকাকা ডুলি পাঠিয়ে দিয়েছে মাকে নেবার জন্য। সঙ্গে পঞ্চুকাকা। ঠাকুরদার অসুখ—খুবই বাড়াবাড়ি। কেবল নাকি সেজবউ সেজবউ করছে। বাবা খবর পেয়ে কর্মস্থল থেকে সোজা বাড়ি। মামাবাড়ি হয়ে যাওয়ার তার সময় হয়নি ক্রোশ দুয়েক ঘুরে গেলেই মামাবাড়ি হয়ে যাওয়া যায়। কতবার বাবা বাড়ি যাবেন বলে কর্মস্থল থেকে মামাবাড়ি চলে এসেছেন। বাবার এবং মেজ-জ্যাঠামশাইর কর্মস্থল একই জায়গায়। কাজের চাপে মেজ জ্যাঠামশাই বাড়ি যেতে পারছেন না। বাবাকে টাকা পয়সা দিয়ে বললেন, বাড়ি যা। ডালু টাকা পয়সার কথা লিখেছে। বাবা খুব ভাল মানুষের মতো টাকা নিয়ে মামাবাড়ি এসে উঠলেন। মামাবাড়িতে আমার মা থাকলেই বাবা এমন করতেন। বাবার খুব খরুচে হাত। এসেই মামাবাড়িতে প্রায় বলতে গেলে মচ্ছব লাগিয়ে দিতেন। কতদিন দেখেছি দুদুকাকা এই নিয়ে বাবাকে কটু কথা শুনিয়েছে। বাবার কোনো গ্রাহ্যি নেই। অবশ্য জ্যাঠামশাই এ-নিয়ে আর কোনো কথা বলতেন না। মেজ জেঠিমার তাড়া খেয়ে শেষ পর্যন্ত বলতেন দিয়েই ভুল করেছি। অবশ্য জ্যাঠামশাই বাবার এই আচরণের কথা একদম মনে রাখতে পারতেন না। আসলে একই জমিদার বাড়িতে দুজনের কাজ। জ্যাঠামশাই ম্যানেজার। বাবা গোমস্তা। জ্যাঠামশাই খুব রূঢ় হলে বলতেন, এই বুদ্ধি না হলে আর গোমস্তার কাজ করে! সুতরাং সেই বাবার বউকে ডুলি পাঠিয়ে নিতে এলে, মার মুখ ভার। ডুলিতে ওঠার সময় মার কি কান্না! গগনবিদারী সেই মড়াকান্না শুনে আমার হাসি পেয়ে যেত। অবশ্য আমি বঁদু বড় হয়ে যাওয়ায় এখন আর ডুলিতে মা মামাবাড়ি আসে না। পঞ্চুকাকাই দিয়ে যায়, নিয়ে যায়। আমি মার সাবালক সন্তান। এখন লম্বায় মার মাথা ছাড়িয়ে গেছি। মাকে ভয়-ডর নেই। বাবাকেও না। একমাত্র ভয় দুদুকাকা আর পঞ্চুকাকাকে। আজকাল অবশ্য বাড়ি যাবার সময় মা কাঁদে না। মুখ ভার করে থাকে।

আমার এই স্বভাব। এক কথা থেকে কত কথা মনে পড়ে যায়। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মা তাড়া লাগাল, তুই যা, হাবার মতো দাঁড়িয়ে থাকলি কেন! বিয়ের আগে সবাই কাঁদে। ও তো কাঁদবেই। দোজবর বিয়ে। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—এখন বিয়ের বাই উঠেছে ওনার। মরণ হয় না মিনসের!

কাকে উদ্দেশ্য করে মা এ-সব বলছে বুঝতে পারছি না। দোজবর কথাটা শুধু কানে গেছে। দোজবর বুঝি। মরুকে যে বিয়ে করবে তার আর একটা বউ আছে কিংবা ছিল। মানুষ এত নষ্ট হয়ে যায় কি করে বুঝি না। লোকটার অনেক বয়েস—মরুর বাবা মা-ই বা কেমন বুঝি না, মেয়েটার কষ্ট বুঝবি না! আমি হলে তো বাড়ি

থেকে রাগ করে চলেই যেতাম। কিছু খেতাম না।

আমি মরুদের বাড়ি উঠে যাবার জন্য দৌড়ালাম। আসলে মরুকে দেখার জন্য বুকটা কেমন টিপ টিপ করছে। ওর চোখ দুটো এমনিতেই খুব সুন্দর। যখন চেয়ে থাকে, মনে হয় চোখ দুটো টলটল করছে। মরুর সঙ্গে যতই ঝগড়া হোক, ঐ চোখ দুটোর কথা মনে হলে ফের ভাব না করে পারিনি।

মরুদের অন্দরের দিকের রাস্তা ধরে বাড়ি ঢুকে দেখলাম, মরু বারান্দায় নেই। উঠোনে নেই। মরুর মা মুড়ি ভাজছে। আমাকে দেখে বলল, কি রে তোর মা এয়েছে।

বললাম, হ্যাঁ।

তোর মাকে আসতে বলিস।

বলব। একটু থেমে বললাম, মা মরুকে যেতে বলেছে মামী। মরু কোথায়!

কোথায় আর হবে। ঘরে দ্যাখ আছে।

মরুর ছোট বোনটা বের হয়ে বলল, ভাই গোলাদা এয়েছে।

মরু বের হচ্ছে না কেন!

ওদের ঘরের ভেতরটা বড় অন্ধকার। একদিকে একটা লম্বা কাঠের সিন্দুক। পাশে বড় একটা তক্তপোশ। নিচে বাক্স প্যাঁটরা। এক পাশে লম্বা শিকায় হাঁড়ি পাতিল। ঘরে পা ফেলবার জায়গা নেই। একটা ছোট জানালা পশ্চিমের দেয়ালে। দেয়ালের ও-পাশে বড় বড় গাছ—জায়গাটা কেমন বনজঙ্গলে অন্ধকার হয়ে থাকে। সকাল বেলায় এলে বারান্দা থেকে ঘরটায় কিছুই দেখা যায় না। বিকেলে এলে পশ্চিমের জানালায় সামান্য রোদ এসে পড়ে বলে ঘরের ভেতরটা স্পষ্ট। সেখানে দেখলাম হলুদ জমিনের শাড়ি পরে এক নারী শুয়ে আছে। কনুই দিয়ে চোখ ঢাকা। মাথা ভরতি এক রাশ চুল, ঘাড়ের পাশে ছড়িয়ে আছে। সকালে ফোটা চাঁপা ফুলের মতো পায়ের পাতা দুটো।

মরুদের এই ঘর আমার খুব চেনা। আগে হলে দু-লাফে ঘরে ঢুকে যেতাম। আজ সেটা কি-রকম মনে বাধছে। বললাম, মরুকে দেখছি না!

মরুর বোন আঙুল তুলে বলল, ঐ তো ভাই শুয়ে আছে। এই ভাই, ওঠ না। গোলাদা এয়েছে। তোকে ডাকছে।

আমি ভাবলাম, বিয়ের আগে মরু তবে এমন সুন্দর হয়ে গেছে! মরুকে আমি শাড়ি পরে কখনও দেখিনি। ইচ্ছে হচ্ছিল, মরু উঠে বসুক, ওকে দেখি। শাড়ি পরলে, চুলে বিনুনি বাঁধলে মেয়েরা এত সুন্দর হয় আগে যেন বুঝতাম না।

মরুর বোনটা বলল, জান, ভাই আজ খায়নি। কেউ আজ খাওয়াতে পারেনি। কারো সঙ্গে কথা বলে না।

আমি কি করব ঠিক বুঝতে পারছি না। ঘরে গিয়ে ডাকব? এই শুয়ে আছিস কেন, ওঠ না। মা ডাকছে, কড়ি খেলবি। কিন্তু আমার যে তখন পালাতে ইচ্ছে করছে। কারণ মরুর সামনে আমি যেন নিজেও আগের মন নিয়ে দাঁড়াতে পারব না। ভিতরে আমার যে কিছু একটা হচ্ছে!

মরুর মা বলল, যা না ভিতরে যা। ডেকে তোল তো। এতদিন কান্নাকাটি, এখন চুপ মেরে গেছে। আজ আবার নতুন উপসর্গ—খায়নি, খাবে না বলছে। কে কষ্ট পাচ্ছে, না খেলে আমি কষ্ট পাব না তুই কষ্ট পাবি। যাতো গোলা, দ্যাখ তোর সঙ্গে কথা বলে কি না!

পা টিপে টিপে ভিতরে ঢুকলাম। পাশে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, এই মরু, মরু। কিন্তু ধরতে সাহস পাচ্ছি না। বাইরে বের হওয়া বন্ধ, ঘরে আটকা পড়ে আছে—গায়ের রঙ আশ্চর্য চাঁপা ফুলের মতো। সে আমার কথা শুনেই বুকের কাপড় টেনে দিল। হাত সরিয়ে আমাকে দেখল এবং চোখ থেকে উদ্গত অশ্রু ঢাকতে উপুড় হয়ে মুখ লুকিয়ে ফেলল।

নিমেষে আমি কেমন বড় হয়ে গেলাম। আমার ভিতরে কি হল জানি না, ওকে ছুঁতে কিংবা ধরতে সাহস পেলাম না। সে আমার আর খেলার সঙ্গী নয়, ইচ্ছে করলেই ওর হাত থেকে যেন ব্যাট বল কেড়ে নিতে পারি না—আমার মনের মধ্যে কিছু বড় হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকলে শুধু বললাম, মা ডাকছে। কড়ি খেলবি না? তারপর দৌড়ে বের হয়ে যাবার সময় শুনতে পেলাম, মামী বলছে, এই তুই সঙ্গে নিয়ে যা মরুকে। খেলা হলে আবার দিয়ে যাবি। একা ওকে ছাড়িস না।

পেছনে তাকিয়ে দেখছি মরু উঠে বসেছে। আমাকে ডাকছে, গোলা, পিসিকে বলগে, আমি আর খেলব না।

আমি আবার ফিরে গেলাম। বললাম, কেন খেলবি না! কি হয়েছে তোর। খাসনি নাকি?

মরু আমার সঙ্গে কথা বলছে দেখে মামী খুব খুশি। আমি মরুকে সেই শৈশব থেকে দেখে আসছি। ওর যারা ছোট, সবাই তাকে ভাই ডাকে। বছর দুই আগে পর্যন্ত আমার কাছেও সে ছিল বন্ধুর মতো। আজ যেন কোথায় সেটা চিড় খেয়েছে। আমি আগের মতো ওকে টেনে জোরজার করে হাত ধরে নিয়ে যেতে পারছি না। অথচ আমি বুঝতে পারছি, মামী আমাকে আগের মতোই বিশ্বাস করে। মরু একটা কিছু করে ফেলতে পারে ভেবেই কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, বঁদু বলছিল, তোর সঙ্গে আর কথা বলবে না।

মরু হাসল। বড় অস্বাভাবিক হাসি।

মরু একবার জিজ্ঞেসও করল না, কেন কথা বলবে না, আমার সঙ্গে ওর তো আড়ি নেই। কথা বলবে না কেন!

আমি বানিয়ে কথাটা বলেছি। অন্যবার মরু যদি খবর পেত, আমরা মামাবাড়ি গেছি, অথচ দেখা করতে না আসত, বঁদুর অভিমান হত। মরু একসময় পরে এলে বলত, মরু ভাই তোমার সঙ্গে আড়ি। তুমি আমাদের ভালবাস না। অবশ্য বঁদুকে মরু জানে। কথায় কথায় অভিমানবশে সে আড়ি দেয়, মুহূর্তে আবার তা ভুলেও যায়।

এই চল না। মা ডাকছে। পঞ্চুকাকা এয়েছে। তারপর মুখের খুব কাছে গিয়ে বললাম, তোর নাকি বিয়ে?

মরুর মুখটা কালো হয়ে গেল। বলল, বিয়ে না মরণ। আমাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিচ্ছে।

মরুর কথাবার্তা একেবারে মা জেঠিদের মতো। দু-বছরে মানুষ কি এত বড় হয়ে যায়! মরু যেন আমার চেয়ে কত বেশি বোঝে।

মরুকে বললাম, তোর বরটা দেখতে কেমন রে

সহসা মরু থুতু ছিটিয়ে বলল, থু থু। বলে পায়ে থুতু মাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখ না কি করি!

কী করবি!

বলব না।

মরুর জেদ আমি জানি। মরু বলছে, হাত পা বেঁধে তাকে জলে ফেলে দিচ্ছে। অবশ্য এ-সব কথা সে আমাকেই হয়তো বলতে পারে। ওর বাবা বাড়ি নেই। বললাম, বিয়ে করবে?

যেদিন যমের বাড়ি যাব, সেদিন।

তুই যমের বাড়ি যাবি কেন!

আমার ইচ্ছে যাব।

আমার মনে হল ঘরে আটকা পড়ে থাকায়, ওর মাথাটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। বাইরে বের করে নিয়ে গেলে সে আবার আগের মরু হয়ে যেতে পারবে। আর মামী যখন বোঝে আমাকে দিয়ে তাদের উপকারই হবে, আমি যে-কদিন থাকব, মরুকে নিয়ে ঘুরলে মাথায় যেটা চেপে বসে আছে, সেটা হাল্কা হবে, তখন তাকে নিয়ে বের হয়ে পড়াই ভাল। এবং আমার মধ্যে যে সংকোচ ছিল, ওর মাথা খারাপের কথা ভেবে কেমন উবে গেল। হাত ধরে টানলাম, আয় তো! সেই গো-সাপটাকে চল দেখি খুঁজে পাওয়া যায় কি না। তুই বলতিস স্বপ্নের কথা সত্যি হয়।

হাত ধরতেই মরু কেমন কাবু হয়ে গেল। উঠে দাঁড়াল। মরু আমার মতো মাথায় লম্বা হয়ে গেছে। আমরা কিশোর-কিশোরী এই প্রথম টের পেলাম। বয়স আমাদের এখন যেন অন্য এক জগতে নিয়ে যেতে চায়। উঠোনে নেমে এসেই মরু বলল, মা আমি বড় পিসির কাছে যাচ্ছি। একেবারে স্বাভাবিক গলা। বলেই সে এক দৌড়। আর দেখলাম ওর ছোট বোন মতি মরুর সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। মরুকে নিয়ে বড় দুর্ভাবনায় আছে টের পেলাম।

মামী ডাকল, এই গোলা শোন।

কাছে গেলে মামী মুড়ির খোলা নামিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বড় অসহায় মুখ। বলল, দেখিস ও যেন কোনদিকে ছুটে না পালায়। কি করব বাবা, উপায় নেই!

তারপর দেখলাম চোখ ফেটে মামীর জল বের হয়ে আসছে।

এতগুলো সন্তান সন্ততি মামীর। একটা বুক হেঁচড়ে মার কোলে উঠবে বলে ছুটছে। একটা কিছু পাটকাঠি নিয়ে ছোট দুই ভাইকে নিয়ে ঘর বানাচ্ছে পাতার। পাশের বেড়া টপকালে গোলাপীদের ঘর। তারপর বড় উঠোন, সেখানে চকমেলানো বাড়িতে ক্ষেত্র পাল থাকে; তাদের বাড়িতে রসপুলি ভাজা হচ্ছিল, তার গন্ধ আসছে।

বাড়িটা থেকে নেমে এলেই একটা ছাড়া বাড়ি। মাঝখানে একটা বড় কাঁঠাল গাছ। তার ছায়া। বিকেলের সূর্য নেমে গেছে বিনুদের বাড়ির ও-পাশে। শীতের হাওয়া জোর। দেখি কাঁঠাল গাছের নিচে মরু সারা শরীর শাড়ির আঁচলে ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। শরীরে এক গুপ্তধন তার সঞ্চিত ছিল। এতদিন আমরা কেউ তা টের পাইনি। কাঁঠাল গাছের নিচে দাঁড়াতেই কেন জানি মনে হল, মানুষের এই হল সেই গুপ্তধন, যার খোঁজে সে বড় হয়। একজন বুড়ো মানুষ ষড়যন্ত্র করে বুঝি সেই গুপ্তধন হাতিয়ে নেবার তালে আছে। আমার কেন জানি লোকটার উপর বড় কোপ পড়ে গেল।

আমাকে পেয়ে মরু যেন তার যাবতীয় দুঃখ ভুলে গেছে। পঞ্চুকাকার কাছে এসে বললাম, এই দেখ মরুকে নিয়ে এসেছি। মরুকে আটকে রেখেছিল। কী সুন্দর হয়েছে দেখতে!

পঞ্চুকাকা কোদালখানা রেখে জমি থেকে উঠে এল। মরুকে দেখল—আরে সেই ছেলেটা এত বড় হয়ে গেছে! কী সুন্দর হয়েছে দেখতে। দুগ্‌গা ঠাকুর।

আসলে মরুর চলাফেরায় এবং জীবনযাপনে কোনোদিন আমাদের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়নি সে ছেলে না মেয়ে। গতবারই মা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল যেন মরু মেয়ে। মামাবাড়িতে মরু আমার সঙ্গী—সেই একবার যখন, বাড়ির সবাই মিলে বর্ষাকালে নাঙ্গল বন্ধের বান্নিতে অষ্টমী স্নানে গিয়েছিলাম। তে-মাল্লা নৌকা।

মা মাসী বিনুর ঠাকুমা, দাদু দিদিমা—সঙ্গে বড় লটবহর। দু-দিন লেগেছিল পথে। নৌকায় রান্না। নদীর পাড়ে নৌকা ভিড়িয়ে স্নান কুয়োর জলে। সাঁতার কাটা, সবই দূরন্ত বর্ষার মতো আমাদের জীবনে হানা দিয়েছিল। পাখির মতো আমরা উড়ে বেড়িয়েছি—মনু আমার চেয়ে আলাদা এমন কোন প্রশ্ন উঁকি মারেনি। সেই মনু এত সুন্দর হয়ে গেল দু বছর যেতেই। দুগ্‌গা ঠাকুরের মুখ। নাকে ছোট্ট নথ। চোখ তুললে মনুর নথ বাতাসে এখন তির তির করে কাঁপে।

পঞ্চুকাকাকে বললাম, জান, ওর খুব কষ্ট। রাগ করে কিছু খায়নি।

পঞ্চুকাকা বলল, কষ্ট কেন মেয়ে তোমার। খাওনি কেন?

মনু বলল, এই গোলা চল।

কোথায় যাব জানি না। আর মনু বললেই তাকে নিয়ে আর আগের মতো বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে পারি না। নিষিদ্ধ ফলের গন্ধ উঠছে মনুর শরীর থেকে। মনুর জন্য আমার কেন যেন কেবল কষ্টটা বাড়ছিল। সঙ্গে আশ্চর্য এক কৌতূহল।

মনুর গলা পেয়ে মা ছুটে এসেছে। শৈল মাসি এসেছে। সবাই। ওদেরও বললাম, মা মনু আজ কিছু খায়নি।

মনু বলল, না পিসি খেয়েছি।

মনু তুই একদম মিছে কথা বলবি না।

মা বলল, না খেলে হবে? বিয়ে সবারই হয়। বাপের বয়সী মানুষটাকে তোর পছন্দ না বুঝি। পরে দেখবি সেই কত আপন হয়ে যাবে।

মার কথায় আমার কেমন রাগ জন্মে গেল। কেউ ওর দুঃখটা বুঝতে চাইছে না। মনু যে মরে যেতে পারে তাও কেউ জানে না! কি যে বলি! মনুর এই অসময়ে কেউ তার পক্ষ হয়ে কথা বলছে না। বরং মনুর সামনে সবাই লোকটার প্রশংসা করছিল। বুঝি মনু যাতে খুব ভেঙে না পড়ে এ-জন্য এ-সব কথাবার্তা। খুশি মাসি বলল, তোর শিব ঠাকুরের মতো বর হবে, কি মজা তোর বিয়েতে আমি সারাদিন খাটব। তোকে কত আদর করবে দেখিস!

মনু আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আসলে সে বুঝতে পারছে—সবাই তার শত্রুপক্ষ। বাপের বয়সী একটা লোক তাকে বিয়ে করবে—এতে যেন কারো কিছু আসে যায় না। আমার কেন জানি কেবল মনে হচ্ছিল, লোকটা একটা বড় সরীসৃপ, সেই প্রাগৈতিহাসিক জীবের মতো—চোখ দিয়ে আগুন ঝলকাচ্ছে—বড় বড় থাবা, নখ বড় বড়—জিভে লালা ঝরছে, তার সামনে আমাদের ছোট্ট দুষ্টু মনু অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে। কেমন ভীত সন্ত্রস্ত। দিদিমা মনুকে ডেকে খেতে দিলে, সে বসে বসে আবার কাঁদল। খেল ঠিক—কোন কথা বলল না। আমি শুধু বলেছিলাম, মনু খা। তুই না খেলে আমার খুব কষ্ট হবে। মনু আমার কথা রেখেছে।

এই কথা রাখা নিয়েই শেষ পর্যন্ত বিভ্রাট দেখা দিল। যেন বলতে চাইল, আমি তোর কষ্ট বুঝে খেলাম, গোলা তুই এবারে আমার দুঃখটা বুঝতে চেষ্টা কর। যাবার সময় মনুর সঙ্গে গেলাম। জ্যোৎস্না রাত। কাঁঠাল গাছের নিচে এসে মনু তাদের বাড়ি উঠে যাবার মুখে বলল, কাল আমাকে নিয়ে যাবি।

কোথায়!

সেই গুপ্তধন খুঁজতে যাব।

মনে হল বলি, এটা এখন তোর শরীরে। লোকটা টের পেয়ে তোর বাবাকে হাত করেছে। শুধু বললাম, তোর বাবাটা কি!

বাবার দোষ নেই গোলা। আমার কপাল।

মনু বেশ পাকা পাকা কথা বলতে শিখে গেছে। ফের বললাম, মনু তুই সত্যি মরে যাবি না তো?

মরে গেলে তুই কষ্ট পাবি?

না, কষ্ট না। এত কম বয়সে কেউ মরে যায় না।

আমার জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ গোলা। আমার মরা-বাঁচা দুই সমান।

তুই কথা দে মরবি না।

মনু হাসল। সেই অস্বাভাবিক হাসি। জ্যোৎস্নায় তা বুঝতে কষ্ট হল না। কেমন হাহাকার হাসি। মনু একেবারেই পাল্টে গেছে। যাত্রা গানে আমি এমন হাসি শুনেছি। আর কোথাও না। কোথাও কেউ এ-ভাবে হাসে আমার জানা ছিল না।

কথা দে তুই।

কথা দিলাম। খুশি?

মনের মধ্যে কেমন কিছুটা ভার হাল্কা হয়ে গেল। তবু এ মেয়েকে বিশ্বাস নেই। বললাম, লোকটার নাম কি রে?

নরেশ কুণ্ডু। তোর দাদুর যজমান।

দাদু হাট থেকে ফিরে এসে খবর দিলেন, দুপতারার বাজারে যাত্রাগান হবে। কলকাতা থেকে নট্ট কোম্পানী আসবে। হাটে ঢোল পিটিয়ে গেছে। খবরটা দিলে পঞ্চুকাকা বলল, কবে হবে কর্তা?

দাদু তারিখ বললে পঞ্চুকাকা খুব খুশি।

দাদু বলল, এ-কটা দিন তবে থেকেই যাও। যাত্রাগান শুনে, আমাদের গোপালদির ঘাটে নৌকায় তুলে বাড়ি চলে যেও।

পঞ্চুকাকা বলল, আমি আবার আসব কর্তা।

দাদু বলল, আর আসছ!

আমি জানি, পঞ্চুকাকা আসবে। যাত্রাগান হবে শুনলে পঞ্চুকাকা স্থির থাকতে

পারে না। পাঁচ দশ ক্রোশ পথ তার কাছে এমন কিছু নয়। যাত্রাগান সাধারণত আমাদের অঞ্চলে পরাপরদি, দলদি, দুপতারা না-হয় গোপালদির বাবুদের বাড়ি হয়। দুদুকাকা স্বদেশী করেন বলে পঞ্চুকাকার একটা গর্ব আছে। সে যেখানেই যাক, একজন তখন মাতব্বর ব্যক্তি। যাত্রাগানে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ঘটেই থাকে। পঞ্চুকাকা গেলে বাবুরা কিংবা সংগঠক সমিতি সে যেই হোক হাতে আসমান পেয়ে যায়। ভীমের মতো চেহারা আমার কাকার। গোঁফজোড়া প্রবল। গরমে শীতে গায়ে একখানা গেঞ্জি। পরনে লুঙ্গি। গলায় কালো কারে কবচ— সেই বেহেস্তের দরগা। হাতে মকরমুখী একখানা লম্বা বেতের লাঠি। জবরদস্ত হুংকার যে না শুনেছে—তারা কেউ আমার কাকাকে চেনে না। কাকা যাত্রাগানের আসরে একজন তখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী। একজন স্বদেশী করা মানুষের বাড়িতে তার থাকার জায়গা—ফলে যেন তার দায়-দায়িত্ব অনেক।

যাত্রাগানে পঞ্চুকাকা আমাদের সঙ্গে নিতে পছন্দ করে থাকে। সব সময় হয়ে ওঠে না। পড়ার চাপ থাকলে আমরা যেতে পারি না। তবে গেলে টের পেতাম, পঞ্চুকাকারও আছে আলাদা একটা জগৎ। কত রকমের গল্প তখন। মধুবালার প্রস্তাব জমে উঠত। হাতে একখানা হ্যারিকেন। কাকা আগে, আমরা পেছনে। সন্ধ্যায় রওনা হওয়া। যেতে যেতে উজানি গান গাইত পঞ্চুকাকা। কেমন বিষাদে ভরা সেই সঙ্গীত। কাকার ভাব-ভালবাসা ছিল একদা, কোন এক উজানি মৌলবী এসে তার হবু বিবিকে পাঁচ নম্বর বিবির মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলে নিয়ে গেল—সেই দুঃখের গান। গানের রচনাকার সে নিজে। এই যে কোথাও গেলে গভীর রাতে বাড়ি ফেরা, সে যেন সেই নিঃসঙ্গ বেদনা একা একা উদাস মাঠে গাওয়ার জন্য। কাকে শুনিয়ে, কার উদ্দেশে এ-সব গান আমাদের বুঝতে অসুবিধা হত না।

আমরা কাকার সঙ্গে গেলে টের পেতাম তার মর্যাদা কত সেখানে। গেলেই শুনতে পেতাম, যাক পঞ্চু এসে গেছে। কাকার উপর নির্ভরতা কত অসীম এই একটা কথাতেই বুঝতে পারতাম। কাকার কাজ থাকত প্রথমে আমাদের একেবারে সামনের ফরাসে বাবুদের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া। তারপর তার কাজ দেখা উঠতি যুবকেরা কোন্ দিকটায় যুবতী মেয়েদের লক্ষ্য করে ইতরামি ফাতরামি চালাচ্ছে। কাকা পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেই চুপ। চুপ না করলে বগলদাবা করে তুলে নিয়ে যাওয়া। এতটুকু গণ্ডগোল কাকা সহ্য করতে রাজি না। এই কাজটা করার জন্যই কাকার যাত্রা দেখতে যাওয়া। দিনকাল খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মা বোনেদের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি একদম বরদাস্ত কররে পারে না কাকা। যেন একশো লাঠিয়ালের কাজ দেয় এই একটা লোক। সুতরাং কাকা যে যাত্রাগান শুনতে আসবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। দাদু যতই বলুক, আর আসছ!

কাকা রওনা হবার আগে আমাকে বঁদুকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল। আমি ছোটমামার টেবিলে বসে তখন লম্ফর আলোতে কিং ফর এ ডে গল্পটা পড়ছিলাম। আসলে আমি অন্যমনস্ক থাকতে চাইছি। মরুর বিষয়টা আমাকে কেমন অস্থির করে তুলছে। ছোটমামা বলছিল, কি রে গোলা, ক্লাশ নাইনে উঠেই যে খুব গম্ভীর হয়ে গেলি! ব্যাপারটা কি বলত! আগের মতো ছোটাছুটি নেই। দশটা কথা বললে, একটা কথার জবাব দিস। ব্যাপারখানা কি! খেলার মাঠে গেলি না। সবাই কত আশা নিয়ে বসেছিল, তোর খেলা দেখবে বলে!

এ-সময়ে রাঙামাসি এসে খবর দিল, পঞ্চুকাকা আমাদের খুঁজছে। আমরা জানি, যাবার আগে পঞ্চুকাকা আমাদের একবার দেখে যেতে চায়। না দেখে গেলে স্বস্তি পায় না। কিছু উপদেশ দেওয়া যেন তার সব সময় বাকি থাকে!

আমি দৌড়ে গিয়ে হাজির হলাম। পঞ্চুকাকা একখানা পান গালে পোটলার মতো রেখে দিয়ে হাতে দণ্ড নিয়ে রওনা হবার মুখে। আমাকে দেখে বলল, ভাল হয়ে থাকিস। মাকে জ্বালাস না। তারপর কি ভেবে আমার মুখের দিকে ভাল করে তাকাতেই যেন ধরা পড়ে গেলাম।—তোর কিছু হয়েছে?

কি হবে?

এই পেট ব্যথা! বলি মিষ্টি বেশি খাবি না। কৃমির উপদ্রব বড় তোদের শরীরে। আনারসের ডিগ সেঁচে দিতে বলবি সেজবউ ঠাকরুনকে।

আমার কিছু হয়নি পঞ্চুকাকা।

তবে এমন মুখ ভার কেন। বঁদু তোর কিছু নিয়েছে?

নাতো!

এই বঁদু দাদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস এসে যদি শুনি, কান ছিঁড়ে দেব তোমার।

বঁদু আমার পাশে গা লেপটে দাঁড়িয়ে আছে। দাদার সে কি নেবে বুঝতে পারে না। পঞ্চুকাকা তাকে শাসাচ্ছে। সে কেমন মিউ মিউ গলায় বলল, দাদাটা কেবল ঝগড়া করবে, যত দোষ আমার। তোর আমি কিছু নিয়েছি দাদা?

নিসনি বলেছি তো!

পঞ্চুকাকা যে বলল!

বললে আমি কি করব!

পঞ্চুকাকা কেমন তেড়িয়া হয়ে উঠল আমার উপর।—কিছু নেয়নি তো ঝগড়া করেনি তো মুখ গোমড়া করে রেখেছিস কেন? যেন তোকে খেতে দেয়নি কেউ আজ। ও সেজঠাকরুন, সেজঠাকরুন!

পঞ্চুকাকার গলা পেয়ে মা হাজির!

তোমার বড় পুত্রটির মুখ ব্যাজার কেন লক্ষ্য রাখছ না। তুমি না মা। এই

বয়েসটা ভাল না। লক্ষ্য না রাখলে চলবে কেন!

আমি চেষ্টা করছিলাম হাসি হাসি মুখ দেখানোর। কিন্তু কিছুতেই চেষ্টা সফল হচ্ছে না। ছলনার আশ্রয় নেওয়া বোধহয় এ-বয়সে সম্ভব হয় না। নইলে গত নষ্টচন্দ্রে যমুনা পিসির বাগান থেকে বাতাবী লেবু চুরি করে ধরা পড়তাম না। সকালবেলা যমুনা পিসির শাপশাপান্ত শুনেই দুদুকাকা আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমরা পঞ্চপাণ্ডব বৈঠকখানায় হাজির। হরকুমার পঞ্চুকাকা সামনে। কাকা শাসাচ্ছে, বল তোরা রাতে দিদির বাগানে ঢুকেছিলি কি না! নষ্টচন্দ্র করেছিলি কি না। বড়দা না না করলেও কাকা শোনেননি। কারণ আমাদের মুখ দেখে তিনি টের পেয়ে গেছিলেন, কুকর্মটি আমরাই করেছি। তারপর বিচারে যা সাব্যস্ত হয়, দশ বেত্রাঘাত, এবং ভারটা পঞ্চুকাকার উপর ভাগ্যিস পড়েছিল। না লাগা মতো আলতো করে দশ ঘা মেরে ছেড়ে বলেছিল, খবরদার ঐ পিচাশিনীর বাগানে আর ঢুকবি না। ঢুকলে আমিই তোমাদের মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে রাখব। পিচাশিনী শব্দটির ব্যবহার কাকার যাত্রা দেখার কুফল।

আমার মধ্যে বড় রকমের সংকট সৃষ্টি হয়েছে পঞ্চুকাকার পক্ষেই তা বোঝা সম্ভব। চলে যাবার আগে গোলার এমন সংকট দেখে কিছুটা বোধহয় ঘাবড়ে গিয়ে থাকবে। উপায়ন্তর না দেখে বলল, আয় দেখি আমার সঙ্গে। তারপর বাগান পার হয়ে রাস্তায় নেমে বলল, হয়েছেটা কি বলত! দুপুর থেকে লক্ষ্য করছি, তুই কেমন ধবক মেরে আছিস!

ও কিছু না।

কিছু না বললেই আমি শুনছি! তোর পঞ্চুকাকা কি বোকা আছে! বল কি হয়েছে। বাড়ির জন্য মন খারাপ লাগছে! ঠাকুমার জন্য মন খারাপ!

আরে না না! তুমি যে এত ভাব কেন বুঝি না!

দ্যাখ গোলা, আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে। কবে মরে যাব ঠিক নেই। আমার সঙ্গে মিছে কথা বললে, গুনা হবে না তোর!

পঞ্চুকাকা নাছোড়বান্দা। কিছু বলতেও পারছি না। মরুকে নিয়ে ভাববার তো আমার কথা নয়। মরুর কিছু হলে যে আমি খুব কষ্ট পাই, সেটাই বা বোঝাই কি করে। শুধু বললাম, জান মরু বলেছে মরে যাবে।

মরে যাবে কেন! লোক বয়স হলে মরার কথা ভাবে। ওর তো কচি বয়েস ও মরে গেলে চলবে কেন? ও মরে যাবে বললেই মরতে দিচ্ছে কে!

আমি বললাম, আমাকে বলেছে ও মরে যাবে!

তোকে এ-কথা বলতে যাবে কেন! ওর মরার কি হল! বল, এ তো ভারী খারাপ কথা! তোকে ছাড়া বলার আর মানুষ পেল না।

আমি কেমন চুপ করে গেলাম। কাকার যা স্বভাব, তুই গোলা নষ্ট হয়ে গেলি, এত আস্পর্ধা তোর। বাড়ির মান-সম্মান বুঝলি না। আর তা ছাড়া বোঝাই কি করে, মরু ভাল থাকুক আমি দেখতে চাই। নিজের হাত কামড়ে যে মেয়ে আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়, তার প্রতি আমার টান জন্মাতেই পারে। বললাম, একটা বাপের বয়সী লোকের সঙ্গে বিয়ে হলে কেউ আর বেঁচে থাকতে চায়, না বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে!

কথাটা শুনে কত দিনকার আগের এক পুরনো ছবি বুঝি দেখতে পেল পঞ্চুকাকা। কেমন আর তার মুখে কথা সরল না। জ্যোৎস্নায় কোন বিষাদ খেলা করে যেতে পারে মুখে—কি অপার্থিব কোন চিন্তা ভাবনা কাকাকে ক্লিষ্ট করছে বুঝতে পারলাম না। কেমন গুম মেরে থেকে বলল, কোথায় বিয়ে? কার সঙ্গে বিয়ে!

আমি যেন সাহস পেয়ে গেলাম। বালিপাড়ার নরেশ কুণ্ডুর সঙ্গে—ঐ যে নদীর পাড়ে আড়ত আছে!

কুণ্ডু মশাই! কুণ্ডু মশাইর ভীমরতি ধরেছে!

পঞ্চুকাকা তবে চেনে দেখছি লোকটাকে।

আমি বললাম, দেখতে কেমন লোকটা?

আরে বয়স হলে মানুষ যেমন দেখতে হয়। সামনের দুটো দাঁত নেই। গলায় কণ্ঠী। পেট তোদের গণেশ ঠাকুরের মতো। গদিতে বসে থেকে বেজায় বেঢপ মোটা। কুতকুতে দুটো চোখ। টাকার কুমীর।

তালে তুমিই বল, কুমীরের সঙ্গে মরুর বিয়ে হতে পারে! আমার মন খারাপ হবে না?

কাকা কি বুঝল সেই জানে! শুধু প্রশ্ন করল, কবে বিয়ে?

তা ত জানি না।

ঠিক আছে, আমি খবর নেব। তুই যা। মান খারাপ করে থাকিস না। আমার তো কেউ নেই। তোদের ব্যাজার মুখ দেখলে আমার মাথা ঠিক থাকে না। যা বাড়ি যা! যেতে পারবি তো! না দিয়ে আসব।

আমি বললাম পারব।

কথা বলতে বলতে গোলাপীদের ঘাটলার কাছে চলে এসেছিলাম। কাকা গামছাটা দিয়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে নামার সময় বলে গেল, মরুকে বলিস ওকে আমি যাত্রা দেখাতে নিয়ে যাব। ও যেন আবার হুট করে মরে না যায়। মরে গেলে ল্যাঠা তো চুকেই গেল। বেঁচে থাকার কি মজা আমাকে দেখে বোঝে না! তারপর কাকা মাঠে নেমে গেল। গলায় তার সেই উজানি গান—অ উদাসী বাউল বাজাও একতারাখান, নয়ন ভরে দেখি—সূর্যদীঘল নদীর ঘাটে আমার তিনি বাঁধা আছে,

তারে কইয়া পণ্ডু সেখের ভাবখানি। জ্যোৎস্না রাত্রে আমার কাকা সাঁকোর দিকে চলে যাচ্ছে। তার গলা শোনা যাচ্ছে। যে-কেউ এ তল্লাটে টের পাবে পণ্ডু সেখ ঠাকুরবাড়ির সেজ ঠাকরুনকে দিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে। আকাশে জ্যোৎস্না থাকলে, সামনে আদিগন্ত মাঠ থাকলে, তার গলা খোলে ভাল।

একা বাড়ি ফিরতে ভয় করছিল। ঘাটলা থেকে ক' পা গেলেই দাদুর একটা বড় ডোবা এবং মেত্রাঘাসের জঙ্গল। পাড়ে একটা বাজপড়া আমগাছ। গাছটার নিচ দিয়ে রাতে যেতে আমার ভয় লাগে। কিছুটা এগিয়েই দেখলাম, জঙ্গলে জোনাকি জ্বলছে। জোনাকিরা এই ভয়কে আরও বাড়িয়ে দিল। অগত্যা যা করে থাকি, চোখ বুজে এক দৌড়। ঠাকুর দেবতার নাম সম্বল করে বাড়ি ফিরে দেখি আমাদের খেতে দেওয়া হয়েছে।

এবারেই দেখলাম আমাকে এজমালি বিছানায় শুতে দেওয়া হল না। রাঙামাসি, ছোটমাসি মেজমাসি বঁদু আমি মা বড় ঘরের মেঝেতে এলে শুই। বাবা থাকলে পশ্চিমের ঘরে। দাদু দিদিমার খাটে ছোটমামা উঠে আসে। বড় একটা কাঠের সিন্দুক আছে উত্তরের ঘরে—বেশি লোকজন হলে তার উপরও বিছানা করে দেওয়া হয়। বড় মামা দক্ষিণের ঘরে একা থাকে শোয়। তার ঘরে আর কাউকে শুতে দিতে রাজি না বড়মামা। মা বলল, তুই আর তোর ছোটমামা এক সঙ্গে শুবি। বিছানা করে দেওয়া হয়েছে, শুয়ে পড়গে।

শুয়ে আমার ঘুম আসছিল না। এটাও আমার কখনও হয় না।

এপাশ ওপাশ হতে দেখে ছোটমামা বলল, ওঃ এত নড়ছিস কেন! কেবল এ-পাশ ও-পাশ করছিস!

আচ্ছা মামা, তুমি নরেশ কুণ্ডুকে চেন?

বারে, চিনব না। ওর ছেলে মলিন তো আমার সঙ্গে পড়ে। তুই মলিনকে চিনিস না?

কি করে চিনব?

ওতো কালীবাড়ির পথ দিয়েই সাইকেলে দুপতারার স্কুলে যায়।

আমার ছোটমামারও একটা সাইকেল আছে। মামাবাড়ি এলে সাইকেলটায় ছোটমামা তালা মেরে রাখে। তালা না থাকলে আমি বঁদু সাইকেলটা নিয়ে বাদামতলার মাঠে ঠিক নেমে যাব জানে মামা। এবারে সে-সবের আমার খেয়াল নেই দেখেই মামা বোধহয় টের পেয়েছিল, আমার মন ভাল নেই। মরুর হয়ে ছোটমামাকে কিছু বলাও যায় না। মরুকে মামা একদম পছন্দ করত না। মরু গাছে উঠে আতা ফল পাড়লে মামা তেড়ে যেত। মরু যখন এসেছিল, মামা ঘর থেকে বেরই হয়নি। কে বলবে, এই আমার মরুকে কতদিন তাড়িয়ে বাড়ি তুলে দিয়ে এসেছে। আসলে

বড় হয়ে গেলে সবাই আলাদা একটা জগৎ খুঁজে পায়। কে কি করল তখন চোখে পড়ে না।

আচ্ছা মামা, মরুর বিয়ে একটা কুমীরের সঙ্গে হওয়া উচিত!

তোর আবার মরুকে নিয়ে মাথাব্যথা কেন। কুমীরের সঙ্গে বিয়ে হবে কে বলেছে! মলিনের বাবার সঙ্গে বিয়ে। তোর দাদুই তো বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে দিয়ে এসেছে। ওরা কত বড়লোক জানিস। ইচ্ছে করলে আমাদের গোটা গ্রামটাকে কিনে ফেলতে পারে। ঝুলনে কত টাকা খরচ করে জানিস? ঢাকা থেকে হালুইকর আসে। ডাকের মূর্তি গড়া হয়।

দাদুকে লোকটা কিনে নিয়েছে তবে!

কিনে নেবে কেন! মরুদের গোটা পরিবারটা রক্ষা পেল। এখন আর ওদের কখনও না খেয়ে থাকতে হবে না। তা-ছাড়া বাবা এসে বলল, গৌরীদান করছে যতীন। খুবই নাকি পুণ্যের কাজ।

ধুস্, তোমরা কিছু বোঝ না। এটা তো পাঁঠা বলি, সবার উল্লাসের জন্য কচি পাঁঠা যেমন বলি হয় আর কি!

মামা বোধহয় বিষম খেল আমার কথায়। কাশছে। গোলা এত বুঝদার মানুষ কবে হল! কাশি থামছে না। আমি বললাম জল আনব মামা? তুমি কাশছ!

না না জল আনতে হবে না। ঘুমা। আমার ঘুম পাচ্ছে। মামা পাশ ফিরে শুলো।

আচ্ছা মামা, মলিনকেই তো বিয়ে দিতে পারে। ওর সঙ্গে মলিনকে মানাত। কত সুন্দর লাগত। মরু কত খুশি হত তবে। যে বয়সে যা!

মামা বোধহয় মরুর জন্য আমি ভাবছি টের পেয়ে বসল।

আমি বললাম, আচ্ছা মামা, তোমার সঙ্গে আমাদের যমুনা পিসির যদি বিয়ে ঠিক হয় মানাবে?

যমুনা পিসি মানে?

আরে তুমি চেন না, বাতাবি লেবুর মস্ত বাগান আছে। চুলগুলি শনের মতো। নাক খাঁদা। খোনা গলা। দাঁত পড়ে গেছে সব।

গোলা! খবরদার, ও-রকম কথা বলবি না! দাঁড়া তোর মাকে ডাকছি।

আমি আগেই বলেছি, এক দুদুকাকা আর পণ্ডুকাকাকে বাদে কাউকে আমি ভয় পাই না। মাকে না, দাদুকে না। আমার যেন আস্তে আস্তে মরুর হয়ে কথা বলার হক জন্মে যাচ্ছে। কোত্থেকে যে জোরটা পাচ্ছি—বুঝতে পারছি না। ঠাকুর দেবতাকে বলেছি, যেন মরু রক্ষা পেয়ে যায়। লোকটা মরুকে নিয়ে গেলে জীবননাশের সামিল হবে। এটা কেন কেউ বুঝতে চায় না—আমার মাথায় কিছুতেই আসে না।

সকালে বিনুর সঙ্গে দেখা। বিনুর ঠাকুমাকেও আমি আর ভয় পাচ্ছি না। বিনুর ঠাকুমা ঠাকুর দেখাতে গিয়ে আমাকে কিসের ভয় দেখাত ধরে ফেলেছি। বিনু আমাকে দেখে কথা বলল না। কেমন বড় বড় চোখে দেখল, তারপর আতাবেড়ার পাশে লুকিয়ে পড়ল। শুনতে পেলাম বিনু বলছে, ওমা দেখ এসে, গোলা না কত বড় হয়ে গেছে।

কথাটা বড় মগজে ঠোক্কর খেল। বাড়িতে এসে আয়নায় মুখ দেখছি। দেখি পেছনে মরু দাঁড়িয়ে আছে। মরু সুন্দর সাজগোজ করে এসেছে। মনে হয় মরু কাল রাতে ভাল ঘুমিয়েছে। ওকি সত্যি বিশ্বাস করে আমার সঙ্গে রথতলার মঠ পার হয়ে বড় বনটার মধ্যে ঢুকে গেলে সোনালী গো-সাপ দেখতে পাবে? সোনালী গো-সাপের গর্তে কোন গুপ্তধন খুঁজে পাবে! ঘড়া ঘড়া মোহর, ঘড়া ঘড়া রুপোর টাকা। যদি সত্যি পেয়ে যায়, তবে আর মরুর জলে পড়ার ভয় থাকবে না।

মরু বলল, কিরে যাবি না?

মরু আজ ডোরাকাটা শাড়ি পরে এসেছে। মাথায় কি গভীর ঘন চুল! মরুর নাকের নথটা তেমনি তিরতির করে কাঁপছে।

এখন রোদ উঠে গেছে। গায়ের চাদরটা খুলে খাটে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। মরুকে বললাম, একা তোকে ছাড়ল?

ছাড়বে না কেন!

মরু কেন বোঝে না, ওকে নিয়ে একা বনজঙ্গলে ঢুকে যেতে আমার ভয় জাগছে। আমি যে আর ছোট নেই, দু-বছর আগে মা একবার আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল। মরুকে নিয়ে ইচ্ছে করলেই আর বনবাদাড়ে হুটহাট ঢুকে যেতে পারি না। মামাবাড়ি গ্রামটার বাড়িগুলি খুব ছাড়া ছাড়া। মরুদের ছাড়া বাড়ির পেছনটাতে একটা বড় খাদের মধ্যে জঙ্গল। অনেকটা দূর চলে গেছে। ছোটমামা বলেছে, ওটা নাকি ছাগল-বামনি নদীর বাওড় ছিল এক সময়। এখন নদীটা রথতলার পাশ দিয়ে কালীবাড়ি পার হয়ে এঁকেবেঁকে গিয়ে তিন চার ক্রোশ দূরে শীতলক্ষ্যায় পড়েছে। বর্ষাকালে প্লাবনে দু-কূল ছাপিয়ে মঠের সিঁড়িতে জল উঠে আসে। কালীবাড়ির চারপাশটা তখন জলময় থাকে। শুধু যেন কালীবাড়ির চারপাশের পাঁচিল নাক জাগিয়ে কোনরকমে সেই প্লাবনের জল থেকে রক্ষা পায়। তখন নদীর উপর সাঁকো থাকে না। বড় বড় গয়না নৌকা যায়, পাটের নৌকা, হাঁড়ি পাতিলের নৌকা। আনারস বোঝাই হয়ে যায় তে-মাল্লা নৌকা। ভাওয়াল থেকে ফিরি করতে আসে কাঁঠালের নৌকা। এই সব নৌকার পেছনে আমি মরু গোলাপী নন্দ কতবার সাঁতার কেটে গেছি। লাফিয়ে নৌকায় উঠেছি। মাঝিরা তাড়া করলে আবার জলে লাফ দিয়ে দূরে সাঁতরে চলে গেছি। সারা সকালটা মরুকে নিয়ে তখন আমার এ-ভাবে কাটত।

আমি যা করতাম মরুও হুবহু ঠিক তাই করতে ভালবাসত।

জল নেমে গেলে, সব শুকনো। শীতকাল এলে নদীতে হাঁটু জল। তখন বাঁশের খুঁটি দিয়ে দু-খানা বাঁশ উপরে ফেলে লম্বা একটা সাঁকো কারা তৈরি করে দিয়ে যায়। মরুকে নিয়ে সাঁকোর মাথায় উঠে, রথতলার মঠের ডগায় টিয়াপাখিদের বিবিধ কলরব শুনতে আমরা ভালবাসতাম! একটা লোক আসত শীতে। মাথায় পাগড়ি। লম্বা ফতুয়া গায়। অনেকগুলো বাঁশের নল কাঁধে। তার ডগায় একটা খাঁচা। খাঁচার ভেতর একটা টিয়াপাখি। লোকটা বড় গোপনে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যেত। তারপর নলের ডগায় নল লাগিয়ে খাঁচাটা ক্রমশ উপরে তুলে মঠের ত্রিশূলের কাছাকাছি ঝুলিয়ে সে সাঁকোর উপর উঠে বসে থাকত। আমাদের ভারি রাগ হত লোকটার উপর। আমাদের রাগ ছিল, এমন সুন্দর টিয়াপাখিগুলি সে ছলনা করে ধরে নিয়ে যাবে কেন! লোকটা এলে আমরা ঠিক খবর পেয়ে যেতাম। মরুর জেদ ভীষণ। সে বলত, গোলা আয় লোকটার ঠ্যাং খোঁড়া করেদি। আমাদের বয়সে অমন একটা জোয়ান লোকের ঠ্যাং খোঁড়া করা সম্ভব ছিল না। যা আমরা করতাম সেটা আরও বেশি রোমাঞ্চকর। আমি লোকটার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতাম। মরু জঙ্গলের মধ্যে গোপনে এক এক করে নলগুলো খুলে খাঁচাটা নামিয়ে এক দৌড়ে ঝো জঙ্গলের মধ্যে। সহসা লোকটা দেখতে পেত তার খাঁচাটা আর ত্রিশূলের কাছে ঝুলছে না। কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে।

খাঁচায় থাকত একটা মাদি টিয়াপাখি। খাঁচার ভিতর সে ঘুরে বেড়াত। কি থাকত কে জানে, টিয়াপাখিদের বোধ হয় বন্ধুত্ব করার স্বভাব থাকে। এই যেমন আমি আর মরু। খাঁচার খোলা দরজায় এসে প্রথমে মুখ ঢুকিয়ে দেখত, তারপর পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকলে দরজা বন্ধ। সে এভাবে টিয়াপাখি ধরে বড় একটা খাঁচায় পুরে কোন মেলায় অথবা হাটে চলে যেত। আমি লোকটার ফন্দি ফিকির টের পেলেই পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করতাম। জানতে চাইতাম, কোথায় তার বাড়ি, কে আছে বাড়িতে। সে বাড়ি যায় কি না, না সারাজীবন এইভাবেই এক দেশ থেকে আর এক দেশে ঘুরে বেড়ায়। লোকটা আমার কথাবার্তা শুনে বড় বেশি গল্পে জমে যেত। আর তারই ফাঁকে একবার মরুর এই কাণ্ড! লোকটা দেখল ভোজবাজির মতো তার পাখির খাঁচা উধাও। সাঁকো থেকে লাফিয়ে নেমে গিয়েছিল, তারপর বনবাদাড়ে খোঁজাখুঁজি। লোকটাকে তো আমি বলতে পারি না, মরুর কাজ, মরুর কোন বিপদ হোক আমি কিছুতেই তা চাইতাম না। আমার যা সাহসে কুলোয় না, মরু সহজেই তা করতে পারে।

লোকটা হাউমাউ করে কাঁদতে বসে গিয়েছিল। তার এই করে জীবন চলে, সেটা মরু সরিয়ে ফেললে তার কান্না তো পাবেই। সান্ত্বনার স্বরে বলেছিলাম, তুমি

বোস, আমি খুঁজে দেখছি।

তারপর আরও গভীর জঙ্গল পার হয়ে সেনেদের কুঠিবাড়ির পেছনটাতে দেখলাম, মরু একা দাঁড়িয়ে আছে। সামনে খাঁচা। কোন পাখি নেই। কি এক গভীর আনন্দে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

বললাম, এই খাঁচাটা দে, ওকে দিয়ে আসি।

মরু বলেছিল, দ্যাখ দ্যাখ পাখিটা উঠে ডিগবাজী খাচ্ছে।

উপরে তাকিয়ে দেখলাম বিন্দুবৎ একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে।

মরুর কাজটা আমার ভাল লাগেনি। লোকটার পাখি উড়ে যাচ্ছে।

মরুর কাজটা আমার ভাল লাগেনি। লোকটার পোষা পাখিটাকে ছেড়ে দিয়ে সে ভারি মজা পাচ্ছে। কিন্তু লোকটা যে বলল, পোষা পাখিটাকে সে ঝড়ের রাতে পড়ে থাকতে দেখেছিল, সে ওকে ওম দিয়ে, পোকামাকড় খাইয়ে বড় করে তুলেছে। সারাজীবনের এখন সঙ্গী তার। সে আছে বলেই সে দুটো অন্ন খেতে পায়। অন্ন কথাটা কেন বলল ! আসলে যেন অন্ন না বললে, পাখিটা তার বেঁচে থাকার পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বোঝাতে পারত না। আর একটা লোকের সঙ্গে জীবনের এত সব গূঢ় কথা হলে, টান বেড়েই যেতে পারে। মরুকে বলেছিলাম, পাখিটাকে ছেড়ে দিয়ে ভাল করিসনি।

মরু আমার কথার জবাব দেয়নি। তার কাজে সায় না থাকলে সে রেগে যায়। খাঁচাটা আমার মুখের উপর ঝটকা মেরে ফেলে দিয়ে এক দৌড়।

মরুকে ডেকেছিলাম, এই মরু নলগুলি কোথায় ফেললি !

সে দু-হাত উপরে তুলে বলেছিল, জানি না।

আসলে মরু চায় সে যা করতে ভালবাসে, আমিও তাই করতে যেন ভালবাসি। লোকটা হাউমাউ করছিল, অসহায় মানুষের মতো তাকিয়েছিল, সেটাতো মরু লক্ষ্য করেনি। আমি করেছি। আর আমার এটা কেন যে হয় বুঝি না, পরের একটু দুঃখেই বড় কাতর হয়ে পড়ি। লোকটার আমার উপর বিশ্বাস ভারি। সে নিশ্চিন্তে মঠের সিঁড়িতে বসে আছে। সিঁড়িটাতে বকুলগাছের মরা ডাল, ঝরা পাতা এবং পাখ-পাখালির গু-মুতে ভরে থাকে। পা দিতেই গা ঘিনঘিন করে। কিন্তু ওর তো না বসে থেকে সেখানে উপায় নেই। জঙ্গল থেকে বের হলে ওই পথটা দিয়েই বের হতে হবে, জঙ্গলের এ-দিকটায় যে সেনেদের কুঠিবাড়ি আছে। বড় মঠ আছে। লোকটা বোধ হয় তার খবরই রাখে না। খুঁজে খুঁজে নলগুলি পাওয়া গেল। খাঁচা এবং নলগুলি ফিরিয়ে দিতে আমার সংকোচ হচ্ছিল। পোষা পাখিটা নেই, পাখি না থাকলে নল খাঁচা সব অর্থহীন। কিন্তু লোকটা পরম আগ্রহে ছুটে এসে বলেছিল, পেয়েছেন ঠাকুরকর্তা ! আপনার দাদু আমাকে চেনে।

পোষা পাখিটার জন্য লোকটার কোনো আক্ষেপ নেই। বললাম, পাখিটা ত নেই।

লোকটা হাসতে হাসতে বলল, মাঠে দাঁড়িয়ে হাতে তালি বাজালেই ও ফিরে আসবে। ভাববেন না।

আমার কেমন রাগ হয়ে গিয়েছিল লোকটার উপর। কারণ সে তার পাখি সম্বল করে, আবার আমরা না থাকলে চুপি চুপি মঠের অজস্র খোঁড়লে যে-সব টিয়াপাখির বাস তাদের এক এক করে তুলে নিয়ে যাবে। সে হাটে বাজারে মেলায় বিক্রি করবে। তার অন্নসংস্থান হবে। কিন্তু ওই গাছপালা, নদীর ঘাট, রথতলা, কালীবাড়ি, শীতের সাঁকো সব যে এই পাখিগুলির কলরবে ভরে থাকে, যেন এক আশ্চর্য সুষমা বয়ে আনে পাখিগুলি এবং এক বিশাল মুহ্যমান গ্রহনক্ষত্রের খবর দেয় আমাদের, লোকটা তা বোঝে না। তাকে আমি বলেছিলাম, জান পাপ হবে।

পাপ হবে কেন কর্তা ?

পাপ হবে না ! এরা আকাশে বাতাসে খেলে বেড়ায়, গাছের ফলপাকুড় খায়, কারো কোনো অনিষ্ট করে না। তুমি তাদের খাঁচায় ভরে ফেললে ভগবান রাগ করবে না। তোমাকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখলে তুমি খুশি হবে ? মরু সে-জন্যই তো তোমার পাখিটা আকাশে ছেড়ে দিল। যার যেমন স্বভাব তাকে সে-ভাবে বাঁচতে দিতে হবে না !

লোকটার মুখে মজার হাসি। আমার রাগ বাড়ছিল। সে উঠে এক এক করে নলগুলো একটার ভেতর আর একটা ভরে ফেলল। তারপর নলের ডগায় খাঁচা ঝুলিয়ে বলেছিল, কর্তা বনের পাখি পোষার শখ কার না থাকে ! আপনার হয় না ! বলেন তো ধরে দিয়ে যাব।

আমি বলেছিলাম, হয় না।

লোকটা নলের ডগায় খাঁচা ঝুলিয়ে হাঁটতে থাকল। মুখে সেই মজার হাসিটুকু ঝুলে আছে। সাঁকো পার হয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

অনেকদিন পর আজ কেন জানি মরুর কথায়, সেই পাখিওয়ালার কথা মনে পড়ে গেল। বনের পাখি কুম্ভুমশাইর খাঁচায় পোরার শখ।

বনের পাখি ধরে নেবার শখ কার না হয় !

বললাম, চল।

মরু বলল, তুই আগে চলে যা। রথতলার মঠের সিঁড়িতে বসে থাকবি।

মরুও বোঝে আমার সঙ্গে একা ঘোরার আর তার বয়স নেই। মরুর কথায় আমি একা ওদিকটায় যাবার জন্য চুপিচুপি বের হয়ে গেলাম। তারপর সেই রথতলার মঠের সিঁড়িতে বসে থাকতে থাকতে দেখলাম, কে একজন সাইকেলে চড়ে কালীবাড়ির

পথ ধরে দুপতারার রাস্তার দিকে যাচ্ছে।

মরু এখনও আসছে না।

সেই সোনালী গো-সাপ দুটো মঠের আশেপাশে থাকে জোড়ায়। আমরা দুজনে কতদিন পাতার খসখস শব্দ শুনে টের পেয়েছি।ও দুটো আসছে। মুড়ি বিন্নির খৈ খেতে গো-সাপ দুটো ভালবাসে। তা-ছাড়া বকুল ফল, জামরুলও খায়। ভাত খায়। এবং মাছের আঁশ। আমরা কোঁচড়ে মুড়ি খৈ নিয়ে এদিকটায় বেড়াতে এলে গো-সাপ দুটোর কথা মনে পড়ে যেত। খুঁজে পেলে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে যেতাম। ঝোপজঙ্গলের ভেতর দু জোড়া চোখ আমাদের সন্দেহের চোখে দেখত। মুড়ি খৈ একটা পাতায় দুজনে মিলে জড় করে রাখতাম। ওরা খেয়ে যেত। এ-ভাবে আমাদের সঙ্গে ওদের সখ্য জন্মেছিল। তাই স্বপ্নে গো-সাপ দুটোকে আমি মাঝে মাঝে দেখে থাকি বোধহয়। সব বড় বড় পেতলের ঘড়া ওদের গুপ্ত আবাসে। সারা দিন-রাত তারই চারপাশে তারা পাহারা দিচ্ছে। যেন আমাকে, মরুকে খবরটা দেবার জন্যই, মুড়ি বিন্নির খৈ খেয়ে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চায়।

জায়গাটা খুবই নিরিবিলি। মরু আসছে না। নদীর ঘাট আর মঠের ঠিক মাঝখানটায় অতিকায় বকুলগাছ। তার ডালপালা বড় ঘন, গভীর। গাছটায় বারো মাস ফুল ফোটে। এমন একটা বকুল গাছ একমাত্র রথতলার মাঠেই থাকতে পারে—কারণ বারো মাস ফুল দেবে বলেই সে যেন এখানটায় বড় হয়ে উঠেছে। আমাদের বাড়ির বকুল গাছে ফুল হয় বসন্তে। এখানে আরও সব কত বকুল গাছ আছে। বকুল ফলগুলি যখন পেকে হলুদ থেকে লাল হতে শুরু করে, আমাদের তখন গাছতলায় ঘুরঘুর করার স্বভাব। মরু আমাকে খুশি করার জন্য কতদিন, কত হালকা ডাল বেয়ে বকুল ফল পেড়ে এনেছে। কখনও আমরা জোড়ায় বকুল ফুল তুলে কালীবাড়ির থানে মালা গেঁথে রেখেছি। সব কিছুতেই এক পরম বিস্ময়, বকুল ফুল বাতাসে ভেসে যাচ্ছে, কিংবা টুপটাপ পড়ছে—কি যে সুন্দর লাগত সাদা ফুলগুলি পড়তে দেখে। মাঝে মাঝে আমার মনে হত যেন এক একটা নক্ষত্র আকাশ থেকে খসে পড়ছে। আমরা ছুটে যেতাম—কে আগে কুড়িয়ে নিতে পারে, তার প্রতিযোগিতা। বৈশাখের তপ্ত দুপুরে বকুল ফুলের মালা গাঁথার আশায় আমি আর মরু চুপিচুপি এখানটায় কতদিন চলে এসেছি।

মরু এখনও আসছে না কেন! সাইকেল চড়ে কেউ আবার কালীবাড়ির পথে ফিরে গেল। আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আমি তবে সব দেখতে পাচ্ছি। শীতের সময় বলে নদীর ঘাটলা পার হয়ে জল অনেক নিচে নেমে গেছে। কচুরিপানায় সব নদীটা ভরা। দুটো লোক জেলেপাড়ার দিকটায় গরু নিয়ে নদী পার হচ্ছে। সাঁকোতে দু-একজন মানুষ। হাটবার হলে তখন বোঝাই যায় না জায়গাটা এমন

নিরিবিলি কখনও থাকতে পারে। মাঠে সারি সারি চালাঘর। কোনোটায় ছাগল গরু বাছুর শুয়ে জাবর কাটছে। কোনোটা একেবারে ফাঁকা। কাপড়ের হাট, মাছের হাট, সবজির হাট মশলাপাতির হাট ভাগ ভাগ হয়ে নদীর পাড়টা মেলার মতো হয়ে যায়। আর অন্যদিনে ফাঁকা নিরিবিলি, কেবল অজস্র কাকের ওড়াউড়ি। কিংবা শুকনো কলাপাতা হাওয়ায় ওড়ে।

সিঁড়িতে বসে আছি বলে কালীমন্দিরের পাশের রাস্তাটাও স্পষ্ট। কিন্তু দু-একজন গাঁয়ের লোক ছাড়া আর কাউকে যেতে দেখা যাচ্ছে না। শীতকাল বলে, আর জল নেমে যাওয়ায় ঘাটলায় স্নানের জন্যও কেউ আসছে না। মরু কালীবাড়ির পথ ধরেই আসবে। সিঁড়ির এই এদিকটায় গভীর বন। সামনেটা ফাঁকা। এবং উত্তরের দিকটাও ফাঁকা। মরুর জন্য সে-দিকে চেয়েই বলেছিলাম। কিন্তু আমাকে আসতে বলে মরু বেপাত্তা হয়ে গেল কেন বুঝতে পারি না। বাড়ি থেকে কি টের পেয়েছে মরু আমার সঙ্গে গুপ্তধন খোঁজার হেতুতে উধাও হয়ে যেতে চাইছে? বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল, কারণ মাসী চায় মরুকে আমি সঙ্গ দিই। মরু একদিনেই খুব স্বাভাবিক হয়ে ওঠায় মাসীর আমার উপর ভারী বিশ্বাস জন্মেছে। মরুকে বুঝিয়ে সুজিয়ে অনাহারের হাত থেকে আমিই একমাত্র বাঁচাতে পারি তাদের।

শীতের বেলা বাড়ছে। ডালপালার ফাঁকে জাফরি কাটা রোদ এখানে সেখানে সাদা বকের মতো নড়ানড়ি করছে যেন। হাওয়ায় গাছের ডালপালা দুলছে। কোথাও রোদের জাফরি এক জায়গায় ঠিক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে না। আমি কেন যে মরুর জন্য এত আকুল হয়ে পড়েছি বুঝতে পারছি না। ঘাটলা পার হলে কচুরিপানার বুকে এক বিরিক্ষি, তার মাথায় একটা মাছরাঙা পাখি। ওপারে শীতের মাঠ, ফসল যব গমের। শীতের হাওয়ায় ওরাও দুলছে। প্রকৃতির এই সুষমা আমাকে বড় আবিষ্ট করছিল। মরুকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে বয়সে যা, তা না হলে কেন জানি স্বপ্নভঙ্গের কারণ থাকে। মরু এমন একটা দুঃস্বপ্নের কথা জীবনেও হয়ত ভাবেনি।

আর তখনই বড় অনুচ্চ গলায় ডাক শুনতে পেলাম, গোলা আমি এখানে।

সামনে তাকালাম। কেউ নেই।

আবার মরুর গলা পেলাম, ধুস, তুই কোন দিকে দেখছিস?

কোথায় মরু! যেখানেই থাক কাছে ভিতে মরু আছে এই আশায় উঠে দাঁড়ালাম। মঠের ভেতরে মরু লুকিয়ে নেই তো! ভেতরে আমরা কেউ ঢুকতে সাহস পাই না। কেমন গভীর অন্ধকার ভেতরটা। ঢুকলেই গা ছমছম করে। ইট খসা, ভাঙা দেয়াল আর বিদঘুটে এক গন্ধ। হাওয়া বাতাস না ঢুকলে যা হয়। ভিতরে গর্ত একটা। আমাদের ধারণা ওখানটায় কোনো সাপটাপের আস্তানা আছে। আরও

ভিতরে ঢুকলে একটা ছোট ফুটখানেক কাঠের দরজা। ওটা ভেঙে ফেললে কোন গুপ্ত-সিঁড়ির খোঁজ_পাওয়া যায় এমন মনে হয়েছে, এই প্রাচীন মঠের চাতালে উঠে গেলে। মরু কিংবা আমি যত সাহসীই হই, দরজাটা ঠেলে কেউ ভিতরে ঢুকে দেখতে সাহস পাইনি। আসলে, অবহেলায় অযত্নে পড়ে থাকা এই আদ্যিকালের মঠ কে বা কারা তৈরি করে গেছে, শ্মশানের উপর এই মঠ, সঠিক কেউ বলতে পারে না। আগে নদীটা এই মঠের পাশ দিয়ে বয়ে যেত এটা আমার শোনা। এখন নদী দূরে সরে গেছে। মানুষের বিশ্বাস কত রকমের, কে জানে কাঠের দরজাটা ঠেলে সরিয়ে দিলেই দেখা যাবে কিনা, আসল গুপ্তধন এখানেই জড়ো করা আছে।

আমি মরুকে খুঁজছি। সে তবে কালীবাড়ির রাস্তায় আসেনি। তার তো গাঁয়ের এদিকটায় যে গভীর বন আছে তার পথঘাট আমার চেয়ে ভাল জানা। বুঝলাম মরু জঙ্গলের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে দেখব ভাবলাম। আর তখনই হ্যাঁচকা টান। জঙ্গলের মধ্যে মরু টেনে আমায় অদৃশ্য করে দিল। বলল, চুপ। দেখ ওদিকে। কথা বলিস না। জানিস ওই পাজিটা না আমাকে মারবে বলেছে।

পাজিটা বলতে কাকে বোঝাচ্ছে মরু বুঝতে পারলাম না। দেখলাম এক সাইকেল আরোহী কালীবাড়ির পাঁচিলে সাইকেল রেখে ভিতরে ঢুকে গেল। মানত থাকে মানুষের কত। কেউ ফুল বেলপাতা রেখে যায় থানে। কেউ বাতাসা। মন্দিরের জানালা দিয়ে পয়সা ফেলে যায়। কেউ পাঁঠা ছেড়ে দেয় কালীর নামে। বড় জাগ্রত দেবী।

বললাম, কে রে ওটা!

কে জানে! তোর ছোটমামার সঙ্গে খুব ভাব। বছর বছর শুনি ফেল করে।

মামাবাড়ির গ্রামটা ফেল করতে ওস্তাদ। ফেলুমামা ফের করে। ছোটমামা বার দুই চেষ্টা করেও স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উতরাতে পারেনি। আবার টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছে।

মরু বলল, এই চল, দেখিস শব্দ না হয়। মরু ঘুরে ডালপালা সরিয়ে আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকে যেতে চাইছে।

বললাম, ছেলেটা কেন আসে রে?

পরীক্ষা না সামনে! রোজ ফুল বেলপাতা পয়সা দিয়ে যায় থানে।

তুই সত্যি চিনিস না!

চিনব না কেন! সেই লোকটার ছেলে।

সেই লোকটা মানে?

আরে আমার মরণ যার সঙ্গে লেখা হয়েছে। তোর দাদুর যজমান।

নরেশ কুণ্ডু।

কী জানি ছাই। দেখ না কি করি! বিয়ের শখ। লালা গড়াচ্ছে। আচ্ছা গোলা তুই কুমীর দেখেছিস?

ছবিতে দেখেছি।

ছবিতে দেখলে কি বোঝা যায়?

জ্যান্ত কুমীর পাব কোথায় যে দেখব।

আচ্ছা গো-সাপের মতো দেখতে হয় নাকি?

ও-রকমই। তবে অনেক বড় হয়। হাঁ করলে তুই পেটে চলে যাবি।

মরু কথা বলছিল আর ঝোপজঙ্গলের ফাঁকে কালীবাড়ির রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল। এত ভয় কেন বুঝতে পারলাম না। মরু তো বড় কাউকে ভয় পাবার মেয়ে নয়। সে সেই ছেলেটার দিকে ভয়ের চোখে তাকিয়ে আছে।

বললাম, ও তোর খোঁজে আসেনি ত!

সেই ত। আমি একবার জানিস ওর মাথায় পেয়ারা ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

ও কি করেছিল তোর?

কী আবার করবে! আমি কি দেখেছি গাছের নিচ দিয়ে কে যাচ্ছে? পেয়ারা খেয়ে ছিবড়ে ফেলছিলাম। মাথায় পড়লে বল আমার দোষ? ও আমাকে তেড়ে মারতে আসছিল। আমিও পকেট থেকে পেয়ারা ছুঁড়ে মারতে থাকলাম। তারপর ধরতে এলে হাওয়া। আমার সঙ্গে পারে?

সে তো কবেকার কথা! এখনও মনে করে বসে আছে বলছিস?

কপালটা টোবলা হয়ে গেছিল।

তোকে চিনতে পেরেছিল?

না। কার বাড়ির জানত না। তোর মামাদের বাড়ি ছুটে গিয়ে দড়াম করে পড়ে গেছিল।

খুব লেগেছিল বলছিস?

রাঙাপিসি ত বলেছিল, কপালটা ফুলে গিয়ে আঁবের মতো হয়ে গেছিল। তোর ছোটমামা কপালে জলপট্টি দিয়েছিল। আর বলছিল, আমি জানি কার কাজ। মাকে এসে বলেছিল, বউদি মরু কোথায়! মার তো আমাকে নিয়ে শঙ্কা! মা কি ভালমানুষের ঝি হয়ে গেছিল রে! স্রেফ মিছে কথা বলে পার পেয়ে গেল!—মরু তো আজ সকালে কিছু খায়নি। জ্বর হয়ে পড়ে আছে।

মরুর এইসব খ্যাতি এত বেশি ছিল যে কোন কুকর্মের জন্য মরুকেই সবাই প্রথম দায়ী করত। কিন্তু জ্বর হলে সত্যি আর কি করা যায়। ছোটমামা ব্যাজার মুখে ফিরে এসে বলেছিল, তুই চিনতে পারবি মলিন!

মলিন নাকি বলেছিল, হ্যাঁ।

সুতরাং দেখলেই চিনতে পারবে মরুকে। সেই ভয় থেকে সাইকেলের ঘন্টির শব্দ শুনলেই মরু লুকিয়ে পড়ত। বনজঙ্গল পার হয়ে খুশিমাসি কিংবা দত্তদের বুড়ির বাগানে গিয়ে লুকিয়ে থাকত। আর মামাদের গাঁয়ে সাইকেল বলতে ছোটমামার সাইকেল। আসলে সাইকেলটা ছিল বড়মামার। এখন সেটা বড়মামা ছোটমামাকে দিয়ে দিয়েছে। আশায় আছে জমিতে পাট ভাল হলে এবং দাম ভাল পেলে নারায়ণগঞ্জ থেকে নতুন আর একটি সাইকেল নিয়ে আসবে। হালে নাকি গৌরাঙ্গ সাহা একটি সাইকেল কিনেছে। এই অঞ্চলে সাইকেল এলে খবর হয়ে যায়। আমাদের দিকে একমাত্র গোপাল ডাক্তারের সাইকেল আছে। সাইকেল নিয়ে সে যখন রুগির বাড়ি যায় গোপাটের উপর দিয়ে, তখন গাঁয়ের ছোট সব পেন্ডি-গেন্ডিরা সাইকেলটার পেছনে ধাওয়া করে। তখন আমার গর্ব করার মতো কথা থাকত। বাটুকে বলতাম, জানিস আমার বড়মামার সাইকেল আছে। অবশ্য বড়মামা সাইকেলটা কেনার পর যত আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি আছে, সবার বাড়িতে গেছে। সে দশ বিশ ক্রোশ যত দূরই হোক। আমার মামা যে সে মামা নয়—তার সাইকেলখানা ছিল তখন তার ইজ্জতের সঙ্গী। আসলে এখন আমি বড় হয়ে যাওয়ায় সাইকেলের পেছনে ধাওয়া করা আমাকে মানায় না—কবেই যেন সেটা খুব ছেলেমানুষী কাজ ভেবে ফেলেছিলাম। বঁদুটার অবশ্য তা এখনও কাটেনি।

মরু ডালপালা সরিয়ে ক্রমেই জঙ্গলটার মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। ওর শাড়ি কাঁটাগাছে আটকে যাচ্ছে। আমার গায়ে হাফ-শার্ট। পরনে হাফ-প্যান্ট। ছোটমামা দু-বার ফেল করেও হাফ-প্যান্ট ছাড়তে পারেনি। ঐ যে ছেলেটা কালীবাড়ির ভেতর ঢুকে গেল, সেও হাফ-প্যান্ট পরে আছে। ক্লাশ সিক্স থেকে সেভেনে যেবারে উঠলাম, সেবারেই দুদুকাকা আমাকে ইংলিশ প্যান্ট বানিয়ে দিলেন। ইজের পরা আর শোভা পায় না। বকলস দেওয়া, দু-পাশে পকেট। সামনে বোতাম লাগানো—বেশ ভারিক্কি চালে চলা যায়। আমাদের হাইস্কুলে যার যত বয়সই হোক, হয় হাফ-প্যান্ট না হয় ধুতি। মুসলমান ছাত্ররা লুঙ্গি পরে আসে। ইজের থেকে হাফ-প্যান্টে ওঠা বয়সের একটা চৌকাঠ পার হওয়ার মতো। কাজেই ইংলিশ প্যান্ট পরিয়ে দিয়ে দুদুকাকা ধরিয়ে দিয়েছিলেন, গোলা তুই আর তোর মার সঙ্গে শুতে পাবি না। বৈঠকখানা ঘরে শুবি তোর দাদাদের সঙ্গে। সেটাও গত তিন বছরের ঘটনা। আমার মরুকে যে ভাল লাগবে, বিশেষ করে এই মরুকে তো আমি কখনও এর আগে দেখিনি। মরু যেন আমাকে দিয়ে ইচ্ছে করলে এখন যা কিছু করিয়ে নিতে পারে। গুপ্তধন খোঁজা আমাদের অছিলা আমরা বুঝি। আসলে অন্য কোনো গুপ্তধনের খোঁজে আমরা বুঝি দুজনেই এই বনজঙ্গলে ঢুকে গেছি। আমার কেন জানি মরুর সঙ্গে কথা বলতে বুক কাঁপছিল। মরু আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে একটা গাছের নিচে বসে গেল।

তারপর গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে হাঁপাতে থাকল। চোখ বোজা। পা গোটানো। শাড়ি সামান্য হাঁটুর উপর তোলা। আমি তাকাতে পারছিলাম না।

মরু চোখ বুজেই বলল, গোলা লোকটার কাছে তালে আমার মরণ লেখা আছে। তোরা সবাই মিলে লোকটার কাছে ঝুলে পড়তে পাঠাচ্ছিস!

মরু কেমন মা মাসীদের মতো কথা বলছে।

বললাম, বিয়ে তো সবারই হয়।

হয়। এটা বিয়ে না, বুঝলি, একে মরণ বলে। জানিস লোকটা বিয়ের পর আমাকে নিয়ে কি করবে

কি করবে আবার! তোকে শাড়ি দেবে, গয়না দেবে। তুই রাজরানীর মতো থাকবি। মা তো তাই বলল। মরুর কি ভাগ্য। কুবেরের ধন তুই আগলাবি।

জানিস গোলা আমার একদম কিছু ভাল লাগছে না। কি করব আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে না ত! তারপর কেমন হাউহাউ করে কান্না। গোলা তুই আমার কিছু দেখলি না!

কী বলছিস!

সত্যি বলছি, কিছু দেখলি না। আমার খারাপটাই সবাই দেখলি। আমার মরণ হলে তোরা সবাই মুক্তি পাবি জানি।

মরু এবারে পা দুটো বিছিয়ে দিল। সারা শরীরে মরুর স্বর্ণচাঁপার রঙ। ফুল লতাপাতা আঁকা ব্লাউজ গায়ে। স্তন পুষ্ট হয়ে উঠেছে। লোভে পড়ে বার বার তাকাচ্ছি। আমি বললাম, চল গো-সাপ দুটোকে খুঁজি। যদি পেয়ে যাই।

মরু উঠল না। চোখ বুজেই আছে। থাবা মেরে আমাকে বসিয়ে রাখল। বলল, আর খুঁজতে হবে না! ওরা নেই। বেদেরা মেরে ওদের ঝুলিয়ে নিয়ে গেছে।

তবে তুই যে এখানে এলি খুঁজবি বলে!

তোকে আমার খুব দরকার গোলা। আমি তো মরে যাব--তার আগেই তুই আমার মরণের কাজটা সোজা করে দে।

কী বলছিস বুঝতে পারছি না!

তুই কিছু বুঝতে চাস না গোলা। বলে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল মরু। দাঁতে ঘাস কাটছে

আমার কেমন ভয় ভয় করতে থাকল। বললাম তুই কিছু খাসনি ত!

কী খাব।

না, এই করবীর গোটা।

খেলে কি হবে?

মরে যাবি।

আমি তোর সঙ্গে মরতে চাই গোলা। একা মরতে পারব না। একা মরতে জানিও না।

শোন, পাগলামি করিস না। পঞ্চুকাকা বলেছে যাত্রা দেখতে আসবে। তুই অন্ততঃ ততদিন বেঁচে থাক।

আমি সে-মরার কথা বলিনি রে! তুই না হাঁদা আছিস। বলে মরু আমার বুকে মাথা ঠেকিয়ে বলল, তুই আমাকে মার না।

মারব কেন!

বারে, আমি তোর নামে কত মিছে কথা পিসিকে বলে মার খাইয়েছি। তুই শোধ তুলবি না? তারপর বুক থেকে মুখ তুলে মরু এমনভাবে তাকাল যে আমার শরীর শিউরে উঠল। মরুকে নিয়ে আমি পাপ কাজে ডুবে যাই, সে চায়। মরুর শরীরে যেন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

মরুর চোখে প্রচণ্ড ধার।—জানিস মা বলছে, পতি নাকি মেয়েদের দেবতা। দেবতা না ছাই। ভোজে বসবেন পতিদেবতা। পঞ্চব্যঞ্জন পাশে রেখে তাকে হাওয়া করে খাওয়াতে হবে। কত কিছু আমাকে মা, পিসিমা এখন শেখাচ্ছে। কিন্তু শেষটুকু কেউ কিছু বলছেনা। কেবল বলছে, তারপর তুই মা হবি। মা হওয়াটা কি আমি বুঝি না। ওফ্ ঘেন্না ঘেন্না। কি করবে লোকটা তুই ভেবে দ্যাখ গোলা! তার আগে তুই আমাকে এঁটো করে দে।

আমি আসলে কোন কথাই বলছি না। বালিকা নারী হয়ে গেলে যা হয়, আর আমি এখন যেন গোলা নই, যেন পঞ্চুকাকা কান টেনে বলতেও আর সাহস পাবে না, গোলা তোর বাড়াবাড়ি হচ্ছে। শরীর কেমন শিথিল হয়ে আসছে। মা হওয়ার বিষয়টা যে কি মেয়েদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা টের পাচ্ছি। আমার, রোমকূপে ঝড় উঠে যাচ্ছে। মরুর লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা কনুই দিয়ে চোখ ঢেকে রাখা যেন ঝড় আসার আগের মুহূর্ত। সেই ঝড়ের দাপাদাপি আমার মধ্যেও শুরু হয়ে গেছে। সব বুঝি। এতদিন প্রাণীজগতের মধ্যে যা লক্ষ্য করে জীবনের কৌতূহল নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছি এখন তাই আমার সামনে হাত পা মেলে পড়ে আছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ কোথায় যেন এক নিয়ত পাপবোধ আমার রক্তে কারা উসকে দিচ্ছে। আমি আর মাকে জড়িয়ে ধরে আদরও করতে পারব না। আমার সেই অধিকার মরু কেড়ে নেবার জন্য বনজঙ্গলের মধ্যে নিয়ে এসেছে। মরুকে বললাম, মেয়েরা ত সবাই মা হয়। তুই হবি না কেন!

মরু ঝটকা মেরে উঠে বসল। বলল, তাই বলে একটা দামড়া আমার পেছন নেবে! তুই গোলা আমার কষ্টটা বুঝবি না। একটা দামড়া লোক আমাকে মা বানাবে!

আমি কত অসহায় এ-ব্যাপারে কি করে বোঝাই। বললাম, তোর বাবার অভাব

থাকবে না, তুই সেটা বুঝবি না!

অভাব বলে আমাকে বানের জলে ভাসিয়ে দেবে! আমাকে নিয়ে যা খুশি করবে! আমি বাজারের মাছ! টাকা ফেলে নিয়ে যাবে পছন্দ মতো?

বুঝি সবই ঠিক বলছে মরু। কিন্তু মরু কি চায়! কিংবা সেই ছেলেটাকে যদি মরুর পছন্দ হয়। বললাম, লোকটা সত্যি পাজি, ওতো ওর ছেলের সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করতে পারত।

আমার বয়ে গেছে ওটাকে নিতে। মানুষ নাকি। বাপ বিয়ে করবে—কোনো হুঁশ নেই। পরীক্ষার পাশটাই বড়। কালীর থানে মানত দিয়ে বেড়াচ্ছে। তারপর হেসে বলল, আসলে ওটা অছিলা। আমাকে খুঁজতে আসে। দেখলেই চিনতে পারবে, এই সেই হারমাদ ছোঁড়া।

তোকে আর চিনতে পারবে না। তুই জানিস না প্যান্ট শার্ট ছেড়ে তুই কত বদলে গেছিস! তুই কত সুন্দর মরু নিজেও জানিস না। তোর নাকের নথ তিরতির করে বাতাসে কাঁপলে তোর সুষমা বাড়ে।

বাড়ে ত, আমাকে একটু আদর কর না! জানিস বিনু বলেছে তোকে ও স্বপ্ন দেখে। আমাকে বলেছে, গোলা বৃত্তি পাওয়া ছেলে, দেখবি ও খুব বড় হবে। বিনু স্বপ্ন দেখবে কেন তোকে নিয়ে? বল, কেন দেখে?

আমি কি করে বলব বিনু কেন আমাকে স্বপ্নে দেখে!

মরু এবার আমার পিঠে মাথা এলিয়ে দিয়ে বলল, তুই বিনুকে ভালবাসিস। ভাল না বাসলে কেউ কাউকে স্বপ্ন দেখে না। আমি তোকে স্বপ্নে দেখি না কেন! তুই আমাকে ভালাবাসিস না।

আমি সত্যি এত সব ভাবিনি মরু।

তুই না ভাবলে বিনু ভাবে কেন!

সেটা আমার দোষ?

আমাকে তোরা আগুনে ফেলে দিয়ে মজা লুটবি সে হবে না। আমার কি নেই? বিনু আমার চেয়ে সুন্দর বেশি? ওর চুল আমার চেয়ে ঘন? তুই হাত দে।ও আমার চেয়ে লম্বা? ওঠ দাঁড়া। আমি তোর মাথার কাছে পড়ি। আমার হাত দ্যাখ। আমার পা দ্যাখ। বলে মরু প্রায় পাগলের মতো শাড়ি খুলে সবটা দেখাতে চাইল।—কি বল, কোথায় বিনুর চেয়ে আমার খামতি আছে! আমি তো মরেই যাব, আমার ভাবনা কি। আমি তোকে সব দেখাতে পারি। একটা বাপের বয়সী মানুষের লাজলজ্জা না থাকলে আমার থাকবে কেন! বল, কথার উত্তর দে। বলেই সে সব খুলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, বিনুর কি আছে, যা আমার নেই! দ্যাখ তুই। বল তবে কেন বিনু তোকে ভালবাসবে? বাপের

বয়সী একটা লোক আমাকে কেন নিয়ে যাবে? মরতে হয় তোর কাছে মরব। আমার কত শাস্তি তুই বুঝবি না!

আমার কান ঝাঁঝাঁ করছে। চোখ কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে। আর আমার শরীরে একি খেলা শুরু হয়ে গেল। যা কখনও টের পাইনি—উষ্ণ লাভাস্রোত নেমে আসছে। এটা কি হচ্ছে, পুরুষ মানুষ হলে এটা হয়—কি জানি, আমি তো কিছুই বুঝিনি এতদিন! আমার কি হচ্ছে এটা! চারপাশে অন্ধকার দেখছি। বনজঙ্গল, আকাশ, বাতাস কাঁপিয়ে রক্তের মধ্যে অসংখ্য রক্তকীট দামামা বাজিয়ে এক শ্বেত প্রবালের ধারা নির্গত করছে। আমি থরথর করে কাঁপছিলাম। তারপর কেমন সংজ্ঞা ফিরে এলে, এক ঝটকায় মরুকে সরিয়ে সোজা বনজঙ্গল পার হয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এ-ছাড়া নিজেকে আড়াল করার আর যেন অন্য কোনো উপায় আমার ছিল না। সবই আমার প্যান্টে তলপেটে লেপ্টে আছে। মরুকে তা আদৌ স্পর্শ করেনি। আমিই দিইনি। নিজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে এখন জল থেকে উঠে যাচ্ছি। আর সিঁড়িতে ওঠার মুখেই দেখলাম, মরু হাহা করে হাসছে। গোলা তুই এত ভীতু! তুই এমন কাপুরুষ! তোর কাছে আমি মরতে চেয়েছিলাম, সেটুকুও তুই আমাকে দিলি না!

জল থেকে উঠে সোজা বাড়ির দিকে। মরুর দিকে তাকালাম না। কেমন এক অপরাধবোধে পীড়িত। এটা আমার কী হয়ে গেল! পুরুষ মানুষ হলে এ-সব হয়। মরু কি করে বোঝে, একজন পুরুষ নারীকে নিয়ে কি করে! সে এত জানল কার কাছে! এ-যেন আমি এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে পৌঁছে গেছি।

পিছনে তাকালাম না। তাকালেই মরুকে দেখতে পাব। মরু তার সব নির্দ্বিধায় কত সহজে খুলে ফেলতে পারল। আসলে মরু জানে তাকে নিয়ে লোকটা শেষ পর্যন্ত কী করবে। লোকটার কথা ভেবে আমারই কেমন ওক উঠছিল। চাঁপাফুলের মতো মেয়েটাকে একটা কালো কুৎসিত দামড়া যেন সারা ঘর জুড়ে তাড়া করছে। ভীতু বালিকা মরু অসহায় চোখে দেখছে। তার শাড়ি সায়া ব্লাউজ কত অনায়াসে লোকটা স্বামীর অধিকারে খুলে নিচ্ছে। সে জানে বলেই আজ এমন মরিয়া। কেন, আগে মরু তো কোনোদিন নিজের সম্পর্কে এতটুকু সচেতন ছিল না! সে যে মেয়ে তার আচরণে কিছুই বোঝা যেত না।

এত সব ভাবার পরও মরুর উপর আমার কিন্তু রাগটা গেল না। বাড়িতে এলে দিদিমা বলল, এই কিরে, কোথা থেকে চুবিয়ে এলি। আরে ঠাণ্ডা লাগবে ত!

আমি দৌড়ে এসেছি। আমার তেমন শীত করছে না। দিদিমার সঙ্গে আমার কথা বলতে লজ্জা লাগছিল। ওরা তো জানে না, মরু তাদের গোলাকে নিয়ে কি

করতে চেয়েছিল। মা ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে এল। দেখল আমার জামা-প্যান্ট জবজবে ভেজা। অবাক হয়ে বলল, কী সর্বনেশে রে তুই। জামা-প্যান্ট কোত্থেকে ভিজিয়ে এলি!

একটা গামছা দাও না। ঘাটলা থেকে পিছলে পড়ে গেছি।

রাঙামাসি বলল, লাগেনি তো!

রাঙামাসি আমার চেয়ে দু' বছরের বড়। মাসির দিকে তাকাতে পারছিলাম না। কারণ আমি তো কোনো নারীকে বনের মধ্যে এ-ভাবে আর উলঙ্গ করে দেখিনি। মরুর সেই শরীর শুধু দাবদাহে জ্বলছিল বললে তো ভুল হবে, আমারও যে দাবদাহ শুরু হয়েছিল। কিছুটা ভ্যাবলু বনে যাচ্ছি কেন নিজেও বুঝছি না।

আমার জীবনের এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলাও যায় না। বড় গোপন এবং এই গোপন ব্যাধির চিন্তায় আমি কেমন কিছুটা বিষাদগ্রস্ত হয়ে গেলাম। অথবা বলা যায় মরু আমাকে এক অজ্ঞাত নেশার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মরুর এই কুকর্মকে যেন ক্ষমা করা যায় না।

জামা প্যান্ট পাল্টে সোজা পশ্চিমের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছি। কাউকে যেন মুখ দেখাতেও লজ্জা। এবং কেমন এক আলাদা পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে গেছি। ছোটমাসি একবার ডেকে গেল। উত্তর দিলাম না। কথা বলতে ভাল লাগছে না। জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি। অথচ কিছুই দেখছি না। কেমন শূন্য দৃষ্টি।

মা এসে বলল, কিরে অবেলায় শুয়ে আছিস! জ্বরটর হয়নি তো! মা জ্বর হয়েছে কিনা দেখতে গেলে হাত সরিয়ে দিলাম। বললাম, কিছু হয়নি বলছি তো!

খাবি-দাবি না?

আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

দাদু এসে বলল, শালার এত গুমর কেন রে! কারো সঙ্গে নাকি রা নেই। ওঠ। খাবি।

খেতে বসলেও বড় অন্যমনস্ক দেখাল আমাকে। মা বলল, তোকে কেউ কিছু বলেছে! গুম মেরে আছিস এসে তক।

কেউ কিছু বলবে কেন!

খাওয়া দাওয়ার পর আবার বিছানায়। শুধু এ-পাশ ও-পাশ। পাশের জমিটা পার হলে বিনুদের বাড়ি। বিনুও বড় হয়ে গেছে। ও শাড়ি পরে দাঁড়িয়েছিল। বিনুর চোখে যেন কি অন্য কথা। এবং কেন জানি বিনুর শরীরে আর শাড়ি সায়া দেখতে পাচ্ছি না। ঠিক মরুর মতো দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। আবার মুখ ঢেকে দিলাম বালিশে। যেন এই মুখ দেখলে সবাই ধরে ফেলবে আমি কি ভাবছি।

এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল মরুর ডাকে।

শোওয়ার ছিরি দেখ!

চোখ মেলে তাকালাম। মরুকে কেমন বেহায়া মনে হল। কিন্তু উঠে কচলে ভাল করে তাকাতেই অবাক—মরুর সর্বাঙ্গে এ কি রূপ। মাথায় সোনার টিকলি। কপালে বড় করে আলতার ফোঁটা। নীল রঙের ঢাকাই বেনারসী। লাল রঙের ব্লাউজ। পায়ে আলতা। হাতে সোনার কঙ্কন। উর্বশী সেজে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। চোখ ফেরাতে পারছিলাম না।

মরু মুচকি হেসে বলল, কি দেখছিস এত! এ-সব তোর নয়। লোকটা আশীর্বাদের দিন দিয়ে গেছে। এখন কেমন লাগে দ্যাখ।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে বললাম, তুই এখান থেকে যা। যা বলছি।

কিন্তু মরুর যেন এ-সব কথায় যায় না আসে না। বলল, এত ফোঁস করছিস কেন! আমি তোর কি করেছি?

তুই এখান থেকে যাবি কি না বল। আমি তোকে মারব।

মার না। মারতেই তো বলছি। আমাকে তুই মারছিস না কেন। মারবি বলে জড়িয়ে ধরলাম, আর তুই কি না পালালি।

মরু!

আমার সহসা আর্ত চিৎকারে প্রথমে মরু কিছুটা হতচকিত চোখে তাকাল। তারপর এদিক ওদিক সতর্ক নজর রেখে কি দেখল। ঘরগুলো দূরে দূরে। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে খুব জোরে ডাকাডাকি না করলে শোনার কথা না। মরু এ-সব বোধহয় জানে। সে নিজেকে সামলে আমার শিয়রে বসল। আমি মরুর কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম। মরু সব কিছু করতে পারে এমন একটা অবিশ্বাস আমার মধ্যে কাজ করছে। যা আমার কাছে নষ্ট হয়ে যাবার সামিল, মরুর কাছে তা এখন বড় স্বাভাবিক। মরু দু-পা তুলে আমার সঙ্গে যেন গল্প করবে এমন ভঙ্গিতে বসল। না কি মরু পা দু-খানি তক্তপোশে তুলে দেখাতে চাইল, সে আলতা পরেছে। আলতা পরে পা দু-খানি কত সুন্দর গোলা দেখুক।

মরুর বেহায়াপনা কেন জানি আমাকে আরও ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। মরু বোঝে না কেন, আমার ইচ্ছে থাকলেই আমি সব কিছু করতে পারি না। সংস্কার এবং পারিবারিক ঐতিহ্য, আমার পণ্টুকাকা, দুদুকাকা, মা-বাবা, জ্যাঠামশাই সব মিলে এক জগৎ, সেখানে গোলা এ-সবের কিছু বোঝে না, আমি ভাল ফুটবল খেলি, স্কুলের ক্যাপ্টেন এবার—কথাবার্তায় এবং আচরণে এ-বিষয় সম্পর্কে একটা সম্পূর্ণ অন্ধকার জগতের বাসিন্দা, সবার উপরে আমি জানি, এ-সব যে-কোন উঠতি বয়সের

ছেলে মেয়েদের কাছে নষ্ট চরিত্রের লক্ষণ—আমাকে যখন এই চিন্তা ভাবনা পীড়া দিচ্ছিল তখনই কি না ফের মরু সশরীরে হাজির। এবং একেবারে উর্বশী সেজে। যাত্রাগানে সখী সাজলে এ-রকম দেখায়। আঁচল উড়িয়ে পায়ে ঘুঙুর বাজিয়ে যাত্রাগানের সখীর মতো যেন মরু আমার সামনে নাচতে শুরু করবে। একটা বয়স্ক লোক মরুকে এ-ভাবে ক্ষেপিয়ে দিলে আমি যাই কোথায়!

মরু বলল, তোকে বড়পিসি ডাকছে। কড়ি খেলবি, আমি তোর কাছে সাধ করে আসিনি।

আমি খেলব না।

খেলবি না কেন রে! আগে ত খেলতিস। আমার বিয়ে হয়ে গেলে আর খেলতে পারব না। আমার বর আমাকে আসতেই দেবে না! ওদের কত মান ইজ্জত জানিস!

তোর বরের কথা একদম বলবি না। আমার কিছু শুনতে ভাল লাগছে না। বলে, মরুকে এড়িয়ে যাবার জন্য তক্তপোশ থেকে নেমে পালাব ভাবলাম।

কিন্তু মরু আমাকে পালাতে দিল না। দরজায় দু-হাত বাড়িয়ে আটকে রাখল।

মরু সর বলছি।

সরব না।

মাকে ডাকব।

ডাক না। আমি কি করেছি! তুই এমন করছিস!

তুই কিছু করেছিস তো বলিনি। সর তুই।

সরে যাবটা কোথায়।

বরের বাড়ি যা। এখানে আর তোর থেকে কি হবে।

সময় হলে তো যাবই। পারবি আটকে রাখতে? বল পারবি? তোরা কি চাস আমি বুঝি না। এ্যাঁ নাক গাললে পোটা পড়ে বাবুর। তার আবার বড় কথা। আমাকে তুই দয়া দেখাবি না গোলা। আমরা গরীব বলে কম হেনস্তা করিসনি। আমাকে তোরা বিয়ে দিয়ে মজা দেখছিস!

আমি বলতে পারতাম, তোরা বলছিস কেন, বিয়ে দিচ্ছে তোর বাবা—আমার দাদু বিয়ের মন্ত্র পড়বে, তাতে তোরা হয় কি করে! আসলে কি ও বোঝাতে চায়, পুরুষদের এটা চক্রান্ত? এতে যে নারীর কত বড় নির্যাতন পুরুষরা বোঝে না। এটা ঠিক এই অসম বিয়ে নিয়ে কারো কোন ক্ষোভ নেই। কেউ কেউ নরেশ কুণ্ডুর উদার চিত্ত কত এমন বলছে। একটা অভাবী সংসারকে বাঁচাবার জন্য তিনি যেন দয়া করে মরুর দায় কাঁধে নিচ্ছেন। কেমন পচা গলা আঁশটে গন্ধ পাচ্ছিলাম আমি। আর এই সব গন্ধ নাকে এসে লাগায় মরুর জন্য যত না ক্ষিপ্ত হচ্ছি তার চেয়ে বেশি এক প্রজ্বলিত দাহ আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। মরু যত আমার কাছে না

আসে মনে মনে তাই চাইছি।

মরু এবার আমার হাত ধরে বলল, লক্ষ্মী আমার দাদা—আয়। তুই আর আমি, বড়পিসি আর শৈলপিসি। খুব জমবে। আমার এটুকু সাধ তুই রাখবি না!

যেন মরু বলতে চায় ছুটে পালিয়ে এসেছিল, বেশ করেছিস। আমার আসল সাধ পূরণ করতে তুই যখন এতই অক্ষম, কড়ি খেলে অন্তত একটু সঙ্গ দে। পালিয়ে না হয় নাই ঘুরলি, সবার সামনে বসেই না হয় এ-কটা দিন আমাকে স্বাভাবিক থাকতে দে।

মা তখন ডাকছে, মরু আয়। কি করছিস ও-ঘরে?

গোলা খেলবে না বলছে পিসি।

না খেলুক। তোর খুশিপিসি এয়েছে। হয়ে যাবে। তুই খুশি বস। আমি আর শৈল বসছি।

আমি খেলব না পিসি।

খুশিমাসি আমাদের ঘরের দিকে আসতেই মরু দরজা থেকে সরে দাঁড়াল। খুশিমাসি বলল, ও মা তোকে কি সুন্দর লাগছে দেখতে। আয় আয় দেখি। দরজায় হেলান দিয়ে আছে মরু। সে খুশিমাসিকে হাত ঘুরিয়ে গয়না দেখাচ্ছে। খুশিমাসি ওর মাথার টিকলি হাতে নিয়ে দেখল। বলল, বেশ ওজন আছে রে। তোকে এখনই এত সাজিয়ে দিয়েছে! তোর কি ভাগ্য।

আমার ভাগ্য পিসি কত ভাল বল। কত লোক এখন হিংসে করছে।

করবেই তো! আমারই হিংসা হচ্ছে!

না পিসি, তুমি আবার এতে চোখ দিও না।

আমার অবাক লাগছিল, এরা সবাই যেন এখন মরুর সমবয়সী হয়ে গেছে। আমি যে ঘরের ভেতরে আছি মাসি লক্ষ্য করেনি। বলল, তোকে কি আদর করবে দেখিস। মাটিতে রাখবে না খাটে রাখবে ভেবে পাবে না। ও তোকে নিয়ে যা করবে না—তখনই খুশিমাসি দেখল, আমি ভেতরে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোর এখানে কি—যেন আমার সামনে এ-সব অসভ্য কথা বলা ঠিক হয়নি।

এতটুকুন একটা মেয়ের বয়স দু' বছরে এমন বেড়ে যায়, মা মাসির ঠাট্টার জগতে প্রবেশপত্র পেয়ে যায়, ভাবতে কেমন গা গোলাচ্ছিল। আমার এদের কাছে থাকাটা ঠিক না—আচরণে খুশিমাসি তাই বুঝিয়ে দিল। এই আমার প্রকৃষ্ট সময় মরুর হাত থেকে পালাবার। আলনা থেকে চাদর টেনে কিছুটা গা বাঁচিয়ে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম। দূরে গিয়ে তাকালে দেখলাম, মরু আমার দিকে টলটল চোখে তাকিয়ে আছে। এবং কেমন প্রস্তরমূর্তির মতো তার অবয়ব।

সেই বাজপড়া আমগাছটার নিচ দিয়ে যাচ্ছি। ছোটমামা সাইকেলে কোথা থেকে ফিরেছে। আমাকে দেখে বলল, এই গোলা যাচ্ছিস কোথা! ওরা এসে গেছে।

আমি খেলব না মামা।

মামা বলল, সে কি করে হয়। তুই এসেছিস শুনে রঘু লালু ম্যাচ খেলবে ঠিক করেছে। গতবার আমাদের ক্লাব হেরে এসেছে। এবার তুই খেললে ঠিক আমরা জিতব। নন্দ মাঠে বসে আছে।

নন্দ গোলাপীর দাদা। ওরই কাজ এটা। খেলায় আমার সুনাম আছে। এবারে ক্লাশ নাইনে ওঠার পরই অবিনাশ স্যার আমাকে স্কুলের ক্যাপ্টেন বানিয়ে দিয়েছে। সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলি। গতবার আমাদের স্কুলের টিম দুপতারা হাইস্কুলের সঙ্গে খেলে ট্রফি নিয়ে গেছে। নৌকায় আমরা এসেছিলাম, নৌকায় আবার ফিরে গেছি। সঙ্গে অবিনাশ স্যার ছিল। এত কাছে এসেও মামাবাড়ি আসা হয়নি। গতবার মামাবাড়ির গ্রাম থেকে ছোটমামা নন্দ রঘু সরোজ গৌরাঙ্গ সবাই খেলা দেখতে গেছে। আমি সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলব জেনে ওরা দুপতারা স্কুলের ছাত্র হয়েও আমাকে খেলায় উৎসাহ দিয়েছে। গোলের কাছে গেলে সে কি চিৎকার মার গোলা, মার। আহা কি করছিস! তাদের গাঁয়ের ভাগ্নে খেলছে—ছোটমামা আমার জামা প্যান্ট নিয়ে বসেছিল মাঠের বাইরে—তার ভাগ্নে পর পর তিনখানা গোল দিলে, সে কি উৎসাহ। অবিনাশ স্যারকে গিয়ে ধরেছিল গোলাকে পারমিশন দিন সে আমার সঙ্গে যাবে। কিন্তু অবিনাশ স্যার কড়া ডিসিপ্লিনের মানুষ। তিনি জানিয়ে ছিলেন, পরে বেড়াতে আসবে। একসঙ্গে এসেছি, আমরা একসঙ্গে ফিরব।

আমার খেলায় যে উন্নতি হয়েছে মামা নিজেও তা বিশ্বাস করতে পারেনি। বাদামতলার মাঠে খেলার সময় আমি সব সময় গোলে খেলতাম। এক বছরে আমার খেলার এমন মান ওদের প্রত্যাশার বাইরে। বাদামতলার মাঠে খেলার সময় মরু সঙ্গে থাকত। তার কাজ ছিল আমার জামা কোলে নিয়ে মাঠের বাইরে বসে থাকা। বল বাইরে গেলে দৌড়ে ধরে আনা। গোল খেলে আমার উপর রাগ করা। না খেলে আমার পাশাপাশি হেঁটে গর্ববোধ করা। বাদামতলার মাঠে আমাদের অধিকাংশ দিন বাতাবি লেবু সম্বল করে খেলা। মরু নিনিদের বাগান থেকে বাতাবি লেবু পেড়ে আনত চুপিচুপি। একটাই তখন কড়ার ছিল, ছোটমামার দলের সঙ্গে আমাকে খেলায় নিতে হবে। সেই সুবাদে ওরা দয়া করে আমাকে গোল-পোস্টে দাঁড় করিয়ে রাখত! এখন সে-ই অঞ্চলের এক নম্বর খেলোয়াড়। হায়ার করার জন্য আমাদের বাড়িতেও লোক আসত। পঞ্চুকাকার সিধা, না। ছেলেমানুষ একা ছাড়া যাবে না। এখানে আসার পর মামাবাড়ির ক্লাব এই সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি না। আমাকে না জানিয়েই ম্যাচ খেলবে কথা দিয়ে এসেছে। ছোটমামা আমার গুরুজন—তার

কথা আমি ফেলতে পারব না জানে। খেলায় উৎসাহ আমারও কম নেই। কিন্তু আমার মন মেজাজ এবারে মামাবাড়ি এসে কতটা ভেঙে গেছে ওরা বুঝবে কি করে। সেই স্বপ্নের গুপ্তধন যে মরুর শরীরে আমি খোঁজ পেয়ে গেছি তারা তা জানে না। আমি মামাবাড়ির মাঠে বাদামতলায় খেলব, মরু থাকবে না—আমার খেলার এক নম্বর উৎসাহদাতা মাঠে গরহাজির—কেন জানি কোন উৎসাহ বোধ করছি না। আর সবার উপর ক্ষোভ, জ্বালা—বাপের বয়সী একজন মানুষের সঙ্গে মরুর বিয়ে, এই নিয়েও কারো মাথাব্যথা নেই। সংসারে গরীব হলে এমনই যেন নিয়ম। মামা, দাদু প্রাণকুমার, কুলদাচরণ এত সব গুরুজনেরা আছেন, তাঁরা থাকতে মরুর এত বড় বিপদে কেউ একটা কথা বলছে না। যেন এটা কোনো সমস্যা তারা মানতেই রাজি না।

মরুর সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করার পর আর দেখা হয়নি। আসলে মরুকে কেন জানি বড় বেহায়া মনে হয়েছিল আমার। নষ্ট মেয়েছেলে ভেবেছিলাম। সেটা মন থেকে কিছুতেই সরছে না। আচমকা মরুর উলঙ্গ হয়ে জড়িয়ে ধরায় থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম—তারপর শরীরের শিরা উপশিরায় এক প্রবাহ নেমে আসতে থাকায় নিজের উপর কেমন এক বিস্ময়, ঘৃণাবোধ এবং পাপ—সব মিলে মেজাজটা তিরিক্ষি করে রেখেছে। সবাই যেন টের পেয়ে গেছে আমি আসলে এই—আমার চোখ মুখ দেখলে বুঝতে পারবে বড় একটা কুকর্ম করে যেন আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। সুতরাং ধরা না পড়ার জন্য বললাম, শরীরটা ভাল নেই মামা। তোমরা খেলগে!

মামা সাইকেল থেকে নেমে কিছুটা অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এই গোলা যেন আর আগেকার গোলা নয়! এখানে আসার পর থেকেই কেমন গুম মেরে আছে। সেই তরল কথাবার্তা। সাইকেল নিয়ে উধাও হয়ে যাওয়া—কিছুতেই মন নেই গোলার। বলল, আগে মাঠে আয় ত। এবং জোরজার করে ধরে নিয়ে গেলে দেখলাম, ম্যাচ হবে বলে মাঠে বেশ লোকজন জমেছে। মাইনর স্কুলের বারান্দায় সারি সারি টুল বের করে দেওয়া হয়েছে। গাঁয়ের মাতব্বর মানুষেরা বসে আছেন। ছেলে বুড়ো সবাই হাজির। না খেলে থাকা যায় না। দেখি আলাদা টুলে বিনু গোলাপীরা বসে আছে খেলা দেখার জন্য। সবার চোখ আমার দিকে। গোলাকে ধরে আনা গেছে খেলার জন্য এটা তাদের কাছে মহা উৎসাহের ব্যাপার।

মরু আসেনি।

আমার গায়ের চাদর জামা ছোটমামা হাতে নিয়ে বিনুদের কাছে দিয়ে এল।

মাঠের ও-পাশে জার্সিপরা বালিপাড়া ক্লাবের খেলোয়াড়রা। ক্লাবের অর্থ যোগান নরেশ কুণ্ডু মশাই। ফুটবল, জার্সি যাতায়াত খরচা সব তাঁর। তাঁর ছেলে ক্লাবের সেক্রেটারি। মামার ক্লাবে এত পয়সা নেই। ওরা বুট জুতো পরে খেলতে নামবে। দুর্ধর্ষ টিম। অঞ্চলে নাম আছে। আমি এসেছি বলে এবারে একটা অন্তত বদলা নেওয়া যাবে মামার এমন বিশ্বাস জন্মেছে। কিন্তু আমি কেমন গুটিয়ে আছি দেখে বলল, দৌড়া। নে বল নন্দ গৌরাঙ্গ তারা বল নিয়ে মাঠে নেমে গেল। আমার কাছে বল ফেলে দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। আলতো করে বল তুলে দিয়ে দিচ্ছি। মরুকে যে লোকটা বিয়ে করবে বলে বসে আছে তারই পৃষ্ঠপোষকতার টিম। খারাপ মানুষেরা এ-ভাবেই বোধহয় গাঁয়ের ছেলে ছোকরাদের হাতে রাখে। যেন আফিমের নেশা ধরিয়ে নিজের সব কুকর্ম হেলায় করে যাওয়া।

কিন্তু ভেতরে জোর পাচ্ছিলাম না। মরু থাকলে মনে হত, সে চায় আমি আর কিছু না পারি, লোকটার টিমকে যেন হারিয়ে দিই। এতে মরুর বড় রকমের একটা সান্ত্বনা থাকতে পারে। কিছুটা ভেতরে বিদ্বেষ জেগে উঠতেই দৌড়ে গেলাম। বল নিয়ে সোজা বালিপাড়ার টিমের নাক বরাবর মেরে দেখলাম, কারো নাক ভোঁতা করা যায় কি না!

খেলা আরম্ভ হলে পর পর দুটো গোল খেয়ে গেল মামাবাড়ির ক্লাব। আসলে আমি কাকে যেন তখন মাঠের অদূরে দেখার আশা করছি। মরু এত বড় খবর পায়নি আমার বিশ্বাস হয় না। সে আসবে এমন আশায় খেলার চেয়ে মরু কোথায় আছে দেখার বাসনা যেন বেশি। মরু এই খেলার সাথী না থাকলে আমার জয় পরাজয়ে কোন উৎসাহ থাকছে না। প্রাণকুমারমামা, কুলদা চক্রবর্তী, বড়মামা, হারু কর্মকার কে না, সবাই চিৎকার করছে, গোলা, কি করছিস—দাঁড়িয়ে আছিস কেন! ছোট, ছুটে যা। ছিঃ তুই গোলা বলটা এ-ভাবে মিস করলি!

আর তখনই দেখলাম অদূরে মাঠের বাইরে পুকুর পাড়ে গাছের ছায়ায় মরু দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে তার ছোট বোন। আমার চোখে জল এসে গেল। কেমন হাল্কা হয়ে গেলাম। দুটো ডানা মেলে গেল যেন শরীরে। প্রায় পাখির মতো উড়ে যেতে থাকলাম বল নিয়ে। দুই প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের পা কাটিয়ে—বিশ-বাইশ গজ দূর থেকে সাঁ করে বল মেরে দিতেই সবেগে বলটা বার ঘেঁষে গোত্তা খেয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

কিছুটা যেন জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেলেছিলাম। আর এ-ভাবে হাল্কা হয়ে গেলে আমিই বা কি করতে পারি। সারা মাঠে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছি। ছোঁ মেরে বল কেড়ে নিচ্ছি। প্রতিপক্ষকে পুতুলের মতো নাচিয়ে বেড়াচ্ছি। পাত্তাই পাচ্ছে না। চারপাশে শোরগোল হাততালি—কটা গোল, কিভাবে গোল আমার কিছুই খেয়াল ছিল না। শুধু চোখের সামনে একজন বাপের বয়সী মানুষের প্রতি আক্রোশ আমাকে কেমন মরিয়া করে তুলেছিল। এ-খেলার কথা এমন হারের কথা তাদের চিরদিন মনে থাকবে। আসলে লোকটার কুমতলবের বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড় বিক্ষোভের আর

কোনো উপায় আমার জানা নেই। খেলার শেষে মনে হল আমার সব শক্তি নিঃশেষ। মাঠটাও পার হয়ে যেতে পারব না। চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়লাম।

আমার চারপাশে লোকের ভিড়। কাগজি লেবুর রস মিছরির টুকরো নিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে। উঠে জলটা খেলাম, আমাকে সবার জড়িয়ে ধরার কি আগ্রহ। তখনই মনে হল যদি এখনও সেই দূরে গাছের নিচে মরু বসে থাকে? উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম নেই।

ছোটমামা বলল, কিরে তোর উপর কি কিছু ভর করেছিল!

হেসে বললাম, কি আবার ভর করবে।

তুই কি জানিস, ওদের তিন-তিনজনের ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছিস!

তাই নাকি!

একজনের পা ফুলে ঢোল। জলপট্টি দিচ্ছে।

গৌরাঙ্গ বলল, তোর কোথাও লাগেনি তো?

লাগলে তো দেখতেই পেতে।

তবে উঠছিস না কেন!

কুলদা চক্রবর্তী মানী মানুষ। তিনি পর্যন্ত আমার কাছে এসে বললেন, বাহাদুর ছেলে বটে। খালি পায়ে এতটা—এতো সেই গোরাদের খেলার কথা মনে করিয়ে দেয়। পয়সাওয়ালা লোক, ঢাকা কিংবা কলকাতার গোরা আর বাঙ্গালীদের খেলা দেখে থাকতে পারেন। আমার এ-সব কথা শুনতে ভাল লাগছিল না। যার জন্য খেলেছি, যাকে খুশি করার জন্য খেলেছি, সে খুশি হলে আমার খেলা সার্থক। আমি আর কিছু চাই না। মরু কেন বোঝে না, আমি খারাপ হয়ে গেলে আমার অভিভাবকরা কি ভাববে। তুই গোলা নষ্ট হয়ে গেলি! মরুর সামনে দাঁড়াতেও আমার সঙ্কোচ হয়। যেন মরু আর মরু নেই—উলঙ্গ এক বনদেবী।

দুদিন ধরে মরু আর আমাদের বাড়ি আসে না। কালীবাড়ির পথ ধরে হেঁটে যায়। নিনিদের বাড়ি যাবার ওটা পথ। বিকেল হলেই মরু তার ছোটবোনের সঙ্গে সেজেগুজে যায়। যেন আমাকে দেখিয়ে যাওয়া। দ্যাখ আমি কত বড়লোকের বউ হতে যাচ্ছি। ভেবে পাচ্ছি না, যে মরু লোকটাকে কুমীর মনে করে, শয়তান মনে করে, যার কাছে সে ভাবে মরণ লেখা আছে, তারই দেওয়া আশীর্বাদের শাড়ি সায়া ব্লাউজ এবং অলংকার পরে এ-ভাবে গর্বের সঙ্গে হেঁটে যেতে পারে কি করে। আমার তখন মনে হয় এতই যদি তোর গর্ব তবে তুই আমার কাছে মরতে আসছিলি কেন! ভাগ্যিস কেউ জানে না, কেউ দেখেনি, দেখলে তোর আমার কত বড় কলঙ্ক হত ভেবে দেখলি না।

আমি এই এক দেড় বছরে বুঝেছি শরীরে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, সহসা

সেটা একটা ঘাটের মুখে নৌকা ভিড়িয়েছে। কিন্তু এত যে সুন্দর বনভূমি থাকে এবং এমন এক আশ্চর্য অনুভূতি খেলে বেড়ায় ঘাটে নামলে সেটা কে বুঝত! মার কিংবা গুরুজনদের সঙ্গে আমার আচরণই তুই পাল্টে দিলি! একবার ইচ্ছে হয়েছিল ছোটমামাকে বলি, মরুর সঙ্গে মলিনের বিয়ে দিয়ে দাও। আমরা সবাই মিলে যদি গণ্ডগোল পাকাই তবে মরুর বিয়েটা হয় না। কিন্তু যে মরু একজন বুড়ো বর নিয়ে এত অহঙ্কারে ভোগে তার পক্ষ নিয়ে কথা বলতেও ভয়। মরুর স্বভাব তো আমি জানি।

একদিন রাস্তায় মরুকে একা পাওয়া গেল। খুশিমাসিদের বাড়ি থেকে একা বেড়িয়ে ফিরছে। সারাদিন ধরে ওর সঙ্গে শেষ কথা কটা বলব বলেই যেন তক্কে তক্কে আছি। আমাকে দেখেই সে তার ছোট বোনটাকে বলল, বাড়ি যা। বড়পিসিকে এটা দেখিয়ে আমি যাচ্ছি।

মরু আমাকে দেখে এ-কথা বলল, না ওর আগে থেকেই মাকে কিছু দেখাবার ইচ্ছে ছিল বলতে পারব না। বললাম, মাকে কি দেখাবি?

আংটি।

কিসের আংটি?

কিসের আংটি আবার! আশীর্বাদের।

তোকে দেখছি তোর বর এখন থেকেই দিয়ে থুয়ে শেষ করতে পারছে না।

দেবে না। কত বড় পাটের আড়ত। কত বড় মানুষ। কত বড় ক্লাব দেখেছিস। ওরা এভাবে হেরে যাবে—আমার না কি মাথা কাটা গেল। দাঁড়া না আমি যাই, দেখবি কি করে তুই হারাস। যা লাগে দেব। যত টাকা লাগে শহর থেকে বড় প্লেয়ার হায়ার করে আনতে বলব। এত বড় ক্লাব তোর মতো ভীতু লোকের কাছে হেরে গেল—ছিঃ ভাবতে পারি না। এর আগে আমার মরণ হল না কেন!

আমি বললাম, এ দেমাক থাকলে হয়।

কবে দেখেছিস মরু তোর কাছে ভিখ মেঙেছে?

আমার কাছে তুই ভিখ মাঙবি কেন!

তুই তো তাই চাস। সারাজীবন এই চেয়ে এয়েছিস। মামাবাড়ির পথে আসতে টিউকল পড়ে। তুই দেখেছিস। সেই গর্ব নিয়েই তো কতকাল গেলি! আমি টিউকল দেখিনি, তুই দেখেছিস, অহঙ্কারে পা পড়ে না।

আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছি না। যা হয়ে থাকে, শৈশবে কত খেলো কথা নিয়ে বাজি হয়, কে কত বেশি জানে, কার কত হিম্মত এ-সবের প্রকাশের মধ্যে একটা ছেলেমানুষী থাকে—মরু দেখছি এখনও এ-সব মনে করে বসে আছে। আমি বললাম, ওগুলো ভেবে এখনও মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিস কেন?

পাব না! আমরা গরীব বলে তুই কম হেলাফেলা করেছিস? বিনুদের বাড়ি যাবার তোর এত সখ কেন আমি বুঝি বুঝতে পারি না? পারতিস বিনু তোকে আমার মতো সব দিলে ঠেলেঠুলে ফেলে চলে যেতে? তোর আসলে নজর কোথায় আমি জানি। দাঁড়া না বিয়ের পরই কর্তাকে বলব টিউকল দিতে। বলব কালীবাড়িতে টিউকল করে দিতে হবে। বলব বাজারে টিউকলের অহঙ্কার না ভাঙছি তো আমার নাম মরু নয়।

মরুর চোখ কথা বলতে গিয়ে কেমন জলে টলটল করছিল। মানুষের এই বাল্যপ্রেম বড় মধুর। কিছু করারও থাকে না কিছু বলারও থাকে না। পাপবোধ, গুরুজনের কাছে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে বেশি দূর এগিয়েও যাওয়া যায় না। তবু সান্ত্বনা, মরু একটা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। মরুকে আমি কি শেষ কথা বলতে এসেছিলাম ভুলে যাচ্ছি।

মরুই যেন মনে করিয়ে দিল, আমার পথ আটকে এখানে দাঁড়িয়েছিলি কেন?

তোকে কটা কথা বলার ছিল।

কী কথা!

এখন আর বলে লাভ নেই। আর ভুলেও গেছি।

ভুলে যাসনি। আসলে তুই হিংসুটে। ভেবেছিলি মরুর বিয়ে নিয়ে মজা করবি। আমি কাতর হলে তুই মজা পাস সব বুঝি! তোরই বা দোষ কি, সবাই মজা পাচ্ছে, তুই বাদ যাবি কেন! তোদের পুরুষ মানুষদের আমার চিনতে বাকি নেই। মা পিসিদেরও চিনতে বাকি নেই। সব হতচ্ছাড়া।

শুধু বললাম, আমি কিন্তু তোকে খুশি করার জন্য ওদের হারিয়ে দিয়েছি। আমার আর কিছু মনে ছিল না।

ভুল করেছিস। ওতে আমি দুঃখ পেয়েছি।

তবে তুই খেলা দেখতে গেছিলি কেন?

তোর খেলা না। ওদের খেলা।

কেমন এক তিক্ততায় ডুবে যাচ্ছি।

মরু বলল, কষ্ট পাচ্ছিস!

কেন কষ্ট পাব!

মুখ দেখলেই বুঝি। লুকাবি না। আমার কষ্টটাও কম মনে করিস না। কেমন উদ্‌গত অশ্রু চাপতে চাপতে মরু তাদের বাড়ির দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

এরপর আমি কিছুক্ষণ কেমন হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। মরুর স্বভাব জানি, সব সময় সবার উপর জয়ী হতে চায়। হারতে হারতে জয়ী হয়েছে এমন এক জেদ তাকে পেয়ে বসে। আমার তিক্ততা মুহূর্তে কেটে গেল। আসলে এমন

বিপদের মুখে পড়ে ওর মাথাটাই বিগড়ে গেছে।

তবু সেই যাত্রা দেখার দিন পঞ্চুকাকা এল। আমাকে ডেকে বলল, কিরে মরুর খবর কি। যাত্রা দেখতে যাবে তো! মরু বেঁচে আছে তো? বলে হাসল।

ঠোঁট উল্টে বললাম, ওর কথা আর বলবে না পঞ্চুকাকা। কখন কি মতি বোঝা দায়।

তবু একবার জিজ্ঞেস করে আয়। এবারে ওর জন্যই আমার যাত্রা দেখতে আসা।

এমন কথা কেন বলছে পঞ্চুকাকা বুঝতে পারছি না। বললাম, তার মানে!

মানে তোমাকে জানতে হবে না। জেনে এস যাবে কি না!

সবাই যাবে। মরু যাবে কিনা বলা শক্ত। দুদিন বাদে ওর বিয়ে। বাড়ি থেকে অনুমতি না পাবারই কথা। তবে আমার মার সঙ্গে গেলে অন্য কথা। মা-মাসিরা সবাই সকাল থেকেই যাত্রা দেখার জন্য পা বাড়িয়ে আছে। গ্রাম উজাড় করে সবাই যাবে। মরুও যেতে পারে। বললাম, তুমি বরং তোমার সেজ-ঠাকরুনকে জিজ্ঞেস কর। মরু যাবে কি না তিনিই বলতে পারবেন।

মাকে জিজ্ঞেস করতেই বলল, হ্যাঁ যাবে। রোজ খবর পাঠিয়েছে, তোমরা যাত্রা দেখতে গেলে আমাকে কিন্তু নিয়ে যেও। ওর বাবার কাছেও বায়না ধরেছে। আর দুটো তো দিন। এর মধ্যে শখ আহ্লাদ একটু করে নিক না। গোলা তুই যাবি তো!

পঞ্চুকাকাকে বললাম, হ্যাঁ কাকা, তোমার মরুকে এত যাত্রা দেখাবার ইচ্ছে কেন?

যাত্রা দেখলে মন শরিফ থাকে। বেঁচে থাকার ইচ্ছে জাগে। তোরা তো বুঝবি না! আসলে ওর ফাঁসির হুকুম হয়েছে। ফাঁসির আগে একটু শখ টখ যা থাকে করিয়ে দেওয়া আর কি!

ফাঁসির হুকুম হয়েছে কথাটাতে কেমন আমার গা মোচড় দিয়ে উঠল। কী সুন্দর মরু দেখতে! এত যে সুন্দর আগে একেবারে টের পাইনি। ছেলেবেলাতে সারা মাথায় জটা। পুরী পূজার মেলায় মানত—সেই মানত না দেওয়া পর্যন্ত চুল ফেলার হুকুম হয়নি তার। এ-নিয়ে মরুর মাথাব্যথাও ছিল না। তার মা তাকে সব সময় ছেলে সাজিয়ে রাখত। দু-দুটো আঁতুড় ঘরে মরে যাবার পর মাসীর মানত ছিল, আবার তার পেটে সন্তান এলে, পুরী পূজার মেলায় মাথার চুল দেবে। সেই চুল রাখতে গিয়ে জটা বেঁধে গেল। অভাবের সংসারে মানত রক্ষা করতে গেলে নানাভাবে উপকরণের অভাব। দেব, দিচ্ছি করে আর যাওয়া হয়ে উঠত না। মরুও নির্দ্বিধায় আমাদের সঙ্গে ছেলেদের মতো ঘুরে বেড়াত পারত। সেই মেয়েটাকে দুবছর আগে নেড়া দেখে গেছি। মা সেবারই যেন মরুকে কি মনে করে মনে করিয়ে দিয়েছিল, ধিঙ্গি মেয়ে—আর এত সবের পর এবারে এসে একেবারে ফোটা ফুলের সৌরভ—সবুজ

আভায় ভরে গেছে—তারই কিনা পঞ্চুকাকার ভাষায় ফাঁসির হুকুম হয়েছে। যাত্রা দেখাতে নিয়ে যাবে সে-জন্য। পঞ্চুকাকু জানে না, মরু সে ধাতের মেয়েই নয়। বড় হয়ে উঠতে উঠতে সে যে নারী এবং দেবীর মতো সেজে ঘুরে বেড়ানোর শখ—এটা পেলেই সে খুশি, বর তার বুড়ো হোক, হাবা হোক, কুমীর হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। ফাঁসির হুকুম হলে কেউ তার সাজ পোশাক এভাবে দেখিয়ে বেড়াতে পারে না।

আমি বললাম, পঞ্চুকাকা, তুমি যা ভাবছ তা নয়। তোমার কুণ্ডু মশাইকে মরুর খুব পছন্দ।

পঞ্চুকাকা বলল, ও হতেই পারে। তুই ছেলেমানুষ বুঝবি না! ও নিয়ে তোর সঙ্গে আমার কথা বলা সাজে না।

আমার কথা বিশ্বাস না হয় মরুকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পার।

তোমাকে আর পাকামি করতে হবে না। মেয়েদের তুই বুঝিস কি!

আমার রাগ হল পঞ্চুকাকার ওপর। আমি যে আর ছেলেমানুষ নই সেটা কিছুতেই কাকা বুঝতে চায় না। কেবল মরু জানে আমি কত বড় হয়ে গেছি। সে বুঝতে পারে বলেই গুপ্তধন খোঁজার অছিলা করে জঙ্গলের ভেতর আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুশকিল হল, আমি যে বড় হয়েছি তার কোনো প্রমাণ তো আর পঞ্চুকাকাকে দিতে পারি না। কেবল বললাম, বিয়ে হলে মরু কি কি করবে তাও আমাকে বলেছে।

কি করবে? পঞ্চুকাকা কেমন আর্তনাদ করে উঠল।

'কি করবে' কথাটা কত গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চুকাকার চোখ মুখ দেখলে টের পাওয়া যায়। এটা হবার কথা। যার যায় সেই জানে।

পঞ্চুকাকুর সেই বাল্যসখীকে উজানি মৌলভী সাদী করে নিয়ে গেল ঠিক, কিন্তু সংসার করতে পারল না। সে-রাতেই বিবি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছিল। ফাঁসির হুকুম হয়েছে পঞ্চুকাকাই বলতে পারে। যার যায় সেই বোঝে। কিন্তু পঞ্চুকাকা জানে না, তার বাল্যসখী আর এই মরুর ফারাক দুস্তর। হিতে বিপরীত হতে পারে। বললাম, তুমি কিছু করতে যেও না। ওর বিয়ে হচ্ছে হতে দাও। ও গাঁয়ে গাঁয়ে টিউকল দেবে বলছে।

পঞ্চুকাকা এই প্রথম টের পেল আমিও বড় হয়ে গেছি। বলল, তবে আর আমার আসা কেন?

না এলেই পারতে। বালিপাড়ার ক্লাব হেরে যাওয়ার এখন মরু নাকি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।

তোকে বলেছে?

বলল, তো!

ওটা মনের কথা নারে। ও-সব বলে তোকে ক্ষেপাচ্ছে। তোর সঙ্গে খুব ভাব তো—পাছে ভাবিস ও খুব কষ্ট পাচ্ছে বিয়ে নিয়ে তাই বলেছে।

পঞ্চুকাকা কি তবে টের পেয়ে গেছে, মরুর প্রতি ঠিক তার কৈশোরকালের মতো আমারও দুর্বলতা তৈরি হয়েছে! এ-সব জানাজানি হলেও যে আমাদের বংশের কলঙ্ক। আমি বললাম, আমার সঙ্গে মরুর কবে থেকে আড়ি তুমি জান না। কথাই বলি না।

কথা না বললে জানলি কি করে।

গোলাপীদের বলেছে! শুনলাম। আমি একেবারে ডাহা মিছে কথা বলে পঞ্চুকাকার কাছ থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করলাম। এ-সব নিয়ে আমার মাথা ঘামানোও ঠিক নয়। যা হচ্ছে হোকগে। কোনটা মরুর আসল ইচ্ছে, জঙ্গলের না রাস্তার ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। নিজের মধ্যেই কেমন একটা বড় গণ্ডগোলে পড়ে গিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লাম। পঞ্চুকাকা যা ভাল মনে করে করুক, এর মধ্যে আমার নাক গলানোর দরকার নেই।

রাতে যাত্রা দেখতে যাবে বলে, সবার বাড়িতে সাঁঝ লাগার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার পাট শেষ। সেজেগুজে সবাই বের হয়ে পড়েছে। দাদু কেবল বাড়ি পাহারায় থাকল। দিদিমা, মা, রাঙামাসি খুশিমাসি শৈলমাসি যে যার সেরা সায়া শাড়ি পরে মুখে পাউডার মেখে চাদর জড়িয়ে রওনা হল। মরুও এসেছে। ওর বোন সঙ্গে। মামী এসে মাকে কি বলে গেল। অর্থাৎ মার জিম্মায় মরু থাকছে। মরু নতুন শাড়ি পরেছে ঠিক, কিন্তু কোনো গয়না গায়ে রাখেনি। বড় নিরাভরণ। হাতে নীল রঙের কাচের চুড়ি। আমার দিকে একবার ফিরেও তাকায়নি। এতে আমার ভিতরের রোষ বাড়ছিল। পঞ্চুকাকার হাতে হ্যারিকেন, মোটা বেতের লাঠি। পঞ্চুকাকা সঙ্গে আছে বলে নিরাপত্তার বিষয়ে সবাই নিশ্চিন্ত। বড়মামার হাতে তিন ব্যাটারির টর্চ। গ্রাম থেকে বলতে গেলে মিছিলের মতো যাত্রা শুরু। দুপতারার বাজার খুব বেশি দূর না। ক্রোশ খানেক রাস্তাও নয়। রথতলা পার হয়ে সাঁকোতে উঠলে বিশাল এক গোপাট সামনে। দু-ধারে শীতের ফসল। সামনে তাঁতিপাড়া, তারপর একটা খাড়ি নদী। নদীর পাড় ধরে গেলে হাজার বছরের পুরনো এক অশ্বত্থের ছায়ায় বাজার। শীতকালে বিশাল গাছটাই চাঁদোয়ার মতো কাজ দেয়। মাঝেমধ্যে অবশ্য পাখিদের গু-মুত মাথায় পড়ে। ওতে খুব একটা আসে যায় না। যাত্রার কনসার্ট বাজতে থাকলে—সবাই কেমন দিশেহারা হয়ে যায়। কিছুটা যেন বাহ্যজ্ঞান লোপ। মাথায় কার কি পড়ল সেই নিয়ে ভাববার কিছু থাকে না।

সবার আগে পঞ্চুকাকা। মেয়েদের মিছিলটা তার পেছনে। ইতস্তত এদিক ওদিক

থেকেও লোক এসে জুটছে। পাড়াগাঁয়ে যাত্রা দেখা প্রায় চৈত্র সংক্রান্তির মেলার মতো। বিল্বমঙ্গল পালা, বৃষকেতু বধ, কর্ণার্জুন— এই তিন পালা তিনদিন ধরে। প্রথম দিন বিল্বমঙ্গল। গাঁয়ে গঞ্জে পালার কাহিনী ঢোল পিটিয়ে বলে গেছে। যাবার সময় আমি সবার সঙ্গে থাকলেও মরুকে একা পাওয়ার মতলবে আছি। মাঝেমাঝেই দল ছাড়া হয়ে যাচ্ছি। এটা যে আমাদের বেলাতেই ঘটছে তা না। মেয়েরাও বাদ যাচ্ছে না। সাঁকো পার হবার পর কে কোথায় কার সঙ্গে, নজর রাখাই দায়। এই সব পালাগান হলে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা একটুখানি উদোম হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবার সুযোগ পায়। অভিভাবক কিংবা গুরুজনেরাও সেটা বোঝে। ফলে এক সময় দেখলাম, শীতের মাঠে মরু একা দাঁড়িয়ে কার জন্য অপেক্ষা করছে। এই সুযোগ। জ্যোৎস্না চারপাশে। দূরে বাজারের পেট্রোম্যাক্সের আলো নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। পালা না আবার শুরু হয়ে যায়, বসার জায়গা নিয়েও একটা ঝামেলা আছে, আগে যেতে পারলে একেবারে কাছে—পিছিয়ে পড়লে শেষে—ফলে দলের লোকজন একসঙ্গে ঠিক রাখা কঠিন। ওখানে গিয়ে একটা হিসাব হবে, ফিরে আসার সময় আর একটা হিসাব। বাকি সময়টা কে-কার হিসাব রাখে!

কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেখলাম মরু সামনের দিকে কাকে ধরার জন্য যেন একটু দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমার মনে হল, আসলে একটু পিছিয়ে পড়ে সে দেখে নিল গোলা যাত্রা দেখতে যাচ্ছে কি না। মরুর কাছে আমার এখন একটা কথাই জানার দরকার জঙ্গলের কথা মরুর মনের কথা, না রাস্তায় যা বলেছিল, সেটা।

আমিও কিছুটা দ্রুত হাঁটতে থাকলাম। মরু সামনের দু-একজনের পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। মরুর কাছে দৌড়ে যেতে পারি। পাশের বাড়ির মেয়ে কথা বলতেও আটকাবে না। খুব কাছাকাছি কেউ না থাকলে শুধু বলব, এই শোন! বললেই সে আমার গা ঘেঁষে হাঁটবে জানি। অবশ্য যা ক্ষেপে আছে তাতে করে কাছে আসতে নাও পারে। আমি সবার সঙ্গে যাত্রা দেখতে যাচ্ছি এতেই তার সুখ এমনও মনে হল আমার।

আর কি জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্নায় সব রমণীকে এক দেখায়। পেছন থেকে ওর বড় খোঁপা দেখতে পাচ্ছি। পাছাপেড়ে শাড়ি পরনে। শরীর মনে হচ্ছে তাজা শঙ্খিনীর মতো। জ্যোৎস্না পিছলে পড়ছে শরীর থেকে। মরু হাঁটছে না যেন বাতাসে ভেসে যাচ্ছে। দামী এসেন্সের গন্ধ পাচ্ছিলাম। ভুরভুর করে সারা রাস্তায় গন্ধ ছড়াচ্ছে উত্তুরে ঠাণ্ডা বাতাসে। যব গমের গাছ রাস্তার দু-পাশে দুলছে। কিছু পাখির কলরব শোনা গেল। মরুর হাঁটা ক্রমে শ্লথ হয়ে আসছে। সে সত্যি এবার নিজে থেকেই আমার পাশাপাশি হাঁটতে থাকল। সামনে সেই খাড়ি নদী। নদীর চরে মস্ত বালিয়াড়ি। মরু আমার খুব সংলগ্ন হয়ে বলল, ওঃ কি ঠাণ্ডা। তোর চাদরটা একটু দে। বলে

আমাকে কথা বলতে না দিয়ে চাদরের কিছুটা গায়ে দিয়ে একেবারে জড়াজড়ি করে হাঁটতে চাইল। আমার ভয় কে কোথায় দেখে ফেলবে। বললাম, তুই গায়ে দে। আমার শীত করছে না মরু।

মরু সহসা আগের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। বলল, না লাগবে না। বলে চাদরটা আমাকে দিয়ে সহসা বালিয়াড়ির দিকে ছুটতে থাকল। মরুর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! কোথায় যাচ্ছে! ওদিকে গেলে তো শ্মশান পড়বে। ভাঙা মন্দির। ভয়ে ওদিকটায় কেউ যায় না। দৌড়ে ওর সঙ্গে নেমে গেলাম। জ্যোৎস্নায় ছাড়া ছাড়া হয়ে গেছে মানুষজন। দূরে নদীর পাড়ে পেট্রোম্যাক্সের আলো। যাত্রার কনসার্টের বাজনা শোনা যাচ্ছে। নেশায় পাওয়া ভূতের মতো মানুষ সেদিকে দৌড়াচ্ছে। কে কোথায় পড়ে থাকল কারো খেয়াল নেই।

ডাকলাম, মরু পাগলামি করিস না। ফিরে আয়।

মরু বলল, আমার যেখানে খুশি চলে যাব। আমার সঙ্গে আসিস তো মা কালীর দিব্যি!

মরু কি কিছু করে ফেলবে? কি জানি। গতবারও একজন ঝুলে পড়েছিল। জায়গাটা নিরিবিলি বলে আত্মহত্যা করার প্রশস্ত জায়গা।

আমি ছুটতে থাকলাম।

মরুকে জ্যোৎস্নায় ছায়ার মতো দূরে দেখা যাচ্ছে। কিছু করে ফেলার আগেই ধরে ফেলতে হবে। কাছে গেলে দেখলাম, মরু বালিয়াড়িতে শুয়ে আছে। বলছে, আমায় ছুঁবি না গোলা। ছুঁলেই আমি চিৎকার করব। বলব তুই আমাকে এখানটায় জোর করে এঁটো করার মতলবে টেনে এনেছিস। এই শীতেও আমার শরীর গরম হয়ে গেল। এমন সাদা বালিয়াড়িতে, শঙ্খিনীর মতো কোনো নারী শুয়ে থাকলে শরীর গরম হবারই কথা। আমার কেমন নিশি পাওয়ার মতো অবস্থা। ওর কোনো কথাই কানে যাচ্ছে না। কাছে গিয়ে হাত ধরে বললাম, ওঠ। এমন করবি না। তুই আমাকে যা বলবি করব। এখানে এভাবে কেউ দেখলে কি হবে বল। কথাগুলো বলতে গিয়ে কেমন তোতলামিতে পেয়ে বসল। সব যেন গুছিয়ে বলতেও পারছি না। যদি দেখে সবাই, আমরা যাত্রার আসরে নেই খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে। বললাম, মরু আয়। আমার বড় ভয় লাগছে।

মরু কথা বলল না। দু-পা ছড়িয়ে দিল।

না, আর দাঁড়াতে পারছি না। মরুর পাশে শুয়ে পড়লাম। ওর হাত বুকে তুলে নিয়ে চুপচাপ অসাড় হয়ে পড়ে থাকলাম পাশে।

মরু বলল, কি সুন্দর জ্যোৎস্না। এ-জ্যোৎস্নায় মরে গিয়ে কত সুখ বল। বলেই সে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানতে টানতে বলল, তুই আমাকে এঁটো করে

দে গোলা। একটা অন্তত তবে আমার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। আমি একটা কিছু করে যেতে চাই। আয়। আমার কাছে আয়। আমাকে তুই মেরে ফেল। শেষবার মরার আগে তোর কাছে অন্তত একবার মরে যেতে চাই। কাজটা সহজ করে দে গোলা। নালে আমি সেখানে গিয়ে ভয়েই মরে যাব।

সামনে দেখলাম অতিকায় সেই বুড়ো ষাঁড় দাঁড়িয়ে। এক সুন্দর সুপুষ্ট গাভীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি। মরুও বোধহয় সারাক্ষণ এমন একটা দৃশ্য দেখতে পায়। মরুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, আমার তো কিছু জানা নেই।

মরু বলল, আমি সব জানি।

তারপর সেই অনন্ত আকাশের নিচে এক নাবালক ক্রমে যথার্থই সাবালক হয়ে যেতে থাকলে, ধরণী কি শান্ত আর মহিমময় মনে হতে থাকল, এমন সুষমা থাকে নারী সহবাসে—যেন স্বপ্নময়,অলৌকিক এক জগৎ—কোন অদৃশ্য গুপ্তধনের রহস্য আবিষ্কার—মরু আমার সেই থেকে চিরদিনের শত্রু, চিরদিনের বান্ধবী হয়ে থাকল।

মরুর বিয়েতে আমি সেবারে খুব খেটেছিলাম।

(গুপ্তধন)